নিঃশব্দে

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गोदेवस्य धीमहि
धियोयोनःप्रचोदयात्

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेन्य
भर्गो देवस्य धीमहि
धीयो यो नः प्रचोदयात ॥

অনিরুদ্ধ বসু

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः।
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।

নিঃশব্দে



অনিরুদ্ধ বসু

নিঃশব্দে

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

NISHABDE

A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE

Published by **SMRITI PUBLISHERS**

Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮

প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৩

দ্বিতীয় প্রকাশঃ আগস্ট ২০১৯

দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশঃ আগস্ট ২০১৯

প্রচ্ছদপটঃ পাপিয়া ঘোষাল

অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু

প্রকাশকঃ

স্মৃতি পাবলিশার্স

'ওয়েসিস' সি এফ - ৪১

সেক্টার ১

সল্টলেক সিটি

কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN No: 978-81-937558-7-7

যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ,পারফরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

আমার বন্ধুবর

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়কে

যার জীবনদর্শনের ভিত্তিতে ও সর্বভৌম সাহায্যে উপন্যাসটি লেখা

সূচি

সতেরো

আঠারো

উনিশ

বিশ

একুশ

বাইশ

তেইশ

চব্বিশ

পঁচিশ

ছাব্বিশ

সাতাশ

আঠাশ

উনত্রিশ

ত্রিশ

একত্রিশ

বত্রিশ

তেত্রিশ

চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ

ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ

আটত্রিশ

উনচল্লিশ

চল্লিশ

একচল্লিশ

বিয়াল্লিশ

তেতাল্লিশ

চুয়াল্লিশ

যাদের উপদেশ এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ দেবাশিস রায়

দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবাশিস গৌতম

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

হার এবং জিত, এই দুই নিয়েই মত্ত আমরা সাধারণ মানুষেরা। চারদিকে তাকালেই দেখতে পাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে। দু'দলের-ই একমাত্র উদ্দেশ্য জয়। হারতে কেউ চায় না। হারতে আমরা ভয় পাই। জিততে চাই সব কিছুতেই। আমাদের চোখে যে বিজয়ী সে হিরো, আর বিজিত, সে জিরো! এই হারজিতের মানসিকতা নিয়েই আমরা সর্বদা আমাদের জানাচেনা জগৎটাকে বিচার করি। কিন্তু ধু-ধু তেপান্তরের মাঠের মধ্যে যেমন হঠাৎ দেখা যায় এক-একটি বিরল তালগাছ... নির্মম রৌদ্র আর রাতের ঘোর অন্ধকারেও যার উন্নতশির উপস্থিতি দেখা যায়, অনুভব করা যায়, তেমনি সাধারণ জনসমুদ্রের সমতল আশা-আকাঙ্ক্ষার তেপান্তরের মধ্যে হঠাৎই চোখে পড়ে এক-আধজন বিরল মানুষকে, যারা হারজিতের বাইরে। যাদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকে চেনা বড় দুষ্কর, কেননা আমাদের জানা চেনা জগতের কাছে, আমাদের জানা-চেনা মাপকাঠিতে তাদের মনে হয় অদ্ভুত। কোনও দলে ফেলতে না পেরে আমরা সেই বিরল ব্যক্তিত্বগুলিকে টেনে হিঁচড়ে নীচে নামানোর চেষ্টা করি। চেষ্টা করি আমাদের নিজস্ব প্যারাডাইমের বন্ধনে বেঁধে চেনা জানা মুখোশ পরিয়ে দিতে। কেননা, তাদের নিস্পৃহতাকে, তাদের হারজিৎকে সমান চোখে দেখার ক্ষমতাকে আমরা ভয় পাই। ভয় পাই তা আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে বলে।

কিন্তু তবুও তারা আছে, ছিল, থাকবে। সেই যারা এক উন্নততর জীবনদর্শনের খোঁজ পেয়েছে। যাদের কাছে সময়ের স্কেলটা অ-নে-ক বড় হয়ে গেছে। যারা আমাদের জানা চেনা হার-জিৎকে নিস্পৃহভাবে হঠিয়ে দিয়ে তার বাইরে এক বৃহত্তর জগতে তাকাতে শিখেছে।

যদি আপাত অবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে আমরা তাদের চিনতে চেষ্টা করি, তবে তাতে আমাদেরই লাভ। অনিরুদ্ধ বসুর এই উপন্যাসটির মাঝে এমন-ই একজন ব্যতিক্রমী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

'নিঃশব্দে' উপন্যাসটি এক বিশাল ক্যানভাসে আঁকা একটি ছবি। আজকের অবক্ষয়ী অশান্ত দিকভ্রান্ত সমাজের এক নিঁখুত চিত্রায়ন। শল্যচিকিৎসক লেখক-রূপে হাতে কলম ধরেছেন বলেই হয়ত কলমকে শাণিত ছুরির মতো ব্যবহার করেছেন। আমাদের এই মধ্যমেধার রাজত্বের পচাগলা অংশগুলি শল্যচিকিৎসকের নিপুণ ভঙ্গিমায় ছেঁটে-কেটে ব্যবচ্ছেদ করে আমাদের অধিকাংশ মানুষের অর্থহীন বেঁচে থাকাটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে দ্বিধা করেননি। আর তার মধ্যেই অসীম মমতায় লেখক দেখাতে চেয়েছেন এক 'অন্য' মানুষকে, উপন্যাসের নায়ক দেবজিৎকে, যে আমাদের জানাচেনা চৌহদ্দির একদমই বাইরে।

সেই আশ্চর্য মানুষটি কিন্তু ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর সাজার কোনও ইচ্ছেই তার নেই। রক্তমাংসের মানুষের সব কামনা-বাসনার মধ্যে থেকেও (উদাহরণ স্বরূপ নায়িকা বিদিশার, যদি তাকে নায়িকা বলা যায়, সঙ্গে এক তীব্র সংঘাতপূর্ণ অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া) সে অনন্য। লেখক এক চিরনতুন শ্লোকের মধ্যে দিয়ে তার মানসিকতাকে আশ্চর্যভাবে ধরেছেন। **'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃধ কস্য সিদ্ধনম'**।

উপন্যাসটিতে হালকা কুয়াশার মতো মাঝে মাঝেই ভেসে এসেছে এক অদম্য কাম। এমনকী সাধারণের কাছে ট্যাবু লেসবিয়ানিজম্ এবং আজকের উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় সেক্সুয়াল অরগি-কে নির্মম নির্লিপ্ততায় বিশ্লেষণ করতে দ্বিধা করেননি অনিরুদ্ধ। এই বর্ণনা মাঝে মাঝে তথাকথিত অশ্লীলতার ধারে কাছে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্যারাডাইমের শিকল ছিঁড়ে দু'চোখ খুলতে পারলেই, পাঠক বুঝতে পারবেন, এই কাম বা বিকৃত কাম, আসলে মানুষের অন্তরের অপূর্ণতা, জীবনে অনেক কিছু না-পাওয়ার হাহাকারেরই প্রকাশ মাত্র। এখানেই অনিরুদ্ধর সার্থকতা।

উপন্যাসটির কলেবর কিছুটা বড়, কিন্তু পড়তে বসলে অনায়াসেই একটানে পড়ে ফেলা যায়। আর শেষ হওয়ার পর বোঝা যায়, **'নিঃশব্দে'** কখন যেন নিঃশব্দে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। এক আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য মানুষের গল্প কখন যেন হয়ে উঠেছে পাঠকের নিজস্ব স্বপ্নের গল্প। বহু ঘটনার ঘনঘটা আর আপাত অশ্লীলতার মধ্যে এক অসাধারণ বক্তব্যের অনুরণন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বাজতে থাকে 'ওঁ **পূর্ণমদ্য পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণাস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবিশিষ্যতে'**

আজকের এই সংঘাতপূর্ণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়ে, এক পূর্ণতার আস্বাদ দেওয়ার জন্য অনিরুদ্ধকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুর্গাপুর, নভেম্বর ২০০৮

ডাঃ আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

আমার প্রথম উপন্যাস **'অন্বেষণ'**-এর সাফল্যের পর, **'নিঃশব্দে'** দ্বিতীয় উপন্যাস। বাস্তবধর্মী গণ্ডিভাঙা লেখা বলে বহু প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে ২০০৮-এ প্রকাশ হওয়ার পর তুমুল সারা ফেলে। বারবার বেস্ট সেলারই শুধু হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে নতুন বাংলা চিন্তাধারা হিসেবে বিশেষ স্থান পায়। দিল্লির একটি নিরপেক্ষ সার্ভে রিপোর্টে (A Survey among visitors to the Kolkata Book Fair and exhibiting publishers, 2009) প্রশংসিত হয়।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে হয়ত বাঙালি এতখানি নগ্ন সামাজিক চিত্রায়নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ এই লেখাটা পাঠককে এক নতুনত্ব দেয়। শুধু বিষয়বস্তু নয়, ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও বাংলা সাহিত্যে এক ব্যাতিক্রমী সংযোজন। লেখায় বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যার অনেকটাই সময়ের টানে সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে।

ম্যাচিওরিটির সঙ্গে লেখনীরও বিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকাশে তার পরিমার্জন পাওয়া যাবে। এতে বিশেষ সহায়তা করেছেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আশা করব প্রথম প্রকাশের মতো, দ্বিতীয় প্রকাশও জনপ্রিয় থাকবে কালস্রোতের ধারায়।

সল্টলেক, আগস্ট ২০১৯

অনিরুদ্ধ বসু

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ কলকাতায়। বি ই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র মোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত বাংলার স্নতাকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসুর-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছে। দু-বছর মধ্য প্রাচ্যেও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি। স্কুল পত্রিকা 'নিহিল উল্ট্রার' সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙে ছ'মাস হুইলচেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় **'অন্বেষণ'** উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্টসেলার শুধুই হয়নি, ব্যস্ত প্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে**'ও বেস্ট সেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহু দেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ, সমাজ, উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনাশৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

লেখা তুমি আত্মদহনে জ্বলো

যদি নতুন সুরে, নতুন তানে না কিছু বলতে পার।

রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।

লেখকের বাংলা উপন্যাস



লেখকের ইংরেজি উপন্যাস



এক

ফোনটা বেজে উঠল। এত রাতে কে? নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সি থেকে ফোন। ডান হাত বাড়িয়ে, ঘুমজোড়া চোখে ফোনটা তুলে নিল বিদিশা।

"হ্যালো"

"চারটে মেজর বার্ন এসছে। ভর্তি করে দিচ্ছি" সুদর্শন ফোনে।

"কী হয়েছিল?"

"এসে দেখ। বলার সময় নেই" ফোনটা কেটে দিল।

বিরক্তির সঙ্গে উঠে পড়ল বিদিশা। অন-কল থাকলে ওটি ড্রেস পরেই শুয়ে থাকে। জামাকাপড় পরার কোনও বালাই নেই। চুল আঁচড়াবারও প্রয়োজন নেই। এই রাতে কেউ তাকে দেখবে না। পাশের টেবলে রাখা চশমাটা পরে, ঘরের চাবিটা পকেটস্থ করে, দরজা টেনে বেরিয়ে গেল। সেলফ-লকিং দরজা। চাবি ফেলে গেলেই মুশকিল।

একবার নাকি স্যারের হয়েছিল। ইংল্যান্ডে থাকতে, আন্ডারওয়ার পরে দুধের বোতল বার করতে গিয়ে, পেছন থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছিল। ওপাশের ঘরে কোনও বিদেশিনী মেয়ে থাকত। তারও একই অবস্থা। ওরা দুজনে জানুয়ারির শীতে, আন্ডারওয়ার পরে, হাসপাতালের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল সিকিউরিটি অফিসের দিকে। সে এক দৃশ্য। শুনে ভীষণ হাসি পেয়েছিল। হাসি পেলেও, কথাটা ভোলেনি। তাই ঘর থেকে বেরবার আগে চাবিটা নিতে ভোলে না।

চার-চারটে মেজর বার্ন। মানে সারারাত গেল। ঠিক আছে। কষ্ট করতে আপত্তি নেই। কষ্ট যেন আর শেষ হয় না। আরএমওগুলো একেবারে অপদার্থ। কিচ্ছু করতে জানে না। চায়-ও না। সারাদিন বসে এমসিকিউ পড়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। পড়েও যদি কিছু জানত। তাও তো জানে না। যে পড়ার কোনও অর্থ নেই, কী লাভ সে পড়া পড়ে? ইউরিনারি ব্লাডার ভর্তি আছে কি না, তাও দেখতে শেখেনি। যেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি করলেই ডাক্তারি শেখা হয়ে যাবে। বই পড়ে ডাক্তারি। মানুষের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই। স্যারেরা অতীত, বিদিশারা বর্তমান, আর এরা ভবিষ্যৎ।

এখন সরকারি হাসপাতালের বাইরেও অনেক বেসরকারি হাসপাতাল। উন্নত মানের যন্ত্রপাতি এসেছে। রোজ মিডিয়াতে, পোস্টারে, স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের স্বপ্ন বিক্রির কমপিটিশন। যে হাসপাতাল যত বেশি খাওয়াতে পারবে, মিডিয়া তাদের নিয়ে তত বেশি লিখবে। সেই লেখা পড়ে, কোটি কোটি মানুষ পাগলের

মতো ছুটবে উন্নতমানের চিকিৎসার আশায়। চিকিৎসা কী পাবে, বিদিশা জানে না। কিন্তু মোটা অঙ্কের দক্ষিণা দিয়ে বাড়ি ফিরবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। হাসপাতালের নিন্দে করবে, আবার মিডিয়ার উস্কানিতে আত্মীয়দেরও ওই হাসপাতালেই নিয়ে যাবে। নামী হাসপাতাল। স্ট্যাটাসের ব্যাপার।

কনজিউমারিজম। মার্কেটিং-এর দৌলতে, বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করে, সেই ফাঁদে পা দেবে। কথায় আছে না, ভেক যার, ভিখ তার। মার্কেটিং। কথাটা শুনলে হাসি পায়। মার্কেটিং ম্যানেজার? বিদিশার মনে হয়, নামটা ঠিক নয়। আসলে খাম পাঠানো ম্যানেজার। কোম্পানির মেডিক্যাল অফিসার থেকে, লিন্ডসে স্ট্রিটের হোটেল মালিকদের, খাম দেওয়া কাজ। তাতে কেস আসবে। পাঁচতারা হাসপাতালের জালের বিস্তার। মুনাফা। মিডিয়াতে হাসপাতালের সাকসেস স্টোরি। অবশ্য তার জন্য, কাগজকে বড় রকমের মাশুলও গুণতে হবে। বাধা কোথায়? মুরগি ঢোকাতে পারলে সুদে-আসলে উসুল।

লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে দেখল, চার চারটে বার্ন ট্রলিতে। ড্রিপ চলছে। সুদর্শন চা খেতে খেতে পেশেন্টের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

কোথায় ক্যাথেটার? ব্লাড পাঠানো হয়েছে? বাড়ির লোকের সামনে এসব প্রশ্ন করা যাবে না। নার্সদের ডেকে সেগুলো করতে পাঠাল। ব্লাড গ্যাস পাঠানো হয়েছে কী? ধরেই নিল, কিছুই করা হয়নি। তাই প্রথম থেকেই চিকিৎসা শুরু করে দিল। মোটা আইভি লাইন। ড্রিপ জোরে চালানো। ক্যাথেটার পরানো। ব্লাড, ব্লাড গ্যাস পাঠানো... কখন যে আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে, খেয়ালই নেই। ফিরে দেখল, ইমার্জেন্সির বাইরে, হাজারও লোকের ভিড়। সুদর্শন কোথায়?

নার্স জানাল "রেস্ট রুমে শুতে গেছে"

ওর কাছে চিকিৎসা মানে বিদিশাকে খবর দিয়ে, পেশেন্ট পার্টিকে কিছু বুঝিয়ে, চামড়া বাঁচিয়ে, ঘুম। মরলে বিদিশার দায়িত্ব। মাইনে, ডাক্তারি না করেই।

বিদিশা পেশেন্ট পার্টির কাছে "কী হয়ছিল?"

"তিলজলা বস্তির কারখানায় আগুন লাগে। এরা কারখানায় শুতো। ঘুমের ঘোরে আঁচ করতে পারেনি, কদ্দুর আগুন লেগেছে" ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল।

মানে, রেস্পিরেটরি বার্ন হতে পারে... আটিইউতে ট্র্যান্সফার করতে হবে। ব্লাড গ্যাস কম হলে, ভেন্টিলেট করা। লান্ড অ্যান্ড ব্রাউডার চার্ট নিয়ে, বার্ন-এর হিসেব করা।

"ডাক্তারবাবু বাঁচেঙ্গে তো?" প্রশ্নকর্তার দিকে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল। মধ্যবয়সি। অবাঙালি। সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। ভারী ফ্রেমের চশমা। চুল উশকো-খুসকো।

"আপ?"

“জগদীপ আগারওয়াল। কারখানে কা মালিক”

“অভি বোলনে নেহি সাকতা। জো করনা হ্যায়, ওহি ক্র রহা হুঁ। তিন চার হপ্তে কা বাদ মালুম হোগা”

“তিন-চার হপ্তে! ইতনে দিন?”

“বার্নকে প্রবলেম শুরু হোতা উস টাইম পর”

“লেকিন, ও ডাকদারবাবু বোল রহা থা, সাত দিন কে অন্দর...”

রাগ হল সুদর্শনের ওপর। না জানলে, বলিস কেন? অজ্ঞ-বিজ্ঞের সাজে ভুল বলার কী দরকার? ক্যাথেটার পরাতে পারিসনি। ড্রিপটাও ঠিকভাবে চালাতে শিখিসনি। খালি লেকচার। ওদের কাছে বিদিশাকে অসুবিধায় ফেলা।

সামলে নিয়ে বলল “হম নেহি বোল সাকেগা। জো হম জানতা হ্যায়, ওহি বোলা”

“জো কুছ করনা, কিজিয়ে। রূপয়কা কোই ফিকর নেহি। জিতনে লগে, হম দেঙ্গে। উনলোগকো জিন্দা রহনা বহৎ জরুরি”

মালিক। কারখানায় আগুন লেগেছে। শ্রমিকের জন্য এত উদ্বেল! আগে তো দেখেনি। সন্দেহ হল। অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে। বিদিশা এরকম অনেক কিছুই বোঝে, যার কোনও কারণ নেই। কেন মনে হয়, জানে না। কথার ফাঁকে, হঠাৎ কোনও কথায় খটকা। পরে দেখেছে, সন্দেহটা অহেতুক নয়। কেন হয়েছিল, নিজেও জানে না।

স্কুলে থাকতেই সুবিমলের প্রেমে পড়েছিল। পড়বে নাই বা কেন? উচ্চ-মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করা ছেলে, মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। সুপুরুষ। যেন সালমান খান। গর্বে বুক ভরে যেত। ৫’ ৮” সুবিমলকে শুধু ভালোবাসা নয়, আদর্শ হিসেবে দেখেত সপ্তদশী বিদিশা। এই সময়, যে পুরুষ কাছে আসে, তার প্রেমে পড়াটা আশ্চর্য নয়। সে যদি, রূপে-গুণে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়, তো কথাই নেই। স্বপ্নের মানুষ, বাস্তবে। ছোটবেলার বন্ধু লিপিকার বাড়িতে সুবিমলকে আগেই দেখেছে। কথাও হয়েছে। বন্ধুর দাদা হিসেবে। প্রেম তখনও দানা বাঁধেনি। ভালোোলাগা মেশানো আইডল ওয়ার্শিপ। স্বপ্নের রাজপুত্রকে, দূর থেকে দেখার সীমাবদ্ধতা, সুবিমলের চোখের ভাষায় স্পষ্ট। অন্তরের গভীরে। সুবিমলের মতো মেধাবীর পক্ষে অসুবিধার নয়। বিদিশার চোখে বুদ্ধিদীপ্ত আলোর নিশানা। সেই কালো চোখের ভাষা বুঝতে একটুও ভুল হয়নি সুবিমলের। মেদের সম্ভার না থাকলেও যৌবনের অভাব ছিল না। সালোয়ার কামিজ অথবা ফ্রক পরা মেয়েটাকে ভালোো লাগত। ভালো লাগত মার্জিত রুচি, সম্ভ্রান্ত নিজস্বতায়। যৌবনকে কামনা করে মধ্যরাতের আকাঙ্ক্ষাকে প্লাবনের জোয়ারে ভাসানো। ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে বরণ করা যায় না। তখন বিচারে পুরো

ব্যক্তিত্ব। কামনার মায়া থেকে বাস্তবের পার্শ্বচারিণী রূপে দাঁড় করিয়ে দেয়। তার জোরে বিদিশা ওর পাশে জায়গা করে নিয়েছিল।

লিপিকার মায়ের তৈরি ফুলকো লুচি, কষা মাংসের লোভ উপেক্ষা করা যায় না। ওর রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত। বৃদ্ধরা কাছা গুটিয়ে মিস শেফালির একক অনুষ্ঠান দেখার লোভে দূর-দূরান্ত থেকে ত্যাগরাজ হলে আসছে। সেদিকে এক ঝলক তাকিয়ে, মুচকি হেসে লিপিকা বলত "এসবে কাজ নেই। অঙ্কটা বুঝিয়ে দে তো"

সাহিত্যেও সাবলীল। অঙ্কতে ভীত। সেই নিয়ে মা-বাবার চিন্তা। পড়াশোনায় ভালো বিদিশা। অঙ্কটা জলভাত। তাই ওর সংস্পর্শে, লিপিকার জ্ঞানের ব্যাপ্তি শুধু ওই নয়, ওর মাও জানত। তাই ওদের বাড়িতে বাড়তি খাতির। লিপিকা ঠাট্টা করে বলত "তোর তো পড়তেই হয় না। একবার শুনেই হজম করে ফেলিস। তোর মতো যদি মেমারি পেতাম, তাহলে সারাদিন সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে বেড়াতাম।"

ছোটবেলা থেকেই বিদিশার স্মরণশক্তি তুখোড়। অন্যদের পড়া ছড়া একবার শুনেই, অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারত। কেউ ওকে বেশিক্ষণ বই নিয়ে থাকতে দেখেনি। খুব বেশি ৪৫ মিনিট। তারপর, আর নয়। যা পড়ত, মাথায় গেঁথে যেত। অঙ্কেতে খুব ভালো। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৯% পেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়বে। কেন যে ডাক্তারি পড়তে এসেছিল, নিজেও জানে না। সুবিমলের হাব-ভাব-অহং, ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে। ডাক্তারিতে ঢোকার পর সেই অহংয়ের পারদটা তুঙ্গে। উচ্চ-মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করার পরও পাত্তা দিত না। সেটাই কাল। বোনের বন্ধু হিসেবে, যা একটু কদর। নয়তো, নিছক সম্ভ্রান্ত তরুণী। বিদিশার চরিত্রের একমাত্র বিন্যাস। ওর ইন্টেলিজেন্সকে পাত্তাই দিত না। অবজ্ঞাটা মনে গেঁথে গেছিল। সুবিমলের মুখে থাপ্পড় মারতেই ঝোঁকের বশে ডাক্তারি। তখন বোঝার মতো ম্যাচিওরিটি নেই - ভবিষ্যৎটা এগোর খেলা নয়।

হিসাব শেষ হয়ে গেছে। চারটেই মেজর বার্ন। চল্লিস-পঞ্চাশের বেশি। প্রোগনোসিস ভালো নয়। আইটিইউতে চালান করে, ওপথে এগোল। ভোর চারটে। বুঝেতে পারছিল না, এই অসময়ে, স্যারকে জানানো ঠিক হবে কি না। কনসালট্যান্ট-ইন-চার্জ। না জানালে, কোনও অঘটন ঘটলে, স্যারের বকুনি অনিবার্য "চারটে মেজর বার্ন ভর্তি হয়ছে। তিলজলার কারখানায় আগুনে। ওখানে শুয়ে ছিল"

"অ্যানালজেসিক দিয়েছ?"

"হ্যা, ডায়ামরফিন। ক্যাথেটার করেছি। বারক্লে অ্যান্ড মুইর ফরমুলা মতো ফ্লুইড দিচ্ছি"

"ডেফিসিট ফ্লুইড অ্যাড করতে ভুলো না। নইলে ফ্লুইড ব্যালেন্স কারেক্টেড হবে না। ইউরিন আউটপুট তিরিশের নীচে হলে জানিও। এক্সপেক্টেড আউটপুট ওয়ান মিলিলিটার পার কেজি বডি ওয়েট। সাতটা নাগাদ

যাব” ত্রিদিব নন্দী ফোন কেটে দিল।

আইটিইউর ডক্টরস রুমে সারারাত কাটিয়ে দেবে। ১৫ মিনিট অন্তর পেশেন্টকে দেখে আসবে। মনে হয় না বাঁচবে। মাঝ থেকে, লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের পকেটে বেশ কয়েক লাখ টাকা। নামেই উন্নত পরিষেবা। সরকারি হাসপাতালেও মরত। এখানেও মরবে। সরকারের আর্থিক অপচয়। এখানের উপচয়। বার্ন ইউনিট নেই। অথচ লাখের বিল করতে দ্বিধা নেই। খুব ভালোই জানে প্রথম ধাক্কা সামললালেও, স্টেরিলিটির অভাবে সেপ্টিসিমিয়ায় মারা যাবে। স্যারের কাছেই শেখা, বার্ন ইউনিট শুধু লেবেল লাগানো ঘর নয়। পুরো স্টেরাইল অ্যাটমসফিয়ার। অপারেশন থিয়েটারের মতো। জামাকাপড় চেঞ্জ করে, স্টেরাইল ড্রেস। ইনটেনসিভ কেয়ারও অন্যদের থেকে আলাদা। প্রতি পেশেন্টের জন্য নির্ধারিত নার্স। বেরিয়ার নার্সিং, টাস্ক নার্সিং। অপারেশন থিয়েটারও আলাদা। সর্বদাই সতর্কতা। যাতে ক্রস ইনফেকশন না হয়। এখানে বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতালে বার্ন ইউনিট নেই। কয়েকটা বেড ফেলে, লেবেল লাগিয়ে, লাখ লাখ কামাচ্ছে। কনসেপ্টও নেই, শেখার ইচ্ছেও নেই। লেবেল লাগিয়ে যদি লাখো কামাতে পারে, মন্দ কি। পাবলিককে বোকা বানানোর সহজ উপায়। নির্দ্বিধায় লাখ ফেলে ভাববে উন্নতমানের চিকিৎসা হচ্ছে। মরুক-গে। ভেবে কী হবে? মাস গেলে ২০,০০০ টাকা পেলেই হল। স্ট্যাটিসটিক্স পড়লে, কত ভালো হত। এতদিনে, আমেরিকায় বসে মোটা মাইনের চাকরি, ঘর সংসার। এমএস করে, রেজিস্ট্রারের চাকরি ছাড়া, আর কী-ই বা করার ছিল?

নিজেই জানে না, বিবাহিত অরণির সঙ্গে সম্পর্কটা কী। বিয়ের প্রশ্ন নেই। বউ থাকতে, কেন যে ওর প্রেমে পড়েছিল, জানে না। সেটাই কাল। এখন মুশকিল। না পারছে গিলতে, না পারছে ঘাড় থেকে নামাতে। ওর অমায়িক ব্যবহারটাই চরিত্রের নেগেটিভ পয়েন্ট। আড়ালে আন্তরিকতাই বিদিশার কৃষ্টি। সবেতেই সিনসিয়ারিটি। হৃদয়ের স্পর্শ। যতক্ষন না শেষ সীমায়। অন্যদের থেকে কষ্টও বেশি। বুক ফাটে, তো মুখ ফোটে না। কষ্ট পেলেও, কাউকে বলতে পারে না। আরও বেশি কষ্ট।

ডাক্তারিতে যখন ঢুকেছিল, তখন কত স্বপ্ন। এখন নেই। নোংরামো, ব্যবসা, দেখে ক্লান্ত। আজ সুযোগ থাকলে নতুন লাইনে পড়াশোনা করত। এখন সে গুড়ে বালি। এই করেই যেতে হবে। যা ভালো লাগে, তাই নিয়ে পড়লে শান্তি পেত। ভুলটা তারই।

চা খেয়ে উঠে পড়ল। পেশেন্টগুলোকে দেখতে হবে। একজনের ব্লাড গ্যাস অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম। ভেন্টিলেট করতে হতে পারে। ভাবছিল ইনটিউবেট করবে কি না? করলেই মিটার ওঠা শুরু। পুরো দস্তুর ইন্ডিকেশন না থাকলে অক্সিজেন মাস্কে চালিয়ে দেয়। ব্লাড গ্যাস আবার রিপিট করতে বলল। ফাঁকে,

পেশেন্টের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা। আইটিইউ-র বাইরে ওয়েটিং রুমে দেখল চিন্তাগ্রস্ত আগরওয়াল পায়চারি করছে।

ছিপছিপে চশমা পরা মেয়েটাকে দেখে, হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে “ক্যায়সে হ্যায় ডাকতার সাব?”

এড়িয়ে, বিদিশার পাল্টা প্রশ্ন “ক্যায়সে হুয়া?”

“কারখানে মে কিউ শোয়া মালুম নেহি। কভি কভি, দারু পিনে সে, উধারই রহ যাতা। উধার শোনে কে লিয়ে কই বার মনা কিয়া। শুনতা থা নেহি। বিবিকে ডর কে মারে দারু পিনে সে ঘর নেহি যাতা থা”

বিশ্বাস হচ্ছে না। গল্পটাও হজম করতে পারছে না। ডাক্তারি জীবনে এমন অনেক নাটক দেখেছে। সবাই যেন রবিন কুক।

“আগ্ ক্যায়েসে লগা?”

“মালুম নেহি”

আগরওয়ালের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল, দু-জন পুলিস আসছে। পুলিস দেখেই, আগরওয়ালের মুখটা ফ্যাকাসে। অনুমানটা তাহলে ঠিক। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

পুলিস জিজ্ঞেস করল “আপনি বার্নের চিকিৎসা করছেন?”

“হ্যা”

“ওদের থেকে স্টেটমেন্ট নিতে পারি?”

“এখন নিউরোজেনিক শকে। ডায়ামরফিন চলছে। এখন নয়”

“তবুও...” কর্তব্য শেষ করতে ব্যস্ত। সত্য উদঘাটনের জন্যে সময় দেওয়ার ধৈর্য নেই। কথার মানেই বোঝেনি।

“ঘণ্টা দুয়েক পর আসুন। একটু স্টেবল হলে নিতে পারবেন”

ওরা চলে গেল। আগরওয়াল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওরা জানেই না, কারখানার মালিক সে। তাহলে প্রশ্ন করত। জানলে, ফিরে আসবে।

আগরওয়াল বলল “ইনকে বাঁচনা বহত জরুরি। ইউনিয়ন লিডার। নেহিতো ফাঁস জায়েগা”

“দেখিয়ে ভাইসাব, ইউনিয়ন লিডার হো ইয়া আম আদমি, মেরে লিয়ে সব বরাবর। কোশিশ কর রহে, বাকি উপরওয়ালাকে মর্জি”

বাবার চাকরির সুবাদে ছোটবেলায় বিলাসপুরে থাকত। হিন্দির মধ্যেই বড়। কজের লোক বিন্দা কোলে করে রাহুৎ নাচ দেখাতে নিয়ে যেত। ওর কোলে বসে, নানান গল্প শোনা। গল্পগুলো মনে নেই। তবে হিন্দি উচ্চারণটা থেকে গেছে।

বিন্দা বলত “বাঙ্গাল সে তো কেয়া? হিন্দি রাষ্ট্রভাষা”

ছোটবেলায় শেখা মজ্জায় ঢুকে যায়। অজান্তে বহিঃপ্রকাশ। যেন ভেতরেই ছিল। ছোট্ট ছোট্ট স্মৃতি নিয়েই জীবন। অনেক স্মৃতিই হারিয়ে যায়। তবু কিছু স্মৃতি অম্লান।

একজনের ব্লাড গ্যাস অক্সিজেন কমে যাচ্ছে। ইনটিউবেট করে ভেন্টিলেটারে। ক্লোজড স্পেসে বার্ন। রেস্পিরেটরি ইনজিওরির আশংকা। কার্বন মনোক্সাইড লেভেল করলে সঠিক বোঝা যেত। সে গুড়ে বালি। চিকিৎসার নামে গ্যাজেটের চাকচিক্য। কাজের জিনিসগুলো মিসিং। যেখানে বার্ন ইউনিট নেই, চিকিৎসা প্রহসন। শুধু অর্থের জন্য। ডাক্তারির ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। স্যারেরা অনেক ভাগ্যবান। ডিগ্রির পর শেখার সুযোগ পেয়েছে। ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কাজ শেখার জায়গার অভাব। বিলেতের পথ প্রায় বন্ধ। অ্যামেরিকা মানে, পার্মানেন্ট এমিগ্রেশন। জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেছে। ব্যর্থতা, দুঃখ সেখানেই।

অরণি টাইম পাস। বয়েস তো আর থেমে নেই। বত্রিশে না করলে কবে, কাকে? এনআরআইকে বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি দেওয়া। কলকাতার কাওকে করলে অ্যামেরিকার আশা সুদূরে। ডাক্তারি ছেড়ে ঘরকন্না করাই শ্রেয়।

লেডি ফ্লোরেন্সের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রশস্ত মাঠ। মাঠের প্রান্তর ছাড়িয়ে, আকাশচুম্বী কলকাতার উঠতি হাইরাইজগুলো কুয়াশায় ঝাপসা। পাঁচতারা কলকাতার স্বপ্নের সঙ্গে মনের ছন্দ নেই। ছোটবেলার স্বপ্নের সঙ্গে বর্তমানের বাঁচার অঙ্কে বিস্তর গরমিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে ফিকে আলোর রশ্মি। তার মধ্যে কিছু হাতড়াচ্ছে।

সূর্য?

না, অদৃশ্য ধ্রুবতারা, চলার পাথেও?

ঠিক নিজেও জানে না। তবুও নিঃশব্দে একাকী খোঁজা। যদি হদিস মেলে।

দুই

রাস্তার পাশে, প্রায়-বিবস্ত্র নারীদেহ দেখে চমকে উঠেছিল আবুল মিয়া। পরনে নামমাত্র পোশাক। মনে হয় উচ্চবিত্ত পরিবারের। কলকাতার নতুন রাজপথের একপাশে বেশহীন পড়ে। বেঁচে আছে তো? সাড়ে পাঁচ ফিটের ওপর লম্বা। ফর্সা, ছিপছিপে গড়ন। সুন্দরী অনেক দেখেছে। সে শুধু খবরের কাগজের পাতায় কিংবা টিভি-সিনেমার পর্দায়। চাক্ষুষ এই প্রথম।

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। উঠব উঠব করে সূর্য আরেকটু বিশ্রাম নিচ্ছে। রাজেরহাট কানেক্টর এমনিতেই নির্জন। শেষ রাতের বাতিগুলো তখনও নেভেনি। এখনও পূর্ব কলকাতার রাজপথ, জনপথ হওয়ার সময় হয়নি। কুয়াসার ফাঁকে ভৈরবী নেই। এখানে ভোরের আলো ফোটার আগে, আকাশে বাতাশে আজানের ঝংকার ওঠে না। এখানে ভোর মানে, নিমের কলম দাঁতন হাতে, ঘটি নিয়ে, মাঠে বেরিয়ে পড়া। পঞ্চায়েতের খাটা পায়খানা থেকে উন্মুক্ত আকাশ অনেক ভালো। দুর্গন্ধ নেই। প্রাতঃকৃত্যর সঙ্গে সকালের নির্মল বায়ুসেবন ফোকটে। আগে কত পুকুর ছিল। সে সব ভরাট করে গরিব চাষিদের জমি সস্তায় কিনে, উঠতি বড়োলোকদের কাঁচা টাকা লুকোনোর স্বপ্ন বিক্রি করছে প্রোমোটার। উপনগরী করছে। জুটে যাচ্ছে কিছু অস্তিত্বহীন এনআরআই। টাকা থাকা সত্ত্বেও, স্বীকৃতির আশায়, মাছির মতো ভনভন করছে। মাঝেমধ্যে দেশাত্মবোধক বুলি আওড়ে আদর্শ বাঙালি হওয়ার চেষ্টা। টুপি পরছে বুদ্ধিজীবীর। দেশকে টুপি পরিয়ে হার মানছে এনআরআই টুপির কাছে।

ব্রিটিশ চলে গেছে গোলামির সভ্যতা রক্তে ঢুকিয়ে। সাহেবদের না হলেও বাঙালি অর্ধ সাহেবদের। বিদেশে থাকা সাহেব। সেই গোলামি সভ্যতার হাত ধরে, আরেক নতুন স্বপ্ন। উত্তর কলকাতার বনেদি বাবুদের মতো, একবিংশ শতাব্দীতেও পায়রা ওড়ানোর স্বপ্ন। ভাবছে, সভ্যতা এগোচ্ছে। খবরের কাগজে তার অগ্রগতির ফলাও বিবরণ। বিদেশি সভ্যতা নানা রূপে ঢুকে পড়ছে শান্তির স্নিগ্ধতায়। হারিয়ে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট-খাল-বিল। হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষের সরলতা। হারিয়ে যাচ্ছে, সুনিবিড় শান্তির নীড়।

এমনি ভাবে, একদিন হারিয়ে গেছিল, আবুল মিয়ার দু-বিঘা জমি। পূর্ব পুরুষেরর কম ফসলা চাষের জমি অভাবের তাড়নায়, নামমাত্র দরে বিক্রি করে দিয়েছিল। প্রোমোটারের কাছে কিঞ্চিৎ টাকার আশায়। বিবি অমিনা বাধা দিয়েছিল। শোনেনি। যা ছিল নিজের, আজ তা অন্যের। পরাধীনতার বায়ু সেবনের জন্য একটু আকাশ। সেখানে সকালের প্রাতঃকৃত্য সারা যেতে পারে। একটু সময় গড়ালেই, এই জমির ওপর বেড়ে ওঠা

সভ্যতার সোপানে ইট-বালি-সুরকি বয়ে দিনান্ত। ফতুয়ার পকেটে ঠিকে গুজে আমিনা বিবির ঘুঁটে দেওয়া উনুনের হেঁসেলে নাস্তা।

কাছে গিয়ে উঁকি মারল। আধা অনাবৃত স্তন। প্রাণের ইঙ্গিত নেই। এমন সুন্দরী তো রাজেরহাট মৌজায় বিরল। চোখ কচলাল। স্বপ্ন নয়তো? আবার তাকাল। শুধু সুন্দরী নয়, অপরূপা। সোনালি আভায় মোড়া ধবধবে ফর্সা দেহ। জলতরঙ্গ আবুল মিয়ার পঞ্চাশ-উর্ধ্ব দেহে। দাঁত মাজতে এসে, এ আরেক পাওয়া। হাত দিতে যাচ্ছিল স্বভাবসিদ্ধ পুরুষের আবেগে। মুহূর্তের জন্য থমকাল। হাতটা দেহের কাছে নিতেই, কে যেন থামিয়ে দিল। সাকিনার মুখটা ভেসে উঠল। ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। অজানা অচেনা অর্ধনগ্ন যুবতী মুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করে তার মেয়ে সাকিনা। সাহায্যের হাত মেলে ফতুয়া দিয়ে ঢেকে দিল। লজ্জা নারীর ভূষণ, আবরণ। ইহলোক কিংবা পরলোকে। না পরিয়ে তার কাছে যাওয়া যায় না। সাকিনার সামনে সে এভাবে থাকতে পারবে? বেঁচে আছে তো? ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। কিছু করতেই হবে। জানতে হবে বেঁচে কি না। একটু ঝুঁকে বোঝার চেষ্টা করল। নাঃ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কান নাকের কাছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। মানে এখনও বেঁচে।

"কে আছিস কোথায়? তাড়াতাড়ি আয়" হাঁকডাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই জুটে গেল এক গুচ্ছ লোক। কৃষ্টির তকমা আঁটা শহুরে বাবু নয়। পাশের লোককে থাপ্পড় খেতে দেখেও নির্বিকার, নিষ্পৃহ, কাজের আছিলায় সরে পড়া বাবু নয়। হোক না মেয়েটি অন্য দুনিয়ার। মানুষ তো।

এভাবে পড়ে না থাকলে, এই মেয়েটিই নাক সিটকে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, গাড়ি চালিয়ে চলে যেত। রাস্তায় গাড়ি আটকালে, মিষ্টি হেসে, মুখটা অন্যদিকে বেঁকিয়ে, ইটালিয়ান লেদারের পার্স খুলে, কিছু টাকা ছুড়ে দিত। অসময় সাহায্যের জন্য নয়। গরিবদের টাকা ছুড়ে মানবিকতাকে কেনা।

"হাসপাতালে নিয়ে চল্। লেডি ফ্লোরেন্সে"

দ্রুতগতি লরিকে থামালো। বেঁচে থাকা, অচৈতন্য, ফতুয়া মোড়া সুন্দরীকে হাজির করল ইমার্জেন্সিতে।

"কী হয়েছিল?" সুদর্শন উদগ্রীব চাষাদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ম্যানেজার সুরোত্তম মুখার্জি বলল "স্যার, ভর্তি করা যাবে না।" ম্যানেজাররাও ডাক্তারদের বাপ। মালিকের মাইনের দাস। এদের থ্রু দিয়েই মালিক তার বক্তব্য পৌঁছে দেয় ডাক্তারের কাছে "টাকা ডিপোসিট দেওয়ার মতো কেউ নেই। চাষাভুষো মানুষ। বিল দেবে কী করে?"

"ফোটানোর চেষ্টা করলে ভাঙচুর..."

"ম্যানেজ করুন স্যার। নইলে চাকরি যাবে"

মহা ফ্যাসাদ। কী করবে? ফোরফ্রন্টে সে একা। তাকেই ম্যানেজ করতে হবে। একদিকে উদগ্রীব পাবলিক, তরতাজা জীবিত সুন্দরী। অন্যদিকে চাকরি। এর নাম কর্পোরেট ডাক্তারি। কেন যে শালা ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল! বেশ্যাবৃত্তিরও অধম। ওদেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। ডাক্তারদের নেই। সুদর্শন বুঝতে পারে না, বাবুটা কে? কর্পোরেট হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট, না গরিব অসহায় আম-জনতা? যেই হোক না কেন, বলির বখরা যে সে, সেটা জানা। একটা উপায় বার করতে হবে।

উদগ্রীব পাবলিককে বলল "আপনারা কয়েকজন আমার ঘরে বসুন। পেশেন্ট দেখে আসছি"

পেশেন্টের রেস্পিরেশন, পালস, ব্লাড প্রেশার ঠিক, অথচ অচৈতন্য। সুদর্শনের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

নন-প্র্যাকটিসিং মেডিক্যাল কলেজের মাস্টারের যা ছিরি, কেউই ওয়াকিবহাল নয়। যাদের অন্য গতি নেই, তারাই সরকারি হাসপাতালের নগণ্য মাইনের শিক্ষক। রবিবারে লুকিয়ে চুরিয়ে ছোটখাটো নার্সিংহোমে টুকটাক প্র্যাকটিস। শেখাবার তাগিদও নেই, ইচ্ছেও নেই। মাস মাইনে দিয়ে কী আজকের মেহেঙ্গায় ঠিকভাবে সংসার চালানো যায়? তাই তো সুদর্শনের মতো নেক্সট জেনারেশন - ভোর রাতে সহায় সম্বলহীন, জ্ঞানহীন, বাজারে 'আধুনিক' শিক্ষা ব্যবস্থা। সামনে বিপুল জনতা। পেছনে করপোরেট। বাঁচার উপায়, অন্য কারও হাতে দায়িত্ব দিয়ে সটকে পড়া। ভাবছে, কী করে সেটা করবে।

খুব খারাপ ছাত্র ছিল না। উচ্চ মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিল। ডাক্তারিতেও। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনে ঢুকতে না পেরে, সব কেমন অর্থহীন। এমবিবিএসের কদর নেই। হাঁচি-কাশিতেও স্পেশালিস্ট। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন কনসেপ্টটাই উঠে গেছে। রোজগারের জন্য একটা চাকরি। ব্যাস। আগ্রহও নেই, মনও লাগে না। মাস গেলে মাইনে।

সেটা ঠিক রাখতে দেরি না করে ইমার্জেন্সি কন্সাল্ট্যাণ্ট শ্রীজিৎ বসুকে ফোন "হ্যালো স্যার, রাজারহাটের কুড়ি-তিরিশজন চাষি একজন মড ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছে। আনকনসাস। সুরোত্তম মুখার্জি বলছে, ডিপোসিট ছাড়া ভর্তি করা যাবে না। কী করি?"

"অ্যালাইভ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আনকনসাস"

"ইমার্জেন্সি বেডে রেখে মনিটার করো। ভর্তির দরকার নেই। ছাড়বেও না। নটায় রাউন্ডে দেখি, কী হয়েছে"

এই জন্যই শ্রীজিৎ বসু কনসালট্যান্ট। খুব ভালোই জানে, পেশেন্টকে ছেড়ে দিলে ভাংচুর হবে। মিডিয়া স্ক্যাম হলে, তাকেই ঝামেলা ফেস করতে হবে। এসব পিআরও নাইট সিফটে হাসপাতালের খরচ বাঁচালেও, এরা ম্যানেজমেন্টের কিছুই বোঝে না। ঠেলা তাকেই সামলাতে হবে।

বাইরের জনতাকে সুদর্শন বলল “ভর্তি করব না। ইর্মাজেন্সি ওয়ার্ডে রেখে দিচ্ছি। বাড়ির লোকের খোঁজ পেলেন?”

মাথা নাড়ল খালি-গা, লুঙ্গি পরা, আবুল মিয়া। নাঃ, এদের থেকে বেশি কিছু জানা যাবে না। হাসপাতালে রাখবে জেনে, ভিড় হাল্কা হচ্ছে। মানবিক দায়িত্ব খালাস। এখন হাসপাতাল আর ডাক্তারবাবুদের দায়িত্ব। এর নাম, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল কেয়ার। ভোটের লোভে মন্ত্রীদের, মানবতার রং মিশিয়ে বড় বড় বুকনি। ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিসমেন্ট অ্যাক্টের ফুলঝুরি। গাদা গুচ্ছের অ্যাসোসিয়েশন। এই পেশেন্টের খরচ কে জোগাবে? চেনা-জানা কারও হদিস মিললে ভালো হত। এখন দায়িত্ব হাসপাতাল আর ডাক্তারদের। রাম-রাজত্বের স্বপ্ন তো ভাঙতে পারে না? গদি থাকবে না। যতদিন স্বপ্ন, ততদিন নেতা, মন্ত্রী, গণতন্ত্র, আন্দোলন, বিপ্লবের বুলি, নীতি দুর্নীতির চর্বিতচর্বণ। যতক্ষণ মানুষ স্বপ্ন দেখবে, ততক্ষণ ওরা বেঁচে। যেদিন ঘোর কাটবে, সেদিন... সবই ঈশ্বর নামক এক অদেখা অজানা অনুভূতিতে সমর্পিত।

যা দেখি, তাই সত্য।

যা জানি, সেটাই ঠিক।

যা বুঝি, সেটাই পৃথিবী।

সেটাই তো মানব জীবন। পুজোর জন্য মূর্তি চাই। অনুভূতির জন্য মানুষ চাই। বেঁচে থাকার জলজ্যান্ত রসদ চাই।

ভিড় হল্কা হলেও, আবুল মিয়া যেতে পারছে না। কেবলই সাকিনার মুখটা চোখে ভাসছে। হাসপাতালের বাইরের রকে এসে বিড়ি ধরাল। ভাবছে, কোত্থেকে কে মেয়েটাকে এভাবে রাস্তায় ফেলে গেল?

দেশ যত সভ্য হচ্ছে, এগোচ্ছে, বিদেশিয়ানার খোলস খুলে, বাবুদের আসল রূপ প্রকাশ্যে। যখন এ সড়ক হয়নি, তখনও তো কলকাতা ছিল। আজকের নয়া কলকাতা নয়। সেখানে বিবস্ত্র কোনও সুন্দরীকে রাস্তায় ফেলে রাখা হত না। পুকুর ছিল, গ্রাম ছিল, আম-জাম গাছের ছায়া ছিল। আর ছিল, কম বয়সের আমিনা বিবির লণ্ঠন হাতে খাওয়ানোর সুখ। ঘরে আসার প্রতীক্ষা। সাকিনার আধো আধো কথা। বোরখা ঢাকা আমিনা বিবিকে কখনও অসুন্দর মনে হয়নি। এ যেন একটা উদীয়মান সভ্যতার বুকফাটা কান্না। সেই কান্না, আবারও মনে করিয়ে দিল তার সাকিনাকে। ঝাঁ চকচকে হাসপাতালে, লুঙ্গি, খালি-গা, মুটে-মজুর আবুল মিয়া বেমানান। বরং আমিনা বিবির দাওয়ায়, পেয়ালা হাতে, সাকিনার এগিয়ে দেওয়া চায়ের কাপটায় মানানসই। বিড়িটা ছুড়ে ফেলে উঠে দাড়াল। বাড়ি যেতে হবে। গত বছরের ইদে কেনা ফতুয়াটা গেল। সে যাক। তার সাকিনাকেই দিয়েছে। ঝকঝকে রোদে, গামাছা গলায় রাজেরহাট মৌজার দিকে পা বাড়াল।

শ্রীজিৎ বসু নাড়ী টিপে দেখল। ঠিকই চলছে। পালস্ ৭৫, রেসপিরেশন ১৮, পিউপিলস রিঅ্যাক্টিং টু লাইট। সব প্যারামিটারস ঠিক। তবে আনকনসাস কেন? হেড ইনজিওরি? বমি হয়েছে কি না কেউ বলার নেই। কতক্ষণ পড়ে আছে, কেউ জানে না। কারণ জানতে হবে। ড্রাগ খায়নি তো? খেয়ে থাকলেও, এখন বোঝা যাবে না। অবর্সাভেশন করা ছাড়া কোনও গতি নেই। এভাবে তো ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সারাদিন ফেলে রাখা যায় না। বাইরে রিসেপশনিস্টকে বলল "দ্যাখো তো, বাড়ির কেউ আছে কি না"

দশ মিনিট বাদে, সে জানাল "স্যার, কেউ আসছে না"

"যারা নিয়ে এসছিল, তাদের খোঁজো"

রিসেপশনিস্ট আবার খুঁজতে বেরিয়ে গেল। ঠেলা সামলাও। জনদরদি জনগণ হাওয়া। এই মহিলাকে নিয়ে কী করবে? কে-ই বা বিল মেটাবে? এর নাম নতুন প্রচলিত অ্যাক্ট। ইমার্জেন্সি ভর্তি না করলে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে টানাটানি। মিডিয়া তোলপাড়। জনগণের আবেগে ভাংচুর হতেই পারে। নইলে, খরচ পকেট থেকে ভরো। এখন, তাকেই ঠেলা সামলাতে হবে। এর নাম কর্পোরেট চাকরি। উটকো ঝামেলা। বয়স বাড়ছে। এ সব ঝামেলা আর ভালো লাগে না। ইর্মাজেন্সি সার্ভিসের বদলে সোশাল সার্ভিস। এর জন্যই কী ইর্মাজেন্সি মেডিসিনে এফআরসিএস? দেশে ফিরতই না, যদি না, বাবা হঠাৎ মারা যেতেন। মা একলা। ফিরতেই হল। নয়নিকা চায়নি। ওখানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ব্যাঙ্কে স্থায়ী চাকরিও পেয়েছিল। বাড়ি, গাড়ি, ইচ্ছেমতো জীবন। এখানে এসে বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

রিসেপশনিস্ট ফিরে বলল "না স্যার, কাউকে পেলাম না। বোধহয় চলে গেছে"

অবসারভেশন করা যাক। পরে দেখা যাবে, বিল কে দেয়...

লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল রাজেরহাট কানেক্টরে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় নারী।

তিন

সায়ন্তনি অরণিকে তীর্যক কটাক্ষ করে বলল "ইউ স্টিঙ্ক। ডিড ইউ নো দ্যাট? ইওর মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি ইজ ড্রাইভিং মি ক্রেজি। হ্যাড আই নোন, উডন্ট হ্যাভ ম্যারেড ইউ"

"হোয়াই ডিড ইউ?"

"বিকস মাই ফুলিস ফাদার থট, ইউ ওয়ারে ব্রাইট গাই। আই উড বি সেকিওর ইন ইওর হ্যান্ডস। সিকিউরিটি, মাই ফুট্। ড্যাড হ্যাস এনাফ ডস টু গিভ মি সিকিউরিটি। ডোন্ট নিড ইওর মিডল-ক্লাস ফিলসফিস"

অরণি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে। প্রায়শই শুনতে হয়। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম দিকে প্রতিবাদ করত। এখন আর করে না। করে লাভ নেই। স্বাস্থ্যের অপব্যয় ছাড়া, আর কিছুই করতে পারবে না। সায়ন্তনি শোনার মেয়ে নয়। বাবা-মায়ের কথাই শোনেনি। আজ শুনবে! সারা জীবন নিজের মতোই চলেছে। যা চেয়েছে, করেছে। কারও ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করেই। শেষবার, যে কথাটা শুনেছিল, তার জন্য আজও আক্ষেপ। বাবার কথায়, ব্রিলিয়েন্ট ছেলে অরণিকে বিয়ে করেছিল। তাই, জীবনটা আজ স্তব্ধ। বিয়ে নামক সম্পর্কের মোহমুক্ত মায়াজাল। রজনীগন্ধার মালার বদলে, কাঁটার মালা।

নিস্পৃহ অরণিকে দেখে, গা রি রি করে, রাগে আরও বেশি ঝলসে "ইউ আর আ শেম অফ এ হিউম্যান বিয়িং। আই পিটি ইউ"

"বাট আই ডোন্ট" বলতে গিয়েও থেমে গেল অরণি। বলে কী হবে? এ মেয়ে তো বোঝবার নয়। বুঝবেও না। কোনও দিনও বোঝেনি। আসলে, ওকে বুঝতে শেখানো হয়নি। এখন বৃথা।

কী যে ভীমরতি হয়েছিল। তখন বোঝেনি। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে রুচিরা কী বলতে চেয়েছিল। বুঝলে বিয়েটা হত না। বোধহয় অন্যরকম হত।

মধ্যবিত্ত ঘরের, লাবণ্যময়ী রুচিরা। সে ছিল বড় কাছের বন্ধু। ওরাও মধ্যবিত্ত। রুচিরাও তাই। রুচিতে মিল।

রুচিরা বলত "আমাদের কোথায় যেন অদ্ভুত মিল"

কোথায় কেন? সর্বত্রই। পোশাকে-মননে-জীবন দর্শনে। মিল না হলে, কলকাতার আনাচে কানাচে, একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে? কলেজ স্ট্রিট থেকে নন্দন, বাবুঘাট থেকে ঢাকুরিয়া লেক। মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার স্নাতক। পড়াশোনা করতেই এসেছিল। প্রেমে পড়তে নয়। স্কটিস চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে উচ্চ মাধ্যমিক। যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে সুযোগ পেল, মা ভেবেছিল হিল্লে হয়ে গেল। বড় আদরের অরণি। লোকে বলত, মায়ের নেওটা। তা বলুক, তবু মাকে প্রণাম না করে, কোনও দিনও বেরোত না। বাড়ি ফিরলে, আদরের ছেলের জন্য নিজের হাতের নাড়ু, মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ মজুত। ছেলে, পড়া-কলেজ, বাড়ি এই নিয়েই মজে ছিল।

বৈঠকখানা লেনের পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িতে তাদের ছোট্ট সংসার। পাড়ার মোড়ে, এস পালের লটারির টিকিট কেনা ছাড়া, বিশেষ নেশা ছিল না। সিগারেট খেত না। মদ! স্বপ্নেও ভাবা যায় না। বাইরে ডিমপট্টিতে বেরোবার অবকাশ ছিল না। তাই ঘর-বাড়ি-কলেজ। মাঝে জানলার ফাঁক দিয়ে, উল্টো দিকের বাড়িটা। আনমনে চেয়ে থাকা। ভালোবাসত বই পড়তে। একা থাকতে ভালোই লাগত। ভালো ছেলে হতে হবে। সেই ভালো ছেলে যে, কী করে রুচিরার প্রেমে পড়ল, সেটাই আশ্চর্য। আসলে, এই বই পড়ার নেশাটাই হয়েছিল কাল। রুচিরাও বই পড়ত।

দে’জ পাবলিসিংয়ের তাকগুলো ঘুরে ঘুরে, নতুন বইগুলো উলটে পালটে দেখছিল। মাসের কোটা মতো, দুটো বই কিনতে পারে। তাই কোন বই দুটো নেবে, ফ্লিপ পেজগুলো উলটে পালটে দেখছিল। লক্ষ্যই করেনি, পাশে তাঁতের শাড়ি পরা মেয়েটাকে। কারণও ছিল না।

হঠাৎ, পায়ে একগাদা বই পড়তে কাতরে উঠল। ভাগ্যিস বইগুলোর ওজন খুব একটা নয়। ডাক্তারি বই হলে, পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এ তো শুধু গল্পের বই। পাতা ভারী তত্ত্বের বই নয়। তাই ব্যথার চেয়ে মানুষটার দিকেই নজর। কচি কলাপাতা তাঁতের শাড়ি। চোখটা ঠেকেছিল মেয়েটির মুখে। ডিম্বাকৃতি শ্যামলা রঙের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম। সাদামাটা, ৫ ফিটের একটু বেশি। চোখের মায়া কাজলনয়না হরিণীর কথা মনে করায়। লম্বা বিনুনি শ্যামলা পিঠের ওপর এলিয়ে। দেহে নয়, একবার তাকালে চোখের কাজলে দৃষ্টি আটকে যায়। লাবণ্য ঠিক চটকে নয়। স্নিগ্ধ কোমল মোহময় উজ্জ্বলতা।

“ইস্, আপনার লেগেছে?” ভ্রু কোঁচকানো কাতর মিনতি।

“না তেমন নয়” লিকপিকে কালো অরণি লাজুক।

“আজকাল ভীষণ অসর্তক হয়ে যাচ্ছি। লক্ষ করিনি। এই বইটা টানতে গিয়ে, সবগুলো পড়ে গেল”

অরণি বইগুলো তুলতে গিয়ে বলল “নাঃ, ঠিক আছে”

অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ, আবার চোখ পড়ল শ্যামলা মুখের কাজলকালো চোখে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এর আগে তো কখনও এমন করেনি। ভেতরে একটা মোচড়। চলে যেতেই হবে। অথচ মন চাইছে

দু-চোখ ভরে ওই কাজলনয়নাকে দেখতে। তাকের পাশে প্রচুর লোক। বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

পাশ থেকে একজন বলল “দাদা, পথ আটকে থাকবেন না”

“বাইরে, উঠোনে আসবেন” মেয়েটির কথায় ফিরে তাকাল। নিঃশব্দে উঠোনে।

“কোথায় পড়েন?”

“প্রেসিডেন্সি”

“বাংলা অর্নাস?”

অরণি হেসে ফেলল “নাঃ। ফিজিক্স। আপনি?”

“আপনার কলেজেই। ইকনমিক্স”

দুজনেই বিজ্ঞানের ছাত্র, অথচ খুঁজতে এসেছে বাংলা গল্পের বই। মানে বিজ্ঞানের বাইরে, দুজনেরই একই ছন্দ। বৈঠকখানা লেনের কার্নিসের ফাঁক দিয়ে পুরনো কলকাতাকে দেখা ছাড়াও, কোথাও বৈচিত্র থাকতে পারে। বইয়ের বাইরে। কোনও নারীর কোমল স্পর্শে।

“আমার নাম রুচিরা। আপনার?”

“অরণি”

“আপনার কী তাড়া আছে?”

“কেন বলুন তো?”

“চলুন কফি হাউসে বসি”

মন চাইছিল, আরও কিছুক্ষণ কাটায় মেয়েটির সঙ্গে। সাহস ছিল না সে কথা বলার। রুচিরা যেন, সেই চাওয়াটাকে কাছে নিয়ে এল।

লিপস্টিকের প্রলেপ লাগিয়ে সায়ন্তনি বলল “আজ রাতে খাব না”

প্রথম প্রথম, বিয়ের কয়েক বছর চেষ্টা করেছিল জিজ্ঞেস করতে। কোথায় যাচ্ছে? কখন ফিরবে? বেশিরভাগ সময় সদুত্তর পায়নি মুখঝামটা ছাড়া। পেলেও, তার সঙ্গে, বাস্তবের কোনও মিল ছিল না। এখন জিজ্ঞেস করাই ছেড়ে দিয়েছে।

এর নাম বুঝি বিয়ে! এটাই বুঝি বিবাহিত জীবন। এই জীবনের জন্যই কি এত কষ্ট করে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছিল? ভাগ্যিস্ মা আজ বেঁচে নেই। থাকলে কত কষ্টই যে পেত। মরে গিয়ে বেঁচেছে। না হলে, এমন বউয়ের মুখঝামটা রোজ শুনতে হত। বুড় বয়সে সেটা আরও বেদনাদায়ক।

অরণির মাঝেমধ্যে মনে হয়, জীবনটাই বেদনার। আগের জন্মের প্রায়শ্চিত্ত। যদি মৃত্যু ডেকে নিত, মুক্তি পেত। তার সাহস নেই মৃত্যুকে বরণ করার।

বিদিশার সঙ্গে কিছু মুহূর্ত আনন্দে কেটে যায়। সেটুকুই পাওয়া। কাজের বাইরে, বাঁচার মূলমন্ত্র। বিদিশাকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। সায়ন্তনি কোনও দিন ডিভোর্স দেবে না। বিয়ে মানে তো, আরেকটা সায়ন্তনি। ছড়ি ঘোরাবে মনের আকাশে। প্রেম, অনুভূতি, স্বপ্ন হারিয়ে যাবে। প্রতীক্ষাও ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাবে অন্তহীন শূন্যতায়। বেঁচে থাকবে, পুঞ্জীভূত বেদনা। আবার নিরালা নির্জনে গড়ে ওঠা, একাকিত্বের আর এক প্রাসাদ।

সায়ন্তনি কথার জের টেনে বলল "না-ও ফিরতে পারি"

বউ রাতে বাড়ি ফিরবে না, এ তার মধ্যবিত্ত জীবনে ভাবাও পাপ। কিছু বলারও অধিকার নেই।

রসিকতা করেই বলল "আমাকেও মাঝেমধ্যে নিয়ে গেলে পারো"

"তোমাকে! ইউ মাস্ট বি জোকিং আউট অফ ইওর মাইন্ড। ওখানে তোমার রোল কী? তার চেয়ে, ঘরে বসে ভগবদ্গীতা পড়। আত্মার পুণ্যি হবে"

ভগবদগীতা পড়লে ক্লাব পার্টিতে যাওয়া যায় না, কে বলেছে? কোথাও লেখা আছে? শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অর্জুনকে সেকথা বলেনি। সায়ন্তনিকে বলে লাভ নেই। ভগবদ্গীতা নামটা শুনেছে, পড়েনি। বেশি বলতে গেলে নিজের ভগবদ্গীতা আওড়ে দেবে। তার হজমের মানসিকতা নেই। শুনেও লাভ নেই।

সারাজীবন সায়ন্তনির ভগবদগীতা হজম করছে "তোমার ওই আদর্শ-ফাদর্শ ধুয়ে কিসসু হবে না। কিছু টাকা রোজগার করতে পারো, এই পর্যন্ত। তাও তেমন কিছু নয়। যদি বাবার মতো করতে পারতে, বুঝতাম। তাহলে কিছু একটা। আইটি সেক্টরে মামুলি চাকরি। তোমার মুরদ ওই পর্যন্তই। এর বেশি কিছু হবে না।

"এর বেশি কিছু হলেই বা কী হত? ডিজায়ারের বদলে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি চড়লে, হরিপুরী কী হয়ে যেত?"

"তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই। বৈঠকখানা লেনের থেকে এর বেশি আর কী ভাববে?"

"কেন গাড়ি বাড়ি না ভাবলে, কিছু ভাবার নেই?"

"থাকবে না কেন? তোমার ওই রোবট কম্পিউটার। গাদা গুচ্ছের বই। কী যে আনন্দ পাও ওর মধ্যে, বুঝি না" সায়ন্তনির হতাশা স্পষ্ট।

অরণি কিছু বলতে যাচ্ছিল। সায়ন্তনির ফোনটা বেজে উঠল "হ্যালো"

"রাতে আসছিস তো?"

“সিওর। অ্যাট নাইন শার্প। কান্ট মিস দ্য পার্টি টুনাইট। এস্পেশালি হোয়েন ইট ইজ অ্যান অর্গি। গুড ফান। নেভার টেস্টেড অ্যান অর্গি বিফোর”

হায় রে! বউয়ের এসব কথা মুখ বুজে হজম করতে হচ্ছে । লাজলজ্জার মাথা খেয়েছে। বুঝতে পারছে না, কোন যুগে বেঁচে।

এ কি তার কলকাতা! না কি, অন্য আরেক। একবিংশ শতাব্দীর। বিংশ হোক, আর একবিংশ, এ কলকাতা তার নয়। সায়ন্তনির। নব্যসভ্যতার মুকুট পরা, বিদেশিয়ানা ধার করা, নিউবর্ন কলকাতা। এই নগরজীবন কি বিদেশের।

অরণি বিদেশে যায়নি। জানে না, পাশ্চাত্য সভ্যতা ঠিক কতটা ‘প্রগতিশীল’। বিদেশে গেলেও, ছোটবেলা থেকে বই পড়ে এটুকু বুঝেছে, এটা কোনও প্রগতির পথ নয়। বুঝলেও, কীই বা করা? মধ্যবিত্ত ঘরের অরণির এত সাহস নেই মুখ ফুটে বলে ‘না, এটা ভুল। এটা কোনও প্রগতি নয়। আত্মার অধোগতি।’ বললেই বা, শুনছে কে? মুখে লাথি মেরে ‘বৈঠকখানা লেনের দু-চিলতে কামরায় গিয়ে পড়ে থাকো’ গোছের বিদ্রূপ ছাড়া, ওর কপালে যে বেশি কিছু জুটবে না, তা ভালোই জানে।

রুচিরাকে দেখলেই অরণির মনে পড়ে যেত রবীন্দ্রনাথের কথাঃ

ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে
মুক্ত বেণী পীঠের পরে লোটে
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ

রুচিরা বলত “আমি জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে বরণ করে নিতে চাই” আর কীভাবে বলতে পারে, একটা মেয়ে।

অরণির বৈঠকখানা লেনের পৃথিবীতে বই, কেরিয়ার ছাড়া আর ভাবার কিছু ছিল না। বোসপুকুর? সে তো অনেক দূর।

বোসপুকুরের বাসিন্দা, এখন বস্টনে বসে, নিশ্চয়ই এখনও সেই রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দর বুক ভরা ঘ্রাণ নিচ্ছে। ওই পাওয়াটাই আজ সত্যি। কেবল অরণির বোঝার ভুলে সেদিনের থেকে, আজকের তফাত অনেক। প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে, এগনোর দিশাও। উত্তরপ্রান্ত থেকে অন্য কোথাও। লোকে বলবে, রুচিরা এগিয়েছে। সত্যি এগিয়েছে। অরণির চেয়ে তো বটেই।

এগোনোর মানেটাই ধোঁয়াশা। যে যেভাবে ভাবব্যক্ত করে। যেভাবেই করুক না কেন, গন্তব্য একটা থাকতেই হবে। একটা তারা - তার লক্ষ্য ধরে এগিয়ে যাওয়া। গন্তব্যে পৌছে, সেই তারার রং বা অবস্থানটা কেন যে পালটে যায়, সে আজও বোঝে না।

ময়দানে বইমেলায় রুচিরার সঙ্গে ঘুরত। বই দেখা শুধু নয়। উন্মুক্ত বাতাসে জীবনের স্পন্দন পেতে। একদিন, রুচিরা একটা বই তুলে বলল "এটা পড়েছ?"

"কী বই?"

"পড় দেখো। ফ্যান্টাস্টিক। নোবেল প্রাইজ পেতে পারে"

নাম 'অ্যালকেমিস্ট'। লেখক পলো কোহেলো। বইটা নাড়াচাড়া "তুমি বলছ? তাহলে কিনেই ফেলি"

কিনে পড়েও ফেলেছিল। পরে শুনেছে বইটার প্রচুর বিক্রির কথা। এখন বোঝে কেন নোবেল প্রাইজ পায়নি। বেশিরভাগ উপনিষদ থেকে নেওয়া। নিজস্বতা না থাকলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় না।

রুচিরা ভাবতে জানে। রুচিও অরণির সঙ্গে মেলে। এহেন মেয়ে অরণির বন্ধু হবে না, তো কে হবে? সেই বন্ধুত্বের ঘেরাটোপে, মুহূর্তটাকে নিজের মতো করে পাওয়ার মধ্যে, প্রিন্সেপ ঘাটের নিরালায় ওরা তারা খুঁজত। নাম না জানা তারা। ধ্রুবতারা কি না, তাও অজানা। তবুও নিঃশব্দে বসে তারা গোনা। অরুন্ধতী, স্বাতী, হস্তা বা মৃগশিরা। নাম জানা নেই। শুধু অন্ধকারে পাশাপাশি নিঃশব্দে, খোঁজার মধ্যেই আনন্দ। রুচিরা সেই আধো অন্ধকারে, খুঁজে পেয়েছিল তার ভেতরের সুর। কোমল থেকে নিখাদে তার রেশটুকু টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, পাশে বসা অরণির ছোঁয়ায়। ভালোলাগা। ভালোবাসা। অনুভূতিকে পাথেয় করে, পেতে চেয়েছিল, নক্ষত্রের ঠিকানা।

"তোমার পাশে বসে কী ভালো লাগে বোঝাতে পারব না"

নিঃশব্দে বসে অরণি শুনত। বুঝতে পারেনি, রুচিরা কী ইঙ্গিত করছে। কী বোকাই না ছিল। রুচিরা নিজের মনে আওড়াতঃ

দিনান্তের শেষ পলে, রবে মোর মৌন বীণা মুর্ছিয়া তোমার পদতলে,

আর রবে পশ্চাতে আমার নাগ কেশরের চারা,

ফুল যার ধরে নাই,

আর রবে, খেয়াতরী হারা এপারের ভালোবাসা...

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভালোবাসত। অরণিও। ব্যস ওটুকুই। ওর বাইরে কখনও ভেবে দেখেনি। দেখলে আজ সায়ন্তনির মুখঝামটা খেতে হত না।

"তোমার পাশে বসে তারা গুনতে যে কী ভালো লাগে!"

"আমারও। যদি অনন্ত কাল ধরে তারার দিকে চেয়ে থাকতে পারতাম..."

রুচিরা অবাক তাকিয়ে বলেছিল "সত্যি?"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি"

সেই সত্যিটা কি আজ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল, পাওয়ার এই মায়াজালে? অরণি বোঝেনি এই সত্যিটাকে। সেই মুহূর্তে পাওয়ার মায়াজালটাই সত্যি ভেবেছিল। এর আগে, ভাবতে পারেনি। তাই মুছে যেতে বেশি দেরি হয়নি। পাওয়াকে শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে, তারা গোনার মধ্যে, বই পড়ার মধ্যে, সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। এগোনোর কথা ভাবেইনি। আজ এই হারানোটাই বড়। যদি রুচিরার কথার মাঝে সত্যিটাকে বুঝতে পারত, হয়ত আজ সেই দুনিয়ায় পৌঁছে যেত। হারানোটাকেই কি পাওয়া বলে, আজ বরণ করে নিতে পেরেছে? জানে না।

রুচিরা হারিয়ে গেছে বস্টনের শিক্ষিত সভ্য সমাজে। প্রিন্সেপ ঘাটে বসে তারা দেখার ওর কাছে কোনও মূল্য আছে কিনা, জানে না। সায়ন্তনির মতো অর্থ, বল, প্রতিপত্তি পেলে হয়ত সব-ই পাওয়া হয়ে যায়। ছোটবেলার একটুকরো নীরব স্মৃতি কী এখনও রুচিরার মনে নাড়া দেয়? এখনও কী বস্টন বের আকাশে, কোনও এক সুন্দর সন্ধ্যায়, রুচিরা কারও সঙ্গে তারা গোনে? জানে না।

এটুকু জানে, তারাটা ঠিক থাকলেও আবেশটায় ওলট পালট। স্নিগ্ধতা হারিয়ে গেছে। মলিন হয়ে গেছে সে অনুভূতি, হিসেবের জালে। সেই জালে, থরে থরে ফুল বিছানো। তবুও ফুলের এই শয্যায় প্রিন্সেপ ঘাটের তারা গোনার স্নিগ্ধতা, আবেগের কোমলতা নেই। স্মৃতি হয়ে নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে মনের আকাশে বাতাসে। হিল্লোল তুলছে নিঃশব্দে বারবার, লেডি ফ্লোরেন্স হসপিট্যালের প্রাঙ্গণে। মনে হয়, চাওয়াটা আজও মরে যায়নি।

সায়ন্তনির ব্লাউজটা বড্ড লো-কাট। এক সময়, গা ঘিনঘিন করত। শাড়ি কাঁধ থেকে আনায়াসেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কারণে-অকারণে। স্তনের মধ্যভাগের গভীর খাদটাকে যেন বারবার জনসমক্ষে উন্মোচিত করার জন্যই এই অহেতুক এক্সারসাইজ। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। এটাই সায়ন্তনি পরবে। এভাবেই ও চলবে। যত বয়স বাড়ছে, উৎকর্ষ হারিয়ে যাচ্ছ। ঝুলে যাওয়া চামড়ার বাহারে ততই আরও বেশি স্খলন। হাবে-ভাবে-স্বভাবে। এইভাবেই ওকে চলতে হবে। যে পৃথিবীতে ও বাতিল, সেই পৃথিবীতেও জায়গা করে নিতে হবে। যে ভাবেই হোক না কেন।

আসলে জীবনের দুটো দিকের মধ্যে, একদিকে জেতা, অন্যদিকে হারা। বেশিরভাগ দ্বিতীয়ভাগে পড়লেও, তাকে অস্বীকার করে। এগোতে চায় প্রথমের দিকে। এর বাইরে যেন বাঁচার আর কোনও মন্ত্র জানা নেই।

তবুও, শেষ চেষ্টা করল "জামাটা উগ্র লাগছে না?"

"এটাই চলে। আজকের ফ্যাশন। তুমি অন্য যুগে রয়েছ"

“তুমি ঘরের বউ” অরণি বোঝাবার চেষ্টা করল।

লিপস্টিকের প্রলেপ লাগিয়ে সায়ন্তনি ঝাঁঝিয়ে উঠল “তোমাকে আর ঘরের বউয়ের সঙ্গে ফ্যাশন মেলাতে হবে না”

গাঢ় খয়েরি লো-কাট ব্লাউজের থেকে চোখ নামিয়ে নিল। হাজার হোক, বিয়ে করা বউ। এভাবে সায়ন্তনিকে দেখতে চায় না। কিছু করার না থাকলেও, আশা তো করতেই পারে। আশার প্রলেপে স্বপ্নের পৃথিবীর মায়াজালে বন্দি থাকতে চায়। মায়ার পৃথিবীটাই পাওয়া। তাকে আঁকড়ে দাম্পত্য জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তার স্বপ্ন ঘিরে বেঁচে থাকা। খয়েরি কাঞ্জিভরম মানানসই হলেও, ছোট ব্লাউজ উঁচু বুকের উগ্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিয়ের পরে, এই স্তনযুগল আকৃষ্ট করলেও, এখন বিদ্রোহ, অরণির প্রতি। প্রচলিত মধ্যবিত্ত সংস্কারের প্রতি। বিদ্রোহী ভঙ্গিমায় সায়ন্তনি শাড়িটাকে কাঁধে ফেলে বলল “তোমাকে আমার সাজগোজ নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার বই নিয়ে থাকো। একটা বাচ্চা দিতে পারলে না, আমি কী নিয়ে বাঁচব?”

“তা বলে...”

“কী ভাবে আমি বাঁচব, সেটাও তুমি ঠিক করে দেবে? বৈঠকখানা লেন থেকে অনেকদূর এগিয়েছ। আর বেশি এগিয়ে কাজ নেই। তুমি পড়ে থাকো তোমার মধ্যবিত্ত মন নিয়ে। আমাকে বাঁচতে দাও, আমার মতো করে”

অরণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে বৈঠকখানা লেনের ছেলে। বালিগঞ্জের মেয়ের যোগ্য নয়। আর কেউ না বুঝুক, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। এখন শুধু বাঁচা নিজের দুনিয়ায়। বিদিশা সেখানে কতখানি, জানে না। তবুও ভাবতে ভালো লাগে, সে আছে। এই ভাবাটুকুই, বেঁচে থাকার সার। এগিয়ে চলার পাথেয়।

সান্ত্বনা পেত, যদি রুচিরা তাদের ভালোবাসার ভাবনাটুকু নিয়ে পড়ে থাকত। বস্টনের মেটিরিয়াল জগতে কেউ পেছন ফিরে তাকায় না। সবাই এগোতে চায়। রুচিরাও... সাহেবি মায়াজালে। হয়ত স্বামী পুত্র নিয়ে, মার্সিডিজ বেঞ্জ বা বিএমডব্লিউ-র স্বপ্ন দেখছে। ফুলদানিতে গোলাপ সাজাচ্ছে। ডাইনিং সেটের সঙ্গে সোফাটা মানানসই হল কি না ভাবছে। সেটাই জীবন। পুরনো স্বপ্ন আঁকড়ে, অনুভূতির পাহাড় তৈরি করে, জীবনটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া নয়।

সায়ন্তনি কাকে ফোন করছে “আই অ্যাম লুকিং ফরোয়ার্ড টু টু-নাইটস্ পার্টি। নেভার টেস্টেড দ্যাট বিফোর”

কানটা গরম হয়ে যাচ্ছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বেশি শুনতে চায় না। সত্যটাকে না শুনলে শান্তি পাওয়া যায়। সায়ন্তনি ওর চলে যাওয়ার দিকে না তাকিয়ে, আয়নায় নিজেকে আরেকবার দেখল। শাড়ির পাট

ঠিক করে, নীচের ঠোঁটে লিপস্টিকের হাল্কা প্রলেপ বুলিয়ে নিল।

এই ঠোঁট দেখে শোভনেশ পাগল। কতবার আবেগ বুলিয়ে দিয়েছে। নিবিড় ভাবে কামড়ে। সায়ন্তনির সু-উচ্চ বিদ্রোহী স্তন শুধু বাধা নিবিড়তরো আলিঙ্গনে।

শোভনেশকে দূরে সরিয়ে, ভ্রু কুঁচকে তিরস্কার করত "ভুলে যেও না, আমি বিবাহিত"

"বিয়ে করেছ বলে কি সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দেবে?"

"শোভনেশ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ডোন্ট ফ্যান্সি ইউ ফিজিক্যালি"

"হোয়াই নট? অ্যাম আই আগলি?"

"নট অ্যাট অল। ইন ফ্যাক্ট, কোয়াইট হ্যান্ডসম। জাস্ট আই ডোন্ট ফ্যান্সি ইউ সেক্সচুয়ালি। মাই পেরোগেটিভ, কান্ট ইট?"

শোভনেশের পৌরুষকে থাপ্পড়। তার, না-চমক লাগানো শারীরই অহং। চুমু খাওয়া পুরু ঠোঁটের স্পর্শটা বিস্বাদ। আবেগ দুম করে ফানুসের মতো জ্বলে উঠে নিভে গেছিল। মেয়ের পেছনে লাগতে গিয়ে থাপ্পড় খাওয়ার চেয়েও সাংঘাতিক। কষে চড়।

সায়ন্তনিকে বুঝতে পারেনি শোভনেশ। অপমানে লজ্জায়, চোখ তুলে তাকিয়েছিল ওর দিকে। যেখানে কোনও প্রতিবাদ নেই, সেখানে প্রত্যক্ষ বিদ্রুপ হজম করাও কঠিন।

শোভনেশের কটাক্ষ দৃষ্টি ধূলিসাৎ করে, সায়ন্তনি বলেছিল "নট দ্যাট আই অ্যাম অ্যাডভার্স টুওয়ার্ডস সেক্স, বাট সামহাউ অর আদার, ইউ ডোন্ট ফিট ইন্টু মাই সেক্সচ্যুয়াল ফ্যান্টাসিস। সরি শোভনেশ, দ্যাটস্ দ্য ওয়ে আই অ্যাম"

দ্যাটস্ দ্য ওয়ে সি ইজ। হোয়াট ওয়ে? শোভনেশ কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। ঝলকে ওঠা হাসির ফাঁকে লিপস্টিকের শেষ প্রলেপটুকু লাগিয়ে, আয়নায় মুখটা আরেকবার দেখে বেরিয়ে গেল।

আজকে নতুন অভিসারের রাত। নতুন ছন্দের রাত। বৈচিত্রহীনতার মধ্যে আলোর ঝলসানির সম্ভাবনা। কল্পনার মায়াজালকে বাস্তবে রূপায়িত করার। না দেখা পৃথিবীকে ভোগ করার। অরণি এসব বুঝবে না। ও যদি বুঝত, নতুন পৃথিবীর দিশা পেত। একঘেয়ে জীবনে সেটাই স্পন্দন।

মরুক গে...

চার

"দ্যাটস্ ইট" দেবজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এর পর আর কোনও কথা হয় না। কোনও কথা চলে না। বেদবাক্যের মতো শেষ কথা বলে দিয়েছে। আর কোনও কথা শুনতেও চায় না।

আগে ছিল লাল বাড়ির সাবেকি ইঁটগুলো। এখন হুগলির ওপারের সাদা-নীল। এই বেদবাক্য শুনতে অভ্যস্ত। যেমন যুগ-যুগান্ত ধরে উন্নয়নের বুলি। ভাষাটা রেকর্ডবন্দি পঞ্চাশ বছর ধরে। সব কিছুর পরিবর্তন হয়। মুখ পালটে যায়, রং পালটে যায়, ব্যাপ্তিও। কোনও নতুন রাগের রেশ জোড়া হয় পুরনো রেকর্ডের খসখসে আওয়াজে। অনাদি অনন্তকাল একই রেকর্ড বারবার রি-প্লেড হয়, নতুনের নামে, নতুনের সুরে।

লাল-বাড়ি থেকে নীল-সাদা। ইটগুলো দেবজিৎকে চেনে। বুঝতে পারে না, চিরাচরিত বেদবাক্যের বুলি না ছড়িয়ে, কী করে এখনও টিকে? আগে তো হয়নি। এ যেন, অন্য গ্রহের মানুষ। বেদবাক্য বলে না। কিন্তু যা বলে, তা বাস্তবে বেদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী। এ যেন অন্য এক দেবজিৎ। অ্যান্ড্রু ওয়েবার থেকে অনেক আলাদা। তখনও আইএএস হয়নি। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি পাশ করে কর্পোরেট জগতে সবে প্রবেশ। বিয়ের পরেই প্রথম অ্যাবরশন। রুমা স্বাভাবিক ভাবেই মনমরা। দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়েনি। স্বভাবতই বিষণ্ণতা তাড়া করে বেরিয়েছে অ্যান্ড্রু ওয়েবারের প্রাঙ্গণে। সবাই ছোটার নেশায় মগ্ন। উঠতে হবে, এগোতে হবে, জিততে হবে, জিততে গেলে লেঙ্গি মারতে হবে। এটাই জীবনের ধর্ম। বাইরের দেবজিৎ একেবারেই বেমানান। উদাসী বাউলের স্থান এই ময়দানে নেই।

চাকরি আছে। উদাসী বাউল কিন্তু তার মধ্যে নেই। তা বলে কী চলে? পাঁচজনের সুরে সুর মেলাতে হবে। নইলে কাটো। এক রকম, এক-ঘরেই করে ফেলেছিল দেবজিৎকে। রোজ বসের কাছে নিত্যনতুন মিথ্যে অভিযোগ। বস্‌ও তেমনি। উঠতি সাহেব বাঙালি। যে মাঝরাতে সুন্দরীর প্রভাবে কর্মযজ্ঞ নির্ধারণ করে, সে কী করে বুঝবে দেবজিৎকে? বুঝতেও পারেনি। চায়ওনি। বরং চাটুকার মাদকতায় মশগুল। দেবজিৎ প্রায় কোণঠাসা। একদিন বলতে বাধ্য করেছে "আই রেসাইন"

চাকরি নেই। আইএএস-এর জন্য পড়া ছাড়া কোনও গতি নেই। রুমার স্বল্প মাইনের স্কুলের চাকরি। সদ্য সন্তানহারা। হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নটাকে বুকে আঁকড়ে দেবজিতের কেবলই মনে হত হোয়েন ইট রেইনস্, ইট পোরস্। তবু বাঁচতে হবে রুমাকে নিয়ে। বাঁচতে গেলে, এসব ছোটখাটো ছেনালি ফেলে সামনের পথে চিন্তা। তাই, সত্যিটাকে ঢাল করা।

অনান্য অফিসাররাও এই ঢালের আবরণে ঢাকা দেবজিৎকেই চেনে। তারাও জানে, এরপর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এরপর আর ও কোনও কথা শুনবে না।

দেবজিতের দিকে তাকিয়ে "যদি মন্ত্রী না মানেন? কী হবে?"

"আমি কী করে বলব? যা বলার বলে দিয়েছি। আর কিছু বলার নেই"

কী করে যে চাকরিতে এখনো টিকে, কে জানে? নেহাত সরকারি চাকরি বলেই? না কি, পলিটক্যাল ইডিওলজি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেবজিৎকেই প্রয়োজন? মন্ত্রীমণ্ডলীর চিন্তাধারাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে, বাস্তবের পথ বাতলে দিতে পারে। উচ্ছ্বাস নেই, কোথাও একটু একগুঁয়েমিও নেই, চাপানোর কোনও চেষ্টাও নেই। স্বভাবিক চিন্তাধারাকে ওদের সামনে মেলা। আর্কষণ নিজগুণে। তাই লালবাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলেও, সাদা-নীল বাড়িতে দেবজিৎ বহাল তবিয়েতে।

ওর বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বই এমন। এই দৈনন্দিনতা খুবই পরিচিত। খেলার মধ্যে থেকেও নেই। সেজন্যেই তাকে নিয়ে মন্ত্রী-আমলারা নিশ্চিন্ত। নিজের আবরণটাই, বর্তমান দুনিয়ার আভরণ। ওকে ভয়ের কিছু নেই। ভালোবাসলে, চাইলে, অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। আর কেউ না জানুক, দেবজিৎ জানে। কথা থামিয়ে হঠাৎ বক্তব্যের ইতি টানা, কোনও এগো নয়। ছোট থেকেই বরাবর এরকম কাটছাট কথা বলে দেবজিৎ। সে জন্য ছোটবেলায় বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। শত্রু যে কম জুটিয়েছে, তাও নয়। যারা তার কাছের এভাবেই তাকে মেনে নিয়েছে।

ছোটবেলায় বন্ধুরা খেলতে ডাকত।

"তোরা যা, আমার ভালো লাগছে না" ওদের আসর থেকে পালাবার চেষ্টা।

"এরকম করছিস কেন? চল্ না খেলবি"

খেলাতে সবাইকে ছাপিয়ে। ব্যাটটা ফেলে বলত "তোরা খেল। একটু ঘুরে আসি"

ঘোরা কিছু নয়। পাখির ডিম খোঁজা। কোন পাখি, কোন জায়গায় বাসা বাঁধে, কোন পাখি, কোথায় ডিম পাড়ে, পাখির ডানার রঙের সঙ্গে গলার আওয়াজের কোনও সামঞ্জস্য আছে কি না। উদ্দেশ্যহীন, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এতেই আনন্দ। ক্রিকেটের ব্যাটে ছক্কা মারার থেকেও। সব-সময় যে উদ্দেশ্য ছিল তাও না, নিছকই শুধুমাত্র আনন্দের জন্য।

ছোটবেলার স্বভাব একটুও বদলায়নি। পরিণতি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না দেবজিৎ। ভাগ্য তো লেখা হয়ে গেছে। সেই সুরে সুর মিলিয়ে চলতে হবে, যেখানেই নিয়ে যাক না কেন। তার জন্য যে খুব একটা চিন্তাও আছে, তাও নয়। চিন্তা করে কোনও ফল হয়নি। যা হওয়ার, ঘটে গেছে। অসহায়ের মতো

আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে উত্তর খুঁজেছে। কর্ম-ধর্ম উত্তর দিতে পারেনি। ছোট্ট একটা মন মোহনা খুঁজে নিয়েছে।

হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য আইএএসদের নিজেদের মধ্যে, মুখ চাওয়া চাওই করতে দিয়ে। মন্ত্রী আর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির মধ্যে ওরাই সেতুবন্ধন। দেবজিতের কথাটা গুছিয়ে মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে পেশ করতে হবে। যাতে ওঁরা আবার অসন্তুষ্ট না হন। আফটার অল, দেবজিৎ ওদের বস। তাকেও খুশি রাখতে হবে।

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বলল "স্যার, ম্যানেজ করতে পারবেন?"

"করতেই হবে। যে করেই হোক। আফটর অল, উনি সিএম-এর এত কাছের লোক। ওনার গায়ে আঁচও পড়বে না। কোপটা পড়বে আমাদের ওপর"

ওরা উঠে পড়ল। দেবজিৎ ছকটা সাজিয়ে দিয়েছে। সেটাকে রূপায়িত করতে হবে, কাউকে না চটিয়ে। বসে থেকে মাইনে গুনলে চলবে না। ভাবতে হবে -কাজে, ঘুমে, জাগরণে। রাতে, কিছু একটা ভেবে উপায় বার করতে হবে। ডেপুটি সেক্রেটারি অমলেশ সামন্ত চিন্তিত, উঠে পড়ল। গিন্নিকে নিউ মার্কেট থেকে তুলতে হবে। বন্ধুরা মিলে শাড়ি দেখতে গেছে। মন্ত্রীর কথা রাতে ভাবলেও চলবে। গিন্নি সময় মতো গাড়ি না পেলে, রাতে হাঁড়ি চড়বে না।

আসলে, দেবজিতের অসম্ভব নিজস্বতা। সেটা, কোনও মতেই বিক্রি করতে চায় না কিছু পাওয়ার লোভে। আগ্রহও নেই। এই বৈশিষ্ট্যই তার উত্থানের কারণ। শত্রুতারও উৎস। তাতে অবশ্য ওর কিছু আসে যায় না। ও সব খেলার বাইরে। ছোটবেলা থেকেই এই বৈশিষ্ট্য তার নিজস্ব। কলকাতার ছেলে নয়। তাই কলকাতার বৈশিষ্ট্যগুলো কোনোটাই ছিল না। ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে বাবা স্টিল প্লান্টে চাকরি করত। শৈশব কেটেছে বিদ্যাসাগর কলোনিতে। সন্ধেবেলা খুব একটা অবসর বিনোদনের অবকাশ ছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঠেঘাটে বেড়িয়ে পড়া, মাইলের পর মাইল হেঁটে, ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে পাখির ডাক শোনা। শেখা, কোন ডাক, কোন পাখির। দিব্যি কেটে যাচ্ছিল এই অর্থহীন একাকিত্বে। তবুও ভালো লাগত আকাশ, বাতাস, ঝোপ-ঝাড়, পাখিদের ঐকতান। ভালো লাগত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে নিজেকে হারাতে। অন্যরা যখন খেলছে, বাউন্ডুলের মতো খেলা ছেড়ে হারিয়ে যেত এখানে ওখানে, জন-মানবহীন শূন্যতায়। নিরালা পৃথিবীর একাকি মায়ালোকে।

এই হারিয়ে যাওয়ার নেশায়, অজানাকে জানার আশায়, এমনি এক সন্ধেতে, পশ্চিমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিল পিচ রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে সিএমআরআই কলোনির দিকে। সামনে ঘন জঙ্গল। তার ফাঁকে কাঁচা মাটির সরু পায়ে চলা পথ। গুটি গুটি ঢুকে পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। ওর মতো, রাস্তাটাও ভয়

পেয়েছিল। জঙ্গলটা বেশ ঘন। কাঁটা গাছের ঝোপ। শিয়াকুলের ছোট ছোট গাছের ভিড়। কয়েকটা বৈঁচি গাছ উঁকিঝুঁকি মারছে। ফাঁকে-ফাঁকে, নানান নাম-না-জানা ছোট ছোট গাছের ভিড়। কিছু হলুদ-গোলাপি গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরা তীব্র গন্ধওয়ালা ল্যানটানার দল এধার-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ছোট ছোট গাছের ভিড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বড় গাছের দল। যেন দেখছে, ছোট গাছেগুলো কেউ দুষ্টুমি করছে কি না। লম্বা মাথা শাল, গোল মাথা মহুয়া, সাদা গায়ের অর্জুন, গোলগোল ফলওয়ালা বয়রা। আরও অনেক গাছ। নাম জানে না।

ভয় জাগানো জঙ্গলটার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই বুকে, তেরো বছরের ছোটখাটো দেবজিতের একবার মনে হল, বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু সামনে অদম্য কৌতূহলের পাত্র। কাপালিকের কথা মনে পড়তেই ওর হাত মুঠো হয়ে গেল। একটা অচেনা অদম্য টান বুকের মধ্যে মোচড়াচ্ছে কেন? জানে না। জানতে আরও পঁচিশ বছর। ঘর ভেঙে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার বাউল টানকে চিনতে অনেকগুলো বছর।

"টি... টি... টি... টি..."

একটা তীব্র তীক্ষ্ণ পাখির ডাকে হঠাৎ দেবজিতের চমক ভাঙল। হকচকিয়ে গেল। কিছু না ভেবেই ঢুকে পড়ল জঙ্গলের সেই সরু রাস্তায়। এক দুই তিন চার। প্রতি পদক্ষেপে ঘর পিছনে সরে যাচ্ছে। সামনে অজানা অচেনা বিস্ময়। তেরো বছরের মন এর বেশি বিশ্লেষণ জানে না।

রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। দুপাশের গাছের ডালপালাগুলো কখনও কাছে এসে গায়ে থাপ্পড় মারছে, কখনও বা সমীহ করে জায়গা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ডানদিকে কী যেন একটা ডাকতে শুরু করল। টক... টক... টক... টক। তেরো বছরের ছোট্ট হৃদৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠে দুপদাপ ছুটতে শুরু করল। কিন্তু তার মালিকের খেয়াল নেই। যেতে হবে, যেতে হবে, সামনে ছুটতে হবে, কাপালিকের কাছে। দেবজিৎ ছুটছে, আর ছুঠছে... কতক্ষণ ছুটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎই রাস্তাটা একটা ছোট ফাঁকা জায়গায়। বাগানের মতো, কিন্তু ঠিক বাগান নয়। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা। বাঁ পাশে একটা জবাফুলের গাছ। কয়েকটা টগর। সামনে মাটির একচালা ঘর। পিছনে একটা ঠাকুর্দামার্কা বিশাল বটগাছ। তার পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে মাটিতে ছোটছোট গোলগোল আলোর চাকতি তৈরি হয়েছে। মাটির ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একটা কালীমূর্তির আদল টের পাচ্ছে। সাপের ভয়ে যে বুকটা একটু কেঁপে ওঠেনি, তা নয়। তবে মুহূর্তের জন্য।

এই-ই তাহলে কাপালিকের কালীমন্দির!

লক্ষ্যে পৌঁছানোর আনন্দে দেবজিৎ হঠাৎ আত্মহারা। পেরেছে! সে শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছতে পেরেছে। দাঁড়িয়ে একটু একটু করে দম, সাহস বাড়িয়ে নিল। মাটির ঘর, মন্দিরের দিকে এগোল। একটু উঁচু দাওয়া, বাঁশের খুঁটি, খড়ের চাল। দরমার দরজা হাট করে খোলা। দাওয়ার একদিকে একটা চাটাইয়ের আসন।

সামনে কানা উঁচু খালি থালা। অন্যদিকে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি জড়ো করে রাখা। তার উপরে লাল কাপড়। খোলা দরজা দিয়ে এবার কালীমূর্তিটা পরিষ্কার। পাড়ার কালীপুজোর মা কালীর মতোই, শুধু রংটা ঘোর কালো। মনে হচ্ছে জিভটা বেশি লাল। চোখদুটোও যেন একটু বড়। চোখের সাদাটাও লালচে। মা কালীর সামনে একটা আসন। একটা ঘট, উপরে কিছু ফুল।

হঠাৎ দেবজিতের চোখ পড়ল ঘরের বাঁ দিকের কোনায়। একটা মরচে পড়া বিশাল খাঁড়া! সে দিকে তাকিয়ে হৃদৎপিণ্ডটা প্রায় থেমে যায় আর কী!

"কে রে তুই?" হঠাৎ জোর গলায় প্রশ্ন শুনে দেবজিৎ ভীষণ চমকে গেল।

পিছনে ফিরেই দেখে বিরাট এক পুরুষ মূর্তি। লম্বা, খুব-ই রোগা, পরনে একটা লাল কাপড়, খালি গা, খালি পা। বুকের লোমগুলো সব পাকা। তার উপর ঝুলছে, লাল মোটা পৈতা। বুকের উপরেই নেমে এসেছে, পাকা দাড়ির জঙ্গল। চাপা নাক, আর জ্বলজ্বল করছে লাল চোখ দুটো। ঠিক মা কালীর চোখের মতো। মাথায় বড় বড় জটা। কপালে লাল টিপ, আকারে ছোট, গল্পে পড়া কাপালিকের চোখের মতো বিশাল নয়।

"কে তুই?"

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনে, ভয়ে দেবজিতের সম্বিৎ ফিরল। হঠাৎই ভেতরে একটা তীক্ষ্ণ ভয়ের অনুভূতি। মেরুদণ্ডের নীচ থেকে শিরশিরানি মাথার পেছনে।

"আমি, আমি..." কথাই বেরচ্ছে না।

"কোথা থেকে এসেছিস?"

"আমি দেবু, মানে দেবজিৎ। এ-জোনে থাকি" ওর শুকনো গলা থেকে এর বেশি কিছু বেরল না।

"এই জঙ্গলে কী করছিস?" কাপালিকের গলা একটু যেন নরম।

"আমি কাপালি... মানে কালীমন্দির দেখতে এসেছিলাম" মনে মনে জিভ কাটল কাপালিক কথাটা বলার জন্য।

"কাপালিক!" সাধুবাবার গলায় একরাশ বিস্ময়।

"এখানে কাপালিক!"

একটু হেসে বললেন "বুঝেছি, আমায় দেখতে এসেছিস?"

তারপর হঠাৎই কথা থামিয়ে কাপালিক হাসতে শুরু করল। দেবজিতের মনে হল, ঠিক কাপালিক-মার্কা হাসি নয়। বাড়িতে, বাবা-কাকারা যেমন হাসে, অনেকটা সেইরকম-ই।

"না, মানে, আমি..." কী বলবে ভেবেই পাচ্ছে না।

হাসি থামতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। এগিয়ে দেবজিতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন “ছাপ লেগে গেছে ব্যাটার। সারা জীবন ছুটে মরবে” ওর হাত ধরলেন “এ রকম একা একা জঙ্গলে আসবি না। অন্তত এখন নয়। অবশ্য, পরে তোকে আসতেই হবে”

আরও কিছুক্ষণ কথা বললেন। কিছুই দেবজিতের মাথায় ঢুকল না। কেবল ছড়ার মতো একটা লাইন ছাড়া অপানিপাদো জবনোগ্রহীতা। তার মানে জানতে আরও অনেক বছর লেগেছিল।

কাপালিকের দেওয়া ছোট্ট কলা হাতে নিয়ে দেবজিৎ যখন ফেরার পথ ধরল, মনটা কী রকম অবশ।

সেই প্রথম সাধু দর্শন। সেদিনই শুনতে পেয়েছিল আর এক পৃথিবীর শব্দ। সেই শব্দ, কোনদিন সুর হয়ে ঝরে পড়েছে জীবনের আকাশে-বাতাসে, বুঝতেও পারেনি। তার জীবনের ছন্দ। তার মধ্যেই পাওয়ার আনন্দ। সেই ছন্দের গতিতে এগোতে অ্যান্ড্রু ওয়েবারের পৃথিবীতে সে যে অচল, কিছুদিন পরে হলেও, বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

সাদা-নীল বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে, তাজ বেঙ্গল বা সোনার বাংলার ফোয়ারায়, অথবা সল্ট লেকের সাজানো ফ্ল্যাটে, সেই সুর আজও তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

পরের দিন সকালে অমলেশ সামন্ত বলল “স্যার একটা উপায় বার করেছি”

দেবজিৎ নিষ্পৃহ, তাকাল অমলেশ সামন্তর দিকে “কী?”

“মন্ত্রীকে আপনার নাম না করেই প্ল্যানটা পেশ করব”

“আপনি যা ভালো বোঝেন”

কেউ না বুঝলেও, দেবজিৎ অনুভব করছে, অজান্তে এক বিরাট পরিবর্তন আসছে। উত্তর কলকাতার বাবুদের পায়রা ওড়ানোর স্বপ্নর অন্য রূপে আত্মপ্রকাশ। পায়রা ওড়াবার শৌখিনতায় জব চার্নকের কলকাতা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিদেশি মাল্টিন্যাশনালের কাছে। নতুন সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে। অবদমিত শিক্ষিত নিষ্ঠাবান একদল নিজেদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করে দেবে। সৃষ্টি করবে কলকাতার ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়। সাধারণেরা হারিয়ে যাবে, বিলুপ্তির অন্ধকারে। স্বজন-পোষণে যারা বলীয়ান তারাও মিলিয়ে যাবে।

এতদিন যারা কিছুই করতে পারেনি, বিদেশি মাল্টিন্যাশনালের আগমনে, কর্মদক্ষতার বাজার দর বুঝে নেবে টাকার অংকে। তাদের এই প্রয়াসকে, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করবে বিশ্বের দরবারে। আবার ফিরে আসবে যোগ্যের সম্মান। বেঁচে উঠবে সহায়-সম্বলহীন-হারিয়ে যাওয়া দক্ষ অসংখ্য মানুষের নতুন আশা। তার থালায় নতুন ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে রচিত হবে আগামী কলকাতার ইতিহাস। কলকাতাকে বিশ্বের আসনে

বসিয়ে, নিজেরা বিক্রি হয়ে যাবে বিদেশি প্রগতির কাছে। পায়রা ওড়াবার জমিদারির শখ পূর্ণ হবে, পূর্ণ হবে যোগ্যের আসন। এদের আবাহন করে চলবে প্রগতির রথ। বিশ্বায়নের আরেক রূপ।

দেবজিৎ যেন দেখতে পাচ্ছে, এই অবশ্যম্ভাবীকে। একে রোখার কারও ক্ষমতা নেই। সেদিনও কি এখানকার মানুষ ভাববে - এই প্রগতি কি তারা চেয়েছিল? বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রেখে হারিয়ে যাবে জব চার্নকের মতো কেনা-বেচার হাটে। কোনও এক মাল্টিন্যাশনাল নতুন রূপে কিনে নেবে দেশটাকে। আলেকজ্যান্ডার বা হিটলারের মতো নয়। কিনে নেবে ন্যাশনাল ইকনমির শেষ কপর্দক।

তাতে দেবজিতের কী আসে যায়? সে তো এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির এক নাটবল্টু মাত্র। তার পৃথিবী এর থেকে অনেক আলাদা হলেও। পড়ে আছে, সেই কাপালিকের আশ্রমে কিংবা লালমাটির বাউলে।

এভাবে হারানোর মধ্যেই জীবনের ছন্দ। হারিয়ে গেছে একবার...বারবার...

কখনও বাংলার কোনও এক নির্জন কোণে, কখনও দূর-দূরান্তে অজানায়। এর মধ্যেই জীবনের ছন্দ, পার্থিব জীবনের আনন্দ। অজানা অচেনা সে-কোন পৃথিবী হাতছানি দেয়। যেন তার খুব কাছের। যা দেখেও অদেখা। অনুভবের মধ্যে। তাকে চেনার নেশায়, মন নেচে ওঠে। দূর নীলিমায় যেখানে দিগন্ত মেশে অসীম অনন্তের মধ্যে, সে খুঁজে পায় পাওয়ার ছন্দ। পার্থিব জীবনে বাঁচার অবিরল আনন্দ। তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখান। বাউলের সুর, পাহাড়, সাগর তাকে টানে। প্রকৃতি যেন প্রতিদিন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে নিজ ছন্দে।

ছোটবেলায় শোনা লালান ফকিরের গান খাঁচার ভিতর অচীন পাখি কেমনে আসে যায় - পেতে ইচ্ছে করে। সুর ভরা দূর নীলিমায়, তারা ঘেরা চন্দ্রিমায়।

প্রকৃতির আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে। সুদূর তাকে ডাকছে। দূর থেকে যেন মৌমাছির গুঞ্জন। অসংখ্য পাখির কলকাকলি। কাছে এসে বোঝা গেল ওটা পাখির ঐকতান নয়, মানবের কলতান। শব্দটা মেলার। একসঙ্গে সবাই চেঁচাচ্ছে। অসংখ্য মাইক। বিচিত্র ক্যাকোফনি।

বর্ধমান জেলায় অজয়ের দক্ষিণ পারে শিবপুর। গাড়ির রাস্তা এখানেই শেষ। এরপর কেঁদুলি পর্যন্ত পায়ে হাঁটা। অজয়ের উপর একটা ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ বানানো হয় প্রতিবছর। আর প্রতিবছর-ই বর্ষায় অজয়ের বানে ভেসে যায়। নদীর উপর বোল্ডার আর মোরাম ফেলে একটা লম্বা বাঁধের মতো। মাঝখানে বড় বড় পাইপ ফেলে জল যাওয়ার ব্যবস্থা। ফলে বাঁধের পশ্চিম দিকে নদীর শুকনো বুকে জল জমে ভদ্রস্থ চেহারা। তখন সেখানে স্নান করার মতো জল পাওয়া যায়।

দেবজিৎ বাঁধের দিকের রাস্তা ধরল।

অসম্ভব ভিড়। বেশিরভাগই গ্রামের লোক। একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছে, আর উগরে দিচ্ছে একরাশ। এসব লোক কোথায় থাকে, কে জানে। বিচিত্র চেহারা সব। সত্যজিৎ রায়ের অশনি-সংকেত মার্কা সিনেমায় দেখা যায়।

নেমেই সব ছুটছে। ধুতির খুঁট হাতে ধরা। অন্য হাতে, একটা সস্তা রেক্সিনের ব্যাগ। পেছনে সস্তা সিনথেটিক চড়া রঙের শাড়ি পরা কালোকালো বউ। অবাক চোখে এধার ওধার চাইতে চাইতে বরের বকুনি আর হোঁচট খেয়ে ছুটছে। কারুর সঙ্গে ছেলেমেয়ে। তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। চার দিকে কত কত অবাক করে দেওয়া আকর্ষণ ছেড়ে বাবার পিছনে ছোটা।

দু-পাশে অনেক অনেক দোকান। কোনটাতে খেলনা বিক্রি হচ্ছে, কোনওটাতে তেলেভাজা। আর প্রত্যেকেই তারস্বরে চেচাচ্ছে, “ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল”

এক বিচিত্র অবাক করা হযবরল। ভিড় ঠেলে এগোনোই মুস্কিল। তার মধ্যে দিয়েই এগোল দেবজিৎ। ব্রিজের কাছাকাছি এসে চক্ষু চড়কগাছ। ব্রিজ কোথায়? এত একটা সলিড মানব-অজগর। পুরো নদীর উইডথটা জুড়েই লোক আর লোক। এক ইঞ্চিও ফাঁক নেই। পুরোটা যেন একটা বিশাল সরীসৃপ, নিযুত-মাথা এক অতিকায় অজগর।

কোনও উপায় না দেখে দেবজিৎ সেই স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিল। কষ্ট করে হাঁটার কোনও দরকার নেই। পিছনের লোকের ধাক্কাতেই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। সরু ব্রিজ। দুপাশে অজয়ের বিস্তার। বাঁ দিকে বাঁধে আটকানো হাঁটু পর্যন্ত জল। তাতেই হাজার হাজার লোক স্নান করছে। নানা বয়সের মানুষ। ডানদিকে জল খুব কম। কিন্তু তাতেও বহু লোক স্নান করছে। ব্রিজেরে ওপর, জলের ধারে, অসংখ্য ভিখারি। বেশিরভাগই মহিলা। অনেকের হাতে বা পায়ে হলদে-লাল রং দিয়ে কৃত্রিম ঘা আঁকা। ভিক্ষে পাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট। সবার সামনেই একটা করে ন্যাকড়া। তাতে কিছু চাল আর খুচরো পয়সা ছড়ানো। অনেকেই আবার মা কালী বা শিবের ফটো নিয়ে বসেছে। যতভাবে মানুষের চোখ আর মন টানা যায়।

এসব দেখতে দেখতে কখন যে নদী পেরিয়ে এসেছে, খেয়াল-ই করেনি। এপারে আসা মানে বীরভূম জেলায় এসে ওঠা। উঠতেই, ডানদিকে একটা বড় দোতলা বাড়ি। এটা একটা গেস্ট হাউস। বাঁ দিকে একটা বাজার মতো জায়গা। সামনে একটা বড় প্যান্ডেল। তাতে রাতে বাউল গান হবে। এ সব ছাড়া চারদিকে শুধু দোকান আর দোকান। নানান জিনিসের। খেলনা পুতুল থেকে শুরু করে দা-বঁটি-ঝুড়ি-কলসি-হাতা-বেড়ি-জামাকাপড়। তেলেভাজা থেকে চপ-কাটলেট-ভাতের হোটেল। বাদামভাজা থেকে পাঁপড়ভাজা। চরকি থেকে নানান রঙের বেলুন। সব হাজির। দেবতা নিজের হাতে ভক্ত জয়দেবের অসম্পূর্ণ শ্লোক পূর্ণ করে দিয়েছিলেন **দেহি পদপল্লবমুদারম্**।

রাধামাধব মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়। ভক্তদের বিশাল লাইন। কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে পুজো দিতে। দেবজিৎ তো পুজো দিতে আসেনি। আসল উদ্দেশ্য মানুষ দেখা। মানুষকে চেনা। মানুষকে কাছ থেকে পাওয়া।

মন্দির সামনে রেখে বাঁ দিকে ঘুরে গেল। সরু রাস্তা। অজস্র মানুষের ঠেলাঠেলি। কিছুদূর অবধি দুপাশে নানা ধরনের দোকান। তারপর শুরু নানা মাপের প্যান্ডেল করে নানা ধরনের আখড়া। কোনওটাতে কীর্তনীয়াদের কীর্তন, কোনওটাতে কোনও বাবা বা মা ধর্মকথা শোনাচ্ছেন, কোনওটাতে কৃষ্ণপালা হচ্ছে। কিন্তু বাউলদের মেলায় বাউল কোথায়? আশ্চর্য লাগল।

পরে অবশ্য শুনেছিল, আজকাল পালাকীর্তনের ঠেলায় বাউলরা কোণঠাসা। সাধারণ লোকে বাউলদের সহজিয়া তত্ত্বের কচকচির চেয়ে, কমবয়সি মেয়ে কীর্তনিয়াদের ছলাকলা দেখতেই বেশি পছন্দ করছে। বাউলরা তাই কিছুটা অভিমানে দূরে থাকছে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেল শেষ অবধি। মেলার এক প্রান্তে বিশাল বটগাছ। তাকে চারপাশে অনেকটা জায়গা চট দিয়ে ঘিরে একটা আশ্রম বা আখড়া মতো করা হয়েছে। সেখানেই বাউলদের মিলন মেলা।

ঢুকতেই বিশাল ধাক্কা।

'জয় গুরু' বলে একদম বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এক বৃদ্ধ বাউল। ধুলোভরা আলখাল্লায় বোঁটকা গন্ধ। মুখে দাড়ির সুড়সুড়ি লাগছে। তবুও এক অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে গেল মন। এই কী সেই অজানা টানের উৎস, যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে? কত সীমাবদ্ধ এ মানবজীবন। শুধু দুনিয়াদারির হিসেবে-নিকেশের মধ্যেই জীবন বন্দি হয়ে গেছে। কাউকে লেঙ্গি মেরে সার্থক হওয়াটাই মূলমন্ত্র। এর বাইরে কোনও দুনিয়া নেই। জিতেই বা কী হবে? যতদিন আছ, লোকে সেলাম করবে, পুজো করবে। যেদিন থাকবে না, কেউ পিছন ফিরে তাকাবেও না। তবে কেন, এই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর প্রতি এত মোহ?

দেবজিতের মনে হয়, এরা অস্তিত্ব সঙ্কটের শঙ্কায় ভুগছে। জানে না কোথায় দাঁড়িয়ে। অস্তিত্বটা অন্যের মধ্যে নয়। উপলব্ধির মধ্যে।

"জয় গুরু, এস এস বাবা। বসো"

দেবজিৎ অবাক চোখে তাকিয়ে "আপনি আমায় চেনেন?"

"চেনাচিনির কী আছে বাবা? আমরা কী সত্যি সত্যিই কেউ কাউকে চিনি? না কী নিজেকেই? চেনার কাজটাই যে সবচেয়ে কঠিন। ওসব কথা ছাড়। তার চেয়ে বসে গান শোনো"

দেবজিৎ আরো অবাক!

সে শুনেছিল, বটে বাউলরা উঁচুদরের তত্ত্ব কথা বলে। কিন্তু বুড়ো বাউলের এই সামান্য কথাটাই কী গভীর তাৎপর্যপুর্ণ।

এক জায়গায় বসে পড়ল। মাটির ওপর খড়ের আঁটি ফেলে উঁচু করে বড় একটা চাদর বিছনো। অনেকটা তাকিয়ার মতো। সবাই তার উপরেই বসছে। এখানে সবাই সমান।

বসে, দেবজিৎ চারদিকে ঘুরে দেখল। নানা ধরনের লোকজন। চেহারা এবং পোশাক দেখলেই বোঝা যায় বেশিরভাগই গাঁয়ের লোক। কিন্তু বেশ কিছু শহুরে চেহারাও আছে। কয়েকজন সাদা চামড়ার সাহেব-মেমসাহেবকেও দেখা গেল। অনবরত ফটো তুলছে। তবে অস্বস্তিকর, বেশ কয়েকজন ভদ্র চেহারার ছেলে অনবরত গাঁজা টানছে। শহুরে পাবলিক।

লোকে ভাবে কী? ভড়ং করে, ইন্টেলেকচুয়াল সেজে, ড্রামা করলেই ঈশ্বর পাওয়া যায়? ঈশ্বর একটা চেতনা, একান্ত অনুভূতি। সামাজিক রীতিনীতির বাইরে। দেবজিৎ সারাজীবন অর্থহীন বাউন্ডুলে হয়েও ঈশ্বরের কর-কমলের স্পর্শ পেল না। আর এই সংগুলো, ভড়ং করে কী প্রমাণ করতে চাইছে কে জানে?

ওদিকে তখন উদাত্ত স্বরে গান শুরু হয়ে গেছে। মন ছুঁয়ে গেল। কয়েকটা চেনা গান, কয়েকটা অচেনাও বটে। একটা গানের রেশ বারবার ঝংকার তুলছেঃ

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।

ক্ষ্যপা ভাঙ্গলো নাকো ঘুমের ঘোর।

মিছে দেহের গুমোর করোনা,

কোনদিন পাখি পালিয়ে যাবে

তাওতো জানো না, (রে ক্ষ্যাপা)

ওরে খাঁচা তখন রবে পড়ে,

থাকবে না তার ঠিকানা তোর।

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছে। ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে আসছে। আসর ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘোর লাগা অন্যমনস্ক ভাবে মূল মেলার মধ্যে চলে এল। মেলায় ভিড় ধাক্কাধাক্কি আরও বেড়েছে। রোদ পড়তেই মেলায় শতশত আলো জ্বলে উঠছে। ভিড় ঠেলে, দেবজিৎ ঘোরের মধ্যে হাঁটছে। হাজার লোকের মধ্যেও সে একেবারে একা। সম্পূর্ণভাবে একা। এই একাকিত্ব অন্যদের থেকে আলাদা। এর মধ্যে কোথায় যেন মায়াজাল। তার মধ্যেই, নিজেকে খুঁজে পাওয়া।

পাঁচ

বার্ন পেশেন্টগুলো প্রথম ধাক্কা সামলে নিলেও বোধহয় শেষ পর্যন্ত টিকবে না। নিউরোজেনিক ও হাইপোভলেমিক শক্। দিনান্ত পরিশ্রম আর অত্যাধুনিক আইটিইউ ম্যানেজমেন্ট সত্ত্বেও বিদিশা জানে, তিন সপ্তাহর পর থেকে আরেক খেলা শুরু। এন্ডোটক্সিক শক ও মাল্টি অর্গান ফেলিওরে শেষ পর্যন্ত টেকে না।

অন্তত তিন সপ্তাহ আগরওয়ালের কাছ থেকে রেহাই। তবে সামস্যাটা যে আরও গভীরে যাবে, বিদিশা বুঝতে পারে। তিন সপ্তাহ মানে পুলিস স্টেটমেন্ট। ডাইং ডিক্লারেশন রেকর্ড হয়ে গেলে কাল। বুঝুক গে। আগরওয়ালের ব্যাপার। অনুমান করতে পারে 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' র অর্থ। আগরওয়াল, পেশেন্ট আর পুলিসের ব্যপার। ওর ঝামেলা, পেশেন্টগুলোর মধ্যে যদি একটাও মরে যায়, অযথা পুলিসি হয়রানি, কোর্টে সাক্ষী দেওয়া। এসব বেগার ঝামেলাগুলো।

আইটিইউ থেকে বেরোতে চোখ পড়ল ওয়েটিং এরিয়ায় আগরওয়াল বসে। এত জন-দরদি মালিক আগে দেখেনি। মুখ কাঁচু-মাচু। এই অত্যধিক শ্রমিক দরদটাই চোখে লাগে।

বিদিশাকে দেখে আগরওয়াল এগিয়ে এল "অব কয়েসা হ্যায়?"

"পহেলা তকলিফ পার হো গয়া। দুসরা শুরু তিন হপ্তে সে। অপারেশন কে লিয়ে ব্লাড জরুরত। বন্দোবস্ত কর সকেগা?"

"জরুর। কিতনা বোতল?"

"অভি ছে"

"অপারেশন কভ?"

"কাল করনে কা ইরাদা হ্যায়"

বিদিশা নিজের হিন্দি শুনে ঘাবড়ে যাচ্ছে। ছোটবেলার বিলাসপুরের স্মৃতি কী মজ্জায়? নইলে এত অবলীলায় বলছে কী করে? আসলে ছোটবেলার শিক্ষাটা মজ্জায় ঢুকে যায়। কলকাতায় বেশিরভাগ মাড়োয়ারি সম্প্রদায় কেমন অবলীলায় বাংলা বলতে পারে। অথচ বাঙালিরা যে হিন্দি বলে, কহতব্য নয়। লিঙ্গই ঠিক করতে পারে না।

"কালকে অন্দর বন্দোবস্ত কিজিয়ে"

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বেশিক্ষণ দাঁড়ালে নানান আবদার শুরু হয়ে যাবে। আবদার যার করার ছিল, সে কোনদিনই করল না। প্রথম দিকে সুবিমল করলে ও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করত। কখনও কিছু চায়নি। প্রয়োজন

যে হয়নি, তা নয়। ওর চাওয়াটা বিদিশার ওপর দাবি। ওর অহং। উদগ্রীব চোখে মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র সুবিমলের দিকে চেয়ে থাকত। যদি কিছু আদেশ করে। কিন্তু একদিনও মুহূর্তের জন্যও আবদার করেনি। খালি মাঝে-মধ্যে হুকুম ছাড়া। এটা নিয়ে এস, ওটা করে দাও। বোনের বন্ধুর ওপর তার সব অধিকার। আদেশের মধ্যে অধিকার স্পষ্ট। জানত, বিদিশা করবে।

আবদারটা আদেশ হলেও, কোথাও কী একটু উষ্ণতা ছিল? একটু আবেগ? চাওয়া? নইলে কেনই বা সে বেদবাক্য বলে পালন করবে? সে তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু নয়। স্কুলের কৃতী ছাত্রী। বুদ্ধির দিক দিয়ে কোনও অংশে কম নয়। সেই আদেশ-ভালোলাগা-ভালোবাসার উষ্ণতা, আজ বিদিশাকে কোথায় দাঁড় করিয়েছে। কে দোষী, কে নয়, সে অন্য প্রশ্ন। সুবিমল আজ তার জীবনে নেই। এতবছর পরেও কেন বারবার ঘুরে-ফিরে আসে তার জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিকে?

ত্রিদিব নন্দীর ঘরে ঢুকল। মধ্যবয়স্ক, গোলগাল মুখ। বিলেতে বেশ কিছুদিন কনসালট্যাণ্ট ছিলেন। লক্ষণীয় ইদানীং ভুড়িটা বেড়েছে। কাঁচা-পাকা চুল, সামনের অংশে টাক। যদ্দুর মনে পড়ে, স্যারকে কখনও টাই ছাড়া অবস্থায় দেখেনি। টাই-এর কনসেপ্টটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে আহরণ করা। এখানে গরমের জন্য স্যুট পর্যন্ত পরা যায় না। পুরো সাহেব না হলেও, আধা সাহেব হতে বাধা কোথায়? টাই পড়লে, সাহেব হওয়া যায় কি না বা রুগির সংখ্যা বাড়ে কি না, জানা নেই। অনেক বিলেত ফেরত ডাক্তারকে টাই পড়তে দেখেছে।

ত্রিদিব নন্দী কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। বিদিশা উলটোদিকের চেয়ারে বসল, ফোন শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল।

"এক্ষুনি নীচে আসতে পারবে?"

আবার কী হল? অরণিই বা এখন হাসপাতালে কেন? এখন তো ওর আসার সময় নয়।

"কেন? কী হয়েছে?"

"একটু নীচে এস না"

"দাঁড়াও। আসছি। স্যারের ঘরে আছি"

ত্রিদিব নন্দী ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে। চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকাল।

"ওই চারটে বার্ন কেস। ব্যাপারটা ফিসি"

"কেন?"

"ওই ফ্যাক্টরিতে এমন কিছু হয়ছে যার জন্য ওদের মালিক আগরওয়াল ওয়ারিড"

“দুটো জিনিস হতে পারে। আইদার লেবার ওর ইনসিওরেন্স ইস্যু। আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। তোমায় কিছু বলেছে?”

“কিছু বলেনি। হি সিমস্ আনিউশ্যালি কনসার্নড্। মারা গেলে পুলিস কেস হবে। তাই ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে রাখি”

বিদিশা উঠে পড়ল। অরণি নীচে কেন ডাকছে, একবার শুনতে হয়।

অরণি লাউঞ্জে না বসে, এপাশ ওপাশ পায়চারি করছে। বারবার কাচের গেটের দিকে তাকাচ্ছে। কখন বিদিশা আসবে? বিদিশা ভাবছিল, আবার কী হল? এত সকালে তো ও আসে না। ওর তো এখন সেক্টর ফাইভে থাকার কথা। ওর কী কাজ নেই? সেক্টর ফাইভের ডিসপ্রোটেক ছেড়ে লেডি ফ্লোরেন্সের লাউঞ্জে কেন?

বিদিশাকে দেখে হন্তদন্ত “সায়ন্তনি বাড়ি ফেরেনি”

অরণির পারিবারিক সমস্যাও ওকে জানাতে হবে। ও কে? কীই বা সম্পর্ক? অরণির মনে হয়, তার ভাষা একমাত্র বিদিশাই বুঝবে। অরণির আর কেই বা আছে? এটাই বিদিশার সব থেকে বড় চিন্তা। কিছুক্ষণ সময় কাটানো ভালো। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিগত ব্যাপারে অবসেশন ভালো নয়।

“সে তো অনেক রাতেই ফেরে না। এ আর নতুন কী?” ওর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল “এত উদগ্রীব হওয়ার কী আছে? মোবাইলে চেষ্টা করেছিলে?”

“হ্যা। মোবাইল সুইচড্ অফ। রাতে বাড়ি না ফিরলেও, সকালে ইউসুয়ালি ফিরে আসে। কী করব, বুঝতে পারছি না। পুলিসে খবর দেব? না কি...?”

“অভভিয়াসলি” বিদিশা দৃঢ়।

“তাই করব ভেবেছিলাম। দেখলাম এই মাত্র ট্যানিয়াকে ট্রলিতে নিয়ে গেল”

“ট্যানিয়া কে?”

“ট্যানিয়া মালিয়া। নাম শোনোনি। মডেলিং করে। সায়ন্তনির বন্ধু”

“ট্রলিতে?”

“হ্যা, ট্রলিতে। বোধহয় ভর্তি করেছে এই হাসপাতালে। মনে হল জ্ঞান নেই”

“তুমি সিওর সায়ন্তনির বন্ধু?”

“সিওর না হওয়ার কারণ আছে? আমাদের বাড়িতে কত এসেছে। আমাকেও একবার ওর জন্মদিনে ডেকেছিল”

বিদিশা থমকে গেল। ট্যানিয়া যদি হাসপাতালে অচৈতন্য হয়ে ভর্তি তাহলে সায়ন্তনি কোথায়? চিন্তার কারণ আছে বৈকি।

কথার জের টেনে বলল "তুমি সিওর ট্রলিতে যাকে দেখেছ সে ট্যানিয়া?"

"ভূল করার কোনও কারণ নেই"

বিদিশা ফ্যাসাদে। কী উত্তর দেবে? সায়ন্তনির মোবাইল সুইচড্ অফ। সায়ন্তনির বন্ধু ট্যানিয়া অচৈতন্য, হাসপাতালে ভর্তি। ব্যাপারটা গোলমেলে।

"লাউঞ্জে বসো। খোঁজ নিয়ে আসছি" হনহন করে বেরিয়ে গেল।

আবার প্রতীক্ষা। প্রত্যেকটা কাজ করতে প্রতীক্ষা। অরণি আর পেরে উঠছে না। সারাজীবন শুধু প্রতীক্ষাই করে গেল। কেন করল, কীসের জন্য, জানে না। তবু লক্ষ করেছে, প্রতিটা কাজেই তাকে প্রতীক্ষা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত, কোনোটাই ফলপ্রসু হয় না। হলে কী আর, সায়ন্তনিকে বিয়ে করত? রুচিরার সঙ্গে মধ্যবিত্ত সংসারে জড়িয়ে, জীবনের খোরাক পেয়ে যেত। এত প্রাচুর্য থাকত না। তবুও বাঁচার একটা রসদ থাকত। রুচিরা ভালোবাসত কবিতা, সাহিত্য, গান। অরণি বই পড়তে। ব্যবহারিক জীবনে কোথাও একটা ছন্দ।

এই ছন্দের কম্পনাটাই তো বাঁচার মূলমন্ত্র। টাকা, বাড়ি, গাড়ি - সবের মধ্যেই পাওয়া। সব পাওয়ার পরেও কোথায় একটা অপূর্ণতা। পাওয়াটা কী হল? পেলে অপূর্ণতা কেন? অরণি লক্ষ করেছে, জীবনের যা কিছু পাওয়া, হারানো সব-ই ক্ষণস্থায়ী। কোনোদিন উত্থান, কোনোদিন পতন। যে পাওয়া ক্ষণস্থায়ী, তার মাহাত্ম্য অরণি জানে না।

রুচিরা বলত "টলস্টয়ের রেসারেকশনে জীবনবোধ পাওয়া যায়। কোনটা সুস্থ স্বাভাবিক, কোনটা অসুস্থ অস্বাভাবিক সেটা বিচারের"

"টলস্টয় ভালো লাগে?" অরণি রুচিরা দিকে তাকাল।

"এক সময় পড়েছি। ভালো অনেক কিছুই লাগে। সবের মধ্যেই জীবন-দর্শন খোঁজার চেষ্টা করি"

"বেশি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ না?"

"আমাদের মধ্যবিত্তদের দর্শন ছাড়া আর কী আছে? স্বপ্নের গণ্ডিটাও লক্ষ্মণরেখায় বাঁধা। বাঁচতে হলে, স্বামী-পুত্র-সংসার ছাড়াও আরও কিছু চাই"

দার্শনিক রুচিরা বোধহয় এখন মার্কিন মুলুকে জীবনের দর্শন শিখে গেছে। অরণি আজ অতীত। কলকাতা আজ ন্যস্টি পোলিউটেড। মধ্যবিত্ত বাঙালি কালচার প্রগতিশীল পাশ্চাত্যের কাছে অর্থহীন-সেকেলে।

প্রিন্সেপ ঘাটের আলো-আঁধারিতে অরণির নরম হাতের স্পর্শে, শুক্লপক্ষের একফালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে, দূরে লঞ্চের বাঁশির সাইরেনের শব্দে মনে অনেক দার্শনিকতা জাগে। দিনের রূঢ় আলোয়, বাস্তবের

পঙ্কিলতায় অজান্তেই সে দর্শন ধুয়ে-মুছে একাকার। মুহূর্তের দার্শনিকতা অলীক কল্পনা। জীবনের জঞ্জালে মিলিয়ে যায়। পড়ে থাকে অর্থহীন বাস্তব। বুঝতেও পারি না, সেই বাস্তবে আমরা নেই। মানুষটা নেই। সাজ-পোশাকের আড়ালে প্রাণটাও হারিয়ে গেছে।

রুচিরার পাট করা টাঙ্গাইল শাড়ির অন্তরালে সামাজিক অবয়ব। কোনও দেশের, এক কুমোরের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়, খড় আর মাটির টুকরোর মতো থিম পুজোর আড়ম্বরে। সেখানে মা নেই, প্রাণ নেই, রুচিরাও নেই। শুধু একরাশ আকাঙ্ক্ষা। গতি-প্রগতির বেগে আছড়ে পড়ছে ঠাট্টার মায়াজালে। পালাবার পথ নেই। শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে পরিত্রাণ খুঁজছে। নিঃশব্দে একা একা, চাওয়াটুকু খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা।

জীবন আছে, গতি নেই।

ছন্দ আছে, প্রাণ নেই।

মানুষ আছে, মন নেই।

রুচিরা কী স্বপ্নের লক্ষ্মণরেখা লঙ্ঘন করেছে? প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। জানা নেই। যদি কোনদিন কোথাও দেখা হয়, অরণির ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করতে, রুচিরা কী আজও টলস্টয়, ম্যম, বা বোরিস পাস্তারনাক পড়ে? নিদেন পক্ষে মিলিন কুন্দেরা। ভাবতে পারে না, রুচিরা বস্টনে সাহিত্য পড়ছে।

"তুমি শিওর ওই মহিলার নাম ট্যানিয়া মালিয়া?"

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। সম্বিৎ ফিরল বিদিশার আওয়াজে। ওর পাশে একজন মধ্যবয়সি। সাড়ে পাঁচ ফিট। চেহারাটা ভারীর দিকে। সামনের চুলের দু-দিকে টাকের রেখা স্পষ্ট। পাতলা হওয়া কাঁচা-পাকা চুল। গোলগাল মুখের কোণে একটুকরো হাসি। বড়বড় চোখে, অরণিকে বলল "আপনি ওকে চেনেন?"

বিদিশা পরিচয় করিয়ে দিল "উনি এই হাসপাতালের ইমার্জেন্সি কন্সালট্যান্ট শ্রীজিৎ বসু"

অরণি হাত তুলে নমস্কার জানাল "চিনি মানে, স্ত্রীর বন্ধু। ওনার বাড়িতেও গেছি। উনিও আমাদের বাড়ি কয়েকবার এসেছেন। উনি মডেলিং করেন। নাম ট্যানিয়া মালিয়া"

কথাটা শেষ না হতেই স্বস্তিতে শ্রীজিৎ। হিম হওয়া বুকে। হঠাৎ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

"ওনার ঠিকানা জানেন?"

"ঠিকানা জানি না। বাড়িটা চিনি। দু-একবার গেছি"

শ্রীজিৎ আশ্বস্ত। মডেল মানে ছোটখাটো সেলিব্রিটি। সেরকম কিছু আন্দাজ করেছিল সকালে দেখে। শুধু হদিসের সূত্র খুঁজছিল। কাল রাতে, ঝামেলা এড়াতে, এই অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাকে ক্যাসুয়ালটিতে রেখে দিয়েছিল। সকালে কারোকে না পেয়ে দুরুদুরু বুকে বাধ্য হয়ছিল ভর্তি করতে। শেষ পর্যন্ত যদি হদিস না মেলে? হসপিট্যাল অথরিটির কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এর নাম চাকরি। ভর্তি না করলে জনগণের

ঠ্যাঙানি। ভর্তি করে, পয়সা উসুল করতে না পারলে কর্তৃপক্ষের গঞ্জনা। শাঁখের করাত। কর্পোরেট হাসপাতালে কাজ করা মানে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া। চিকিৎসা করছ তুমি, সব ঝক্কি-ঝামেলা সামলাচ্ছ আর ভিক্ষের পয়সা ছুঁড়ে কর্তৃপক্ষ যেন কৃতার্থ করছে। তাও যদি, লাভের গুড়ে আঁচ না পড়ে। শ্রীজিৎ বসুর মনে হয় স্বাস্থ্যের প্রগতির নামে বড়বাজারটা উঠে এসেছে ইস্টার্ন বাইপাসের দোরগোড়ায়। স্বপ্ন বিকোচ্ছে। গ্ল্যামারের ঢাক পিটিয়ে খদ্দের জোটাচ্ছে। কিনছে জনতা।

দেশে স্বপ্ন কী কেনার লোকের অভাব?

"নাম যদি জানেন, ঠিকানাটা খোঁজা সমস্যা হবে না। ওর আর কে কে আছে জানেন?"

"হাইল্যান্ড পার্কে উনি একাই থাকেন। কে আছে বলতে পারব না। যে কবার গেছি, কাউকে দেখিনি"

"আপনি বললেন, আপনার স্ত্রীর বন্ধু। ওনার সঙ্গে কথা বলা যাবে?"

এ যেন পুলিসি জেরা। ডাক্তার না পুলিস? পেটের দায় পড়লে, ডাক্তার পুলিস হতে কতক্ষণ?

অরণির মুখ দেখে বিদিশা বুঝতে পেরেছে, ও অপ্রস্তুত। ও তো জানে সায়ন্তনি বেপাত্তা। সেটা ওর ঘরেলু মামলা। ডাক্তারের সামনে ঘরেলু কাহিনি আনতে চায় না।

বিদিশাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল "উনি কলকাতার বাইরে। ফিরলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব"

"কোনও ভাবে যদি ওর চেনাজানা কারও হদিস দিতে পারেন"

"চেষ্টা করব"

অরণি কথা বাড়াল না। বেশিক্ষণ ঢপ চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। পালাবার জন্যই বলল "বিদিশা চলি। পরে কথা হবে"

হনহন করে বেরিয়ে গেল। একদিকে বউ বেপাত্তা। অন্যদিকে ট্যানিয়া। উটকো ঝামেলা। বিদিশার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিল। তাও হল না। আবার প্রতীক্ষা সায়ন্তনির জন্য।

অরণির দিকে চেয়ে বিদিশা বলল "স্যার, পারলে সন্ধের মধ্যে খবর আনার চেষ্টা করব"

"দেখো যদি কিছু করতে পার। নইলে ফ্যাসাদে পড়ব। এই মহিলা ট্যানিয়া মালিয়ার বিল মেটাবার বন্দোবস্ত না করলে সমুদ্র গুপ্তর কাছে গালাগালি"

লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের সিইও সমুদ্র গুপ্ত এমনিতে খুব ভালো। কিন্তু জাত ব্যবসাদার। শ্রীজিৎ বসুর মনে হয়, হসপিট্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে না থেকে, হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে থাকলে, আও উন্নতি করত। শুনেছে, এক সময় হিল্টন গ্রুপে কাজ করত। হঠাৎ হোটেল ছেড়ে হঠাৎ হাসপাতালে আসা, কেন, কে জানে? এখন লেডি ফ্লোরেন্স হসপিট্যালকে হোটেল বানিয়ে ছাড়বে। ফাইভ স্টার হোটেল, থুড়ি হসপিট্যাল। এখানে

বিলাসের কোনও কমতি নেই। অথচ একটা নতুন কার্ডিয়াক মনিটার কিংবা ভেন্টিলেটার কিনতে বল, নৈব নৈব চ। বার্ন ইউনিট করতে বল, কী হবে ওসব করে? মানুষকে সুখ দাও, ভোগ দাও। ম্যাসেজিং ইলেকট্রিক চেয়ার দাও। তার বিনিময়ে রুম রেট রোজ বাড়িয়ে যাও। কার্ডিয়াক মনিটারের জন্য তো লোকে এক্সট্রা পয়সা দেবে না। দেবে এসব ফেসিলিটির জন্য। এর নাম কনসিউমারিজম্। ব্যবসা। গিভ হোয়াট দ্য পিপল ওয়ান্টস্। নট হোয়াট দ্য পিপল নিড।

এটা ধ্রুব সত্য। জন্মালে গোলামি করতে হবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজনের গোলামি। শ্রীজিৎ দেখছে ডাক্তারি মানে সবের গোলামি। মাঝেমধ্যে মেনে নেওয়া কঠিন। তখনই মনে হয়, কেন যে ডাক্তারি পড়তে এসেছিল। অন্য কিছু করলে বোধহয় ভালো ছিল। এখন সেকথায় লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। যা আছে তাই ধরে বাঁচা।

বিদিশাকে বলল "থ্যাঙ্কস। তুমি বাঁচালে। দেখি ট্যানিয়া মালিয়ার কোনও হদিস বার করতে পারি কি না"

বিদিশা ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোতে এগোতে ভাবছিল, সম্পর্কটা কোথায় এগোচ্ছে বুঝতেও পারছে না। কেনই বা এতে ফেঁসে তাও জানে না। নিজের বউ পালালে কী করবে, সে ডিসিশন নেওয়ার যার ক্ষমতা নেই, তার সঙ্গে বিদিশা কী-ই বা করছে? কেন একে আঁকড়ে জানে না।

ঘর থাকলেও অরণির জীবনে যে কিছুই নেই, তা ভালো করেই জানে। এই কয়েকটা মুহূর্ত ওর সঙ্গে যে কাটায়, এটাই ওর বাঁচার উপাদান। সায়ন্তনির মোবাইল সুইচড্ অফ হয়ে গেলে বিদিশাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কী করবে, এটাই ওর পাওয়া। ওর এই ছোট্ট পাওয়াটুকুকে বঞ্চিত করতে চায় না। ওর তো বড় কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই ছোট ছোট পাওয়াগুলো কেড়ে নিয়ে জীবন আরও অর্থহীন করতে চায় না। ওর এই সুখটুকু কেড়ে নেওয়ার অধিকার নেই।

কত মানুষই কত কিছু হারায়, কিংবা পায় না। কে তার খোঁজ রাখে? কারও সময় নেই, কে কী পেল, হারাল, তার হিসেব-নিকেশ করার। এখানে আমি একা অন্য। এখানে 'আমি'টাই প্রধান। বাকি সবাই, আমার স্বার্থে হাত মেলাবার জন্য বসে। এই আমির স্বার্থের পাওয়াটার নামই সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা। অনেক কিছু চেয়েছিল। পায়নি। বিদিশার মনে হয়, তার পাওয়াটাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার মানেই হয় না। কারও একটুকরো হাসি, কারও মুহূর্তের আনন্দ যদি উজাড় করে ভরিয়ে দিতে পারে, অন্যের সেই পাওয়া, নিজগুণে পেয়ে যাবে। তার বৈচিত্রহীন জীবনে এই মুহূর্তটাকে বরণ করা ছাড়া, আর কী-ই বা আছে?

সম্পর্কের মায়াজাল টেনে মুহূর্তটাকে নষ্টই বা কেন? কোনও অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তটাকে, বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্মতায়, যদি উপভোগ করতে পারে, পাওয়াটা মুহূর্তের হাত ধরে পূর্ণ হয়ে যাবে। অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

মা বলত "বিদিশার মতো মেয়ে হয় না"

দাদা বলত "আমার আদরের বোন"

দাদা এখন, মিডিলসেক্স-এর অস্টারলিতে বউ-বাচ্চা নিয়ে দিব্যি সংসার করছে। বাড়ি কিনেছে। শুনেছে, কিছুদিন আগে একটা বিএমডবলিউ গাড়িও। মেমসাহেব বউ। বাচ্চাদের পদবিটা যদিও মুখোপাধ্যায়, একমাত্র রঙের একটু দিশি টান থাকলেও পুরো দস্তুর নারকেল। বাইরেটা পর্যন্ত। ভেতারটা মনে-প্রাণে-চলনে-বলনে সম্পূর্ণ সাদা শাঁস। নামগুলোও দো-আঁশলা। নিকোলাস মুখুজ্জে। অলিভিয়া মুখুজ্জে। কথায়-বার্তায় হ্যারোর ইটোনিয়ান অ্যাকসেন্ট।

দাদু যতই বাংলায় বলার চেষ্টা করে, কিছুক্ষণেই হতাশ "কিছুই তো বোঝে না। খালি হাসে"

সেই বংরেজ দাদার পৃথিবীতে বিদিশা আদরের হলেও বহুদূর।

যেদিন প্রথম লিপিকার বাড়িতে গেছিল, ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় লিপিকার দাদাকে দেখেছিল। সুবিমল তখন মাধ্যমিক দিচ্ছে। বিদিশা কিশোরী থেকে যুবতীতে। স্বরে বাচ্চামি নেই। স্তন বাড়তে শুরু করেছে। মাসিক শুরু হয়ে গেছে। যৌবন গোলাপের পাপড়ির মতো বিকশিত হচ্ছে নারীত্বে।

মায়ের মুখের আদল পায়নি। মা সেই সাবেকি কলকাতার গোলগাল সাদাসিধে বউ। যদিও হাসিটা মায়ের মতো, গালে টোল পড়ত। মুখের গড়ন কিছুটা বাবা কিছুটা দাদুর। আকর্ষণ মুখে নয়, যৌবনে নয়, টোল পড়া হাসিতে নয় - চোখে। লেসার রশ্মির মতো, বিদ্ধ করতে পারত পুরুষের হৃদয়। তাই কী ফিজিক্সে এত ভালো? ডেনিস গেবরের লেসার আবিষ্কারের ইতিহাস গুলে ফেলেছিল।

মা চোখের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছিল বাড়ন্ত যৌবনে "বড় হচ্ছিস। সাবধানে চলাফেরা করিস"

মা কী বলতে চেয়েছিল? ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না? না কি, সদ্য যৌবনকে সামলে চলতে? স্তন বাড়লে বহিঃপ্রকাশ তো হবেই। রুখবে কী করে? চাইলেই বা কী সম্ভব? হরমোনের খেলা। মা অন্যভাবে বলতে চেয়েছিল চলনে-বলনে, বেশ-ভুষায় যাতে সেই যৌবন প্রকট না হয়।

পড়াশোনায় ব্যস্ততা শেষে লিপিকার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে আড় চোখে দেখেছিল সুপুরুষ সুবিমলকে। প্রথম পুরুষ। খেলার সাথী নয়।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এদিকে আয়। আলাপ করিয়ে দিই" ঘরে ঢুকে লিপিকার মায়ের ইশারা।

আজও মনে আছে, সেদিন বিদিশা কচি কলাপাতা শেডের সালোয়ার পরেছিল। চুলগুলো পনিটেল। ফর্সা লম্বাটে মুখে আবাক বিস্ময়ে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে চেয়েছিল সুবিমলের দিকে।

লিপিকা আলাপ করাল "পল্টু, আমার বন্ধু বিদিশা"

নামটা শুনে ভীষণ হাসি পেয়েছিল। এমন সুপুরুষের নাম পল্টু।

সুবিমল অবাক "হাসছ যে?"

লজ্জা পেয়ে হাসি গিলে বলেছিল "না এমনি। হঠাৎ লরেল-হার্ডির সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল। মর্নিং শোয় আলেয়াতে দেখেছিলাম"

"আমি কার মতো। লরেল, না হার্ডি?"

"কোনওটাই নয়" একগাল হেসে।

বিদিশার দিকে ফিরে ওর টোল পড়া হাসিটা কী দেখেছিল সুবিমল? নিশ্চয়ই চোখ এড়ায়নি।

মায়ের কথা শুনতে পায়নি। তাই বিদিশাকে প্রশ্ন "বসো। নাম কী?"

"বিদিশা মুখোপাধ্যায়" খাটে বসল।

"কোন ক্লাসে পড়?" চশমার ফাঁক দিয়ে দেখল।

"ক্লাস এইট"

"তুমি লিপিকার বন্ধু, তাই না? তবে তো সেভেনে পড়া উচিত ছিল?"

"জানি না। এইটেই পড়ি। বোধহয় আমার বয়েস বেশি। জন্মাবার সময় তো জ্ঞান ছিল না। মা-ই বলতে পারবেন"

অতটুকু মেয়ে কথাবার্তায় রীতিমতো পটু। দিব্যি গুছিয়ে বলছে।

"কোন স্কুল?"

"সাউথ পয়েন্ট। এফ সেকশন"

"শিবুবাবুকে চেন?"

"কেন চিনব না? কেমেস্ট্রির টিচার। ওনার কাছে পড়িনি"

ছিপছিপে, চশমা চোখে সুবিমলের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়েছিল জানে না। মেধার তারিফে, না দৃষ্টির একাগ্রতায়? হয়ত দুটোই। ওর চোখের চাহনিতে এমন মাদকতা ছিল, যা যে কোনও মেয়েকে বশ করতে পারে। চোখ এড়ায়নি বিদিশার। ছেলেরা মনে করে, তাদের রূপ আর পোশাকে মেয়েরা মজে। হায় রে। লেটেস্ট ফ্যাশন, চোস্ত ইংরেজি শেখা বাঙালি মনে করে, আদব কায়দা দিয়ে মেয়েদের মন জয় করবে।

স্কুলে শিবুবাবুর কেমেস্ট্রি নয়। এই রসায়নের নামই অনন্ত প্রেম। প্রথম দেখাতে সুবিমলের প্রতি প্রেম জন্মেছিল কি না জানে না। বুকটা কেঁপে উঠেছিল। মনের কোণে ফাগুনের রং। ভালো লেগেছিল ওর উল্টোদিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকাতে। পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই সদ্য জাগ্রত নব-বসন্ত।

এতদিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

বড় কাছ থেকে স্বপ্নের মানুষটাকে দেখছে। দেখার মধ্যেই তৃপ্তি। নিঃশব্দ পাওয়া।

সুবিমল যেন সাক্ষ্যাৎ দেবদূত। তাকে বড় কাছ থেকে দেখেছিল। খয়েরি প্যান্ট, সাদা-খয়েরি চেক সার্ট। চুলটা পাট করে পেছনে ঠেলা। রিমলেস চশমায় কালো মণি চকচক করছে। তার লেসার দৃষ্টিতে হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারেনি, কোথায় একটা আলোড়ন। কিছুই বলতে পারেনি। শুধু "আপানার মতো ভালো ছাত্রর সংস্পর্শে আসাও ভাগ্যের কথা"

বিনয়ে লাজুক হতে দেখেনি সুবিমলকে। যেন এটাই প্রাপ্য। তখন এর গুরুত্ব না বুঝলেও, এখন বুঝতে পারে। প্রচ্ছন্ন অহংয়ে মজলেও, তাকে পাল্লা দিতে গিয়েই বিদিশাঢ় আজ অসহায়তা। অনির্দিষ্টের মধ্যে ভাসছে।

সুবিমলের তুখোড় চাহনি ওর ওপর। অস্বস্তি, ভালোলাগায় শিউরে উঠেছিল।

"বসো। তোমার জন্য চা আনছি" লিপিকার মা বেরিয়ে গেল।

ত্রিদিব নন্দী বলল "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? খুঁজে পাচ্ছিলাম না"

"নীচে আটকে পড়েছিলাম"

"ওই বার্ণ কেসগুলোর নোটস সব ঠিকঠাক লিখে রেখ। পুলিস কেস হলে যাতে বিপাকে না পড়ি"

"নিশ্চয়ই স্যার"

"কালকের অপারেশন লিস্ট তৈরি?"

"মোটামুটি। ওই ৪২০ নম্বর বেডের লিয়াকাত আলির পা'টা করতে হবে। আর ২৪০-এর ট্র্যাম ফ্ল্যাপ নেক্রসিস"

"ঝোন থ্রি নেক্রোসিস। কী করব ভাবছি। ফ্রি ফ্ল্যাপ করা যেতে পারে। কিন্তু এতদিন তো পেশেন্টকে হাসপাতালে রাখা যাবে না। ফাইনানসিয়ালি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না। তখন যদি এক্সিলারির সঙ্গে বুস্টার অ্যানাস্টমসিস করে দিতাম এ গাড্ডায় পড়তে হত না। আসলে এত লিমিটেড বাজেট নিয়ে আসে। তখন মাইক্রোভ্যাসকুলার অ্যানাস্টমসিসের ওটি টাইমের খরচ অ্যাফোর্ড করতে পারে না। প্রতি মোমেন্টে ফাইনানসিয়াল সিচুয়েশনের সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করতে হচ্ছে"

"স্যার, লিস্টে তাহলে কী রাখব?"

"দেখ তো পেশেন্টের বাড়ির লোক এসেছে কি না। কথা বলে দেখি"

বিদিশা বেরিয়ে গেল, ২৪০-এর বাড়ির লোককে খুঁজতে। ত্রিদিব নন্দী ভাবতে লাগল এই অপারেশনের টাকাটাও গেল। কমপ্লিকেশন হলে পেশেন্ট টাকা পুরো দেবে না। না দিলে, কমতিটা লেডি ফ্লোরেন্সের ম্যানেজমেন্ট তার ফিস থেকে গুণে নেবে। এর নাম কর্পোরেট ডাক্তারি।

ছয়

অরণির ভালো লাগে না। যখন কাজ থাকে, সময়টা দিব্যি কেটে যায়। বাকি সময়টা যেন আর কাটতে চায় না। কাজের বাইরে বন্ধু-বান্ধব খুব একটা নেই। ঘর বলতে সায়ন্তনি। আদৌ ঘর বলা যায় কি না, বলা কঠিন। তবু সামাজিক অর্থে তো কিছু একটা। মুহূর্ত বলতে বিদিশার সঙ্গে কিছু সময়। তার জন্যেও প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। কখন ওর সময় হবে।

ডিসপ্রোটেকের কাজ শেষ। তবুও নিছক সময় কাটানোর জন্য কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। এটা নেশার মতো হয়ে গেছে। কাজ তো কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রমে মোটা অঙ্কের মাইনে। কাজ আর টাকা। এটাই তার জীবন। পাগলের মতো খাটার মধ্যেই জীবনের সব আনন্দ। টাকা রোজগার, কাজ, আরও টাকা, আরও কাজ করো। তারপর? ভালো কম্পানিতে কাজ মানেই সাকসেস। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। জীবনের সার্থকতা। জীবনের চৌহদ্দি কত সংকীর্ণ।

জীবন থেকে বই হারিয়ে গেছে, সাহিত্য মুছে গেছে, বেডরুমের অন্ধকারে। টিভিতে মধ্য-রাতের আদিমতায় প্রাণ। পরপুরুষের বাহুতে জীবনের ছন্দ। রঙিন গ্লাসে জীবনের রং সুরার ফোয়ারায়। মাদকতার নেশায় নতুন করে দেখতে চাইছে জীবনকে। ধোঁয়াশায় অস্পষ্ট হলেও।

জানতে চাই না, যা জানি না।

বুঝতে চাই না, যা বুঝি না।

আস্বাদন করতে চাই না, অন্তরকে।

তার চেয়ে রঙিন ঠুলিতে স্বপ্নে ভাসা অলীক কল্পনার স্বপ্নালোকে। সেখানেই বাঁচার শান্তি। আধুনিক জীবনের পরিতৃপ্তি।

অনসূয়া পার্স থেকে মেক আপ কিট বার করে বলল “বাড়ি যাবে না?”

“নাঃ। আর একটু কাটিয়ে যাই”

“সারাদিন কাজ। এখন ফুর্তি”

“ফুর্তি কোথায়?”

“পার্ক হোটেলের তন্ত্রে যাব। বরুণ, অমিয়, চিরন্তন আসছে। তুমিও চল না”

“ওখানে কী আনন্দ জানি না”

“কাজ করবে আইটি সেক্টরে। পড়ে থাকবে প্রি-হিস্টরিক দুনিয়ায়। বুঝি না”

লিপস্টিকের আরেকটা প্রলেপ লাগিয়ে বেরিয়ে গেল মাদকতার খোঁজে। বাজনার তালে, দেহের হিল্লোলে, ঝংকার। বিয়ার, বাজনার ঝংকার, পুরুষের অন্তরঙ্গতা - এটাই রিল্যাক্সেশন। ভাবতেই হাসি পেল অরণির।

অরণি জানে না সে কোথায়। এটুকু জানে, যা এরা জানে না। এরা বোঝেই না যা ও বোঝে 'আই নো দ্যাট আই ডোন্ট নো। ডু দে নো দ্যাট?'

বই পড়া, গান শোনা, জলসায় যাওয়া যায় না? ওর বৈঠকখানা লেনের পৃথিবীতে এসবের অস্তিত্ব ছিল না। ওরই ব্যর্থতা। শিখে উঠতে পারেনি। বৈঠকখানা লেন থেকে কলেজ স্ট্রিট, নিদেন পক্ষে নন্দনকানন। ইনকগনিটো বা লন্ডন পাব নয়। সেখানেই হেরে গেছে সায়ন্তনির কাছে।

তাই বউ থাকতেও, ঘর নেই।

সমাজ থাকতেও, সামাজিকতার বালাই নেই।

সন্ধে হলেও, ঘরে ফেরার তাগিদ নেই।

কোথায় একটা দূরত্ব। দুজনের মধ্যে ব্যবধান। রোজ বেড়েই চলেছে।

বিদিশার মুহূর্তের সঙ্গ কী করে উপরি জুটে গেল ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। দু জনের পৃথিবী আলাদা।

ডিসপ্রোটেক কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছিল লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করার। সেই সুবাদে হাসপাতালে পা রাখা। প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্টটা ত্রিদিব নন্দী বিদিশার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিল। অপারেশনের কোডিং থেকে প্রত্যেক পেশেন্টের রেকর্ড কম্পিউটারে নথিভুক্ত রাখতে হবে।

অরণি ঠিক বুঝতে পারেনি বিদিশা কী চাইছিল "আপনি কী কী ভাবে রেকর্ড কালেক্ট করতে চান?"

"পেশেন্ট আউটডোরে রেজিস্ট্রেশন করাবার পর থেকে একটা ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর থাকবে। সেই পেশেন্ট ডিটেলস-এর মধ্যে প্যাথলজি জুড়ে যাবে। এক্স-রে ইনপুটটাও ওই রেকর্ডসে অ্যাডেড হবে। রোজকার রাউন্ড নোটস। নার্সিং রিপোর্ট। অপারেশন হলে পুরো অপারেটিভ রেকর্ডস্। সঙ্গে বিলিং ডিটেলস্"

"বিলিংটা ম্যানেজমেন্ট আলাদা রাখতে বলেছে"

"কেন?"

"আমি কী করে বলব? যা বলেছে, তাই বললাম"

বিদিশার মাথায় ঢুকল না, পেশেন্টের সব রেকর্ডস্ এক সঙ্গে থাকলে, বিলিংটা আলাদা কেন? অরণি লন্ডন পাব-এর ব্যাপারে মূর্খ হতে পারে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি "ডাক্তারি করছেন। এটা জানেন না? বিলিংয়েই তো হাসপাতালের যত খেলা। এর সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার রেকর্ডস্ মেশালে তো প্রত্যেকটা বিলিং জাস্টিফাই করা মুশকিল"

বিদিশা বুঝেছিল। ‘উই আর ট্র্যানসপারেণ্ট’ সব হাসপাতালই দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে আরেক খেলা। আর উচ্চবাচ্য করেনি। এর নাম কর্পোরেট ব্যবসা। দেখাব মর্ডানাইজড্। সব অঙ্কের মতো ঠিক। আসল জায়গায়, টুটি বাঁধা। পরোক্ষ ভাবে, সেই প্রথম আঁচ করেছিল প্রাইভেট হাসপাতালের খেলা। চাকরি রাখতে হবে। নীতিকথা বলে লাভ নেই। এখন বোঝে, নীতিকথার সীমারেখা। কেউ মাত্রাটা ধরে রেখেছে। তখন আর সেটা, নীতি থাকে না। মুষ্টিমেয়র গীতি। ছোটবেলার ছড়াগুলো 'সত্য বলিব। সত্য বই মিথ্যা বলিব না' কিংবা 'সততা' ‘নিষ্ঠা' শব্দগুলো জোলো। যদি স্কুলের মাস্টার হত, মরাল সাইন্সের পাঠ্য-পুস্তকগুলো আবার যুগোপযোগী করে রচনা করত।

অরণিকে বলেছিল “ঠিক বলেছেন। এ ব্যপারে আমার কিছু না বলাই ভালো। এটা হলে আইডিয়াল হত”

ইন্টারন্যশানাল এমডি কোডিংগুলো সাজাতে গিয়ে অরণির আরও কাছে। কাজের শেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কোডিংগুলো নন-মেডিক্যাল অরণিকে বোঝানো। অরণিও সময় কাটানোর অবকাশ খুঁজে পেয়েছিল। কাজের ফাঁকে, প্রফেশনের বাইরে, বিদিশা পেয়েছিল পুরুষ সান্নিধ্য।

অরণি বলত “আপনি দারুণ খাটতে পারেন। সারাদিন কাজের পর, এই যে এর পেছনে সময় দিচ্ছেন, আমি পারতাম না”

“এর মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে”

“আপনার কাজে আনন্দ। আমার বই পড়ায়”

“কী বই পড়তে ভালোবাসেন?”

“গল্পের বই। জীবন কাহিনি। পৃথিবীর ইতিহাস। আপনি বই পড়েন না?”

“এক সময় পড়তাম। এখন সময় পাই না। ধৈর্য নেই”

“বই না পড়লে জানবেন কী করে, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল? চেতনা মূল্যবোধ তৈরি হবে কী করে? টিভি দেখে পরের শেখানো বুলি হজম করতে পারবেন। তাও বা, সেই পরটা কে? তারই বা জ্ঞান কতখানি?”

“তবুও তো লোকে সেই নিয়েই থাকে। আসলে, আমাদের সময় নেই ভাবার। কিংবা জ্ঞান আহরণ করার। জীবনটা বড্ড ফাস্ট হয়ে গেছে”

হোয়াট ইজ দিস লাইফ ইফ ফুল অফ কেয়ার,

উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টেয়ার

নো টাইম টু সি দ্য উডস্ উই পাস

হোয়ার বার্ডস্ হাইড দেয়ার নেস্টস্ ইন গ্রাস

নিজের মনে কবিতাটা আওড়াল অরণি।

বিদিশা অবাক বিস্ময়ে অরণির দিকে চেয়ে। কবিতাটা যে শোনেনি, তা নয়। এত বছর পরেও, কেউ যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনতে পারে, সেটাই আশ্চর্য। ছোটার মধ্যে অবসন্নতা। নিজেকে দেখার মধ্যে ক্লান্তি নেই। সেখানে আত্মসমীক্ষা থাকতে পারে। সেটাও নিভৃতে একাকী।

বাবা বলতেন "কোনও কাজ করার আগে, একবার ভাববি, কাজটা ঠিক কি না" কাজটা হলেও যে আরেকবার ভাবা দরকার, তা মেডিক্যাল অডিট-ই শিখিয়েছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরার পালা। উঠব উঠব করেও বেরোবার আগে ই-মেল চেক করবে, হঠাৎ একদল লোককে অফিসে ঢুকতে দেখে চমকে গেল। এরা তো ডিসপ্রোটেকের কেউ নয়। এরা কারা?

"প্রদীপ সেন আছেন?" অরণির দিকে প্রশ্ন।

ঘাবড়ে ওদের দিকে ফিরে অরণি "আপনারা?"

"সিবিআই স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার" একজন কার্ড বের করে দেখাল।

ভয়ে ভয়ে প্রদীপ সেনের ঘরটা দেখিয়ে দিল অরণি। কেন চাইছে প্রদীপকে? বুঝতে না পারলেও, বড় গন্ডগোলের আশংকায় মনটা কেঁপে উঠল। বিনা বাক্যব্যয়ে সোজা প্রদীপ সেনের ঘরের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ। ভেতরে কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ পরে, একজন বেরিয়ে অরণিকে বলল "সিইও কোথায় বসে?"

সিইও অবিনাশ মজুমদারের ঘর দেখাল "উনি চলে গেছেন"

"ফোন নম্বরটা দিতে পারবেন?"

মোবাইল থেকে নম্বরটা আওড়াল। মনে হল সিবিআই অফিসার পাশে সরে ওই নম্বরে ফোন করছে। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, ফোনে কী কথা হচ্ছে। মাথা নাড়া দেখে মনে হল কথা শেষ। ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর ওরা প্রদীপ সেনকে ঘিরে বেরিয়ে এল "উই আর টেকিং হিম আওয়ে"

কী হয়েছে? কেন ধরে নিয়ে গেল? বুঝতে পারছে না।

বালিটিকুরি হাওড়ার বাসিন্দা প্রদীপ সেন। হাওড়ার সেন্ট থমাস স্কুলের। ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার সঙ্গে নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুসরণ করে। উন্নতির সোপানে, সেখান থেকে সল্টলেকের ডিসপ্রোটেকে। গগনচুম্বী অট্টালিকার হিমশীতল ঘরে নিজের স্বপ্নকেও আকাশছোঁয়ার প্রয়াসী।

অরণিকে বলত "আমারা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। স্বপ্ন ছাড়া আর কী আছে?"

অরণি হাসত "আমি ছাপোষা মানুষ। তোর মতো অত স্বপ্ন-টপ্ন দেখতে পারি না। বৈঠকখানা লেন থেকে সল্ট লেক। আমার দৌড় অতটাই। এর বেশি কিছু হবে না"

“কেন হবে না? তোর যাওয়ার মধ্যেই হেরে যাওয়া”

ছুটতে তো শেখেনি। ভালো ছাত্র ছিল। পড়াশোনা করে খেয়েপড়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে। ছুটবেই বা কেন? বড় চাওয়া নেই। ছেলে-পুলে থাকলে চাওয়ার কারণ থাকত? যখন নেই, কী হবে ছুটে? কাজ, বই, বিদিশা বাঁচার অনেক রসদ।

প্রদীপকে বলত “থামলেই বা কী ক্ষতি?”

বালিটিকুরির উচ্চাকাঙক্ষা। প্রদীপ মেনে নিতে পারত না এই অর্থহীন যুক্তি। সাদামাটা চেহারার অরণিকে মনে হত অতি সাধারণ। যখন কালো মোটা ভারী ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে প্রদীপকে দেখত ওর কৃষ্ণকায় শরীরে এগিয়ে যাওয়ার স্পন্দন পেত না। যেন ও সত্যি সত্যিই, থেমে গেছে।

এ হেন ‘গতির' বাহক প্রদীপকে কেন সিবিআই ধরে নিয়ে গেল? ওরা তো, হঠাৎ কাউকে গ্রেপ্তার করে না।

গার্গী উঠে অরণির টেবলে “কী ব্যাপার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না” অরণি হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে গার্গীর দিকে “তুমি কিছু জান?”

মাথা নাড়ল “বড্ড স্বপ্ন দেখত”

“মানে?” গার্গী উৎসুক।

“বড় হওয়ার। উন্নতি করার। এগিয়ে যাওয়ার”

“তাতে দোষের কী? আমরা সবাই তো তাই দেখি”

“আমি দেখি না। বড় ভয় হয়”

ভিতু অরণিকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছে অফিসের সবাই। ওদের মতো নয়।

ওরা যা করে, ও তা করে না।

ওরা যা ভাবে, ও তা ভাবে না।

ওরা যাতে আনন্দ পায়, ও তাতে পায় না।

তবুও মিষ্টভাষী অরণিকে ওর মতো থাকতে দিয়ে ওরা স্বর্গ খুঁজেছে। ওর মতো না ভাবলেও অবজ্ঞা করেনি। ওদেরই একজন। ভুল কিছু তো বলে না।

অরণিকে দেখে গার্গী বুঝতে পারছে, ও কী বলতে চাইছে। কিন্তু মানতে পারছে না।

এই ছোটার নেশায় ভুলে যাই থমকে দাঁড়ানো। এগোনর মধ্যে যেমন আগ্রগতি পিছিয়ে পড়ার ব্যর্থতাও। দেখতে চাই না অশনি সংকেত। পাশেই সব সময়। উত্থানের মধ্যে পতন, চলার মধ্যে থামা, জেতার মধ্যে হারা - জীবনের অঙ্ক। ক্রমবর্ধমান সভ্যতা সত্যটাকে দেখতে বা বুঝতে চায় না। কিংবা বুঝলেও, শুনতে চায়

না। শুনলেও, মানতে চায় না। শুনলে অরণির মতো অন্যরকম হতে হবে। গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসাতেই সার্থকতা। গতের বাইরে ইন্দ্রজিৎ হওয়ার সাহস নেই। থাকলে লোকে বলবে নপুংসক অথবা মুনি-ঋষি। শুধু মনকে সান্ত্বনা।

গার্গী বলল "আমার বড্ড ভয় করছে"

"ভয় পাওয়ার কী আছে? তোমাকে তো সিবিআই ধরে নিয়ে যায়নি"

"যেতেই পারে"

নিজেরই সংশয়ে নিজের কাছে। সিবিআই শুধু প্রদীপকে নিয়ে যায়নি, এগোনর চোরাবালিতে আটকে জানান দিয়েছে 'সময় হয়েছে নিজেকে দেখার'

যে অরণিকে এতদিন গুরুত্ব দেয়নি, আজ ওর কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে।

অরণির প্রগাঢ় ভালোবাসায় থেমে যাওয়াটাই রুচিরার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ওর ভালোবাসা বুঝতেই পারল না। অভিমানে চলে গেল।

"ঘরে বসে, বই পড়ে, সূর্য-তারার স্বপ্ন দেখলে কিসসু হবে না"

"না হলেই বা কী আসে যায়?"

"তোমার যায় না। আমার যায়। আমার বাবা-মায়ের যায়। আমার গুষ্টির যায়" রুচিরা দৃঢ় "তোমার মতো জীবন বোধহয় বাবাও আমার কাছে আশা করে না"

"তোমার বাবা তোমার থেকে কী আশা করেন জানি না। জানতে চাইও না। তুমি আমার থেকে কী আশা কর, সেটাই বড়"

"আমিও তাই আশা করি, যা বাবা আমার থেকে আশা করে। এগিয়ে যাওয়া"

বোসপুকুরের মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নটা বোঝার আগেই রুচিরার মজ্জায়। এগোতে হবে। উন্নতি করতে হবে। প্রেম যদি আসে, প্রত্যাখ্যানের মানেই হয় না। তবে এগোনর পথ থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়। সব মাপে ফিট করে নিতে হবে।

দূরে লঞ্চের সাইরেনের আওয়াজ। পূর্ণিমার চাঁদটা কেমন জোলো। প্রাণ নেই, আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। ছকে বাধা অঙ্ক। অনুভূতিটাও। পূর্ণিমার মোহময় স্নিগ্ধতা হারিয়ে গেছে। আবেশ ছড়াচ্ছে না।

ভালোবাসা আছে, মাধুর্য নেই।

রং আছে, তুলি নেই।

মন আছে, প্রাণ নেই।

সম্ভোগ আছে, উত্তেজনা নেই।

“তুমি আমায় ভালোবাস না?”

“কতবার বলেছি বাসি... বাসি... বাসি। তোমাকেও তো আমার ভালোবাসার মর্যাদা দিতে হবে”

“তোমার মতো হয়ে?”

“তা কেন? সবার মতো হয়ে। সবাই যা চায়, তাই হয়ে”

গন্ডগোলটা কোথায়, অরণি জানে না। হতেই পারত, রুচিরার, সায়ন্তনি, প্রদীপের, অনসূয়া বা গার্গীর মতো। হলে, জীবনটা কত সহজ হত। সব কিছু মাপা অঙ্কে। প্রগতি যাই হোক না কেন, সামাজিক গতিটা অব্যাহত থাকত। সেখানেই ফাঁক। ভেতরের মানুষটা বোধহয় নিজেকে খুব ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে না। বুঝতেও পারে না কেন সে সেটা করতে পারছে না।

বিদিশা বুঝতে পারে। তাই অরণির সঙ্গে বন্ধুর মতো সময় কাটাতে একটুও অসুবিধা হয় না। এ যেন তার বৈচিত্রহীন জীবনে একটা খেলা। কেউ নেই বলেই সংযত অরণির সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো যায়। ফাঁকে, কোথায় একটা সুর অরণির মধ্যে। জ্ঞানের সুর। নিজের মতো, নিজের মধ্যে থাকার সুর। অন্যদের থেকে আলাদা। ও তো তার ওপর কোনও দাবি নিয়ে আসবে না। সে ক্ষমতা ওর নেই। তাই, যেটুকু সময় কাটানো যায়। সি ইজ সেফ ইন হিস হ্যান্ডস।

“আমার থেকে কী পাবে জানি না। তোমার বউ আছে। আমি কোথায়?”

অরণি জবাব দিতে পারেনি। নিজেও জানে না বিদিশা কোথায়। বুঝতেও পারে না, বিদিশার কাছে কেন বারবার ফিরে আসে। ধোঁয়াশা চিন্তার মধ্যে, বিদিশার উপস্থিতি ভালো লাগে। মনের কোণে গভীর স্পন্দন। সেটাই পাওয়া। বেঁচে থাকা। তার অন্ধকার পৃথিবীতে একচিলতে জীবন।

“সায়ন্তনিকে ছেড়ে আমার কাছে কী পাও?” কয়েকবার প্রশ্নটা ছুড়ে বিদিশা নীরব। বলতে তো পারে না 'সায়ন্তনির কাছে ফিরে যাও'। বলা যায় না। তাহলে ওর নাটকে পুরুষ চরিত্র আসবে কোত্থেকে?

সায়ন্তনিকে ছাড়তে পারলে শান্তি ফিরত। সেখানেও সাহসের অভাব। প্রথা-নীতির মধ্যে ও নেই। প্রথা ভাঙার সাহস বা ক্ষমতাও নেই।

মা যখন বলেছিল ‘ভালো পরিবার, বালিগঞ্জে থাকে’ অরণির মনে হয়েছিল, দেখতে ভালো নয়। অতএব, এই মেয়েই ঠিক। উন্নাসিকতা থাকবে না। ভুল করেছিল। সুন্দরী দেখলে সকলেই সন্দিহান। হাজার চিন্তা। আগের কোনও অ্যাফেয়ার নেই তো? দেমাকি? যদি বড়লোক ঘরের হয়, কথাই নেই। আরও চিন্তা। ঘর করবে? ভালো ঘরণী হতে পারবে? সন্দেহ যে হয়নি, তাও নয়।

মাকে বলেছিল “আমরা বৈঠকখানা লেনের। ওরা বালিগঞ্জের। তেলে-জলে খাপ খাবে তো?”

“চিরকালই এখানে থাকব নাকি? তুই ভালো চাকরি পেয়েছিস। নতুন বাড়িতে উঠে যাব”

বৈঠকখানা লেনে চিরকাল থাকবে না সেটা অরণি জানত। আর্থিক দিক ছাড়াও অনেক দিক আছে। সে বয়সে অজানা। যাতে সায়ন্তনির কষ্ট না হয়, বিয়ে ঠিক হওয়ার সঙ্গে রুবি হাসপাতালের উল্টোদিকে ইসিটিপির ফ্ল্যাট। সায়ন্তনির বাড়ির কাছে। ওরও সুবিধা হবে।

প্রথম প্রথম সে কি প্রেম "তোমাকেই খুশি করতে এসেছি" নারীর নিবিড় অন্তরঙ্গ স্পর্শে সব ভুলে গেছিল। সায়ন্তনি যখন তার পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, অরণির সব গোলমাল। সায়ন্তনি কেমন বোঝবার আগেই, ওর দেহের জোয়ারে গা ভাসিয়েছিল।

নিবিড় আবেগে ওকে আঁকড়ে "আর কিছু চাই না। শুধু তোমাকে খুশি করতে"

"আমার জন্য তুমি এই ফ্ল্যাট কিনলে?"

"হ্যাঁ। তুমি তো বৈঠকখানা লেনে থাকতে পারবে না। এটাকে তোমার মতো করে সাজিয়ে নাও"

সাজিয়ে নিয়েছিল, মনের মতো করে। বাবার দেওয়া নতুন বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবল। ফুলেদানিতে ফুল। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সোফা সেট। ম্যাচিং পর্দা। এসি, ফ্রিজ। সুন্দরভাবে সাজান ফ্ল্যাট দেখে অরণির নতুন জীবনের আশা। বৈঠকখানা লেনের এক চিলতে ঘর ছেড়ে, পূর্ব কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে সাজনো সুন্দর ফ্ল্যাট, আপাত যৌবনা স্ত্রীর মধ্যে অরণি খুজছিল নতুন জীবনের ঝংকার। নতুন প্রাণ। নতুন অনুভূতি।

সায়ন্তনি ভালোবাসত ঘর সাজাতে। গড়িয়াহাট বাজার, মঞ্জুষা থেকে নানান ঘর সাজনোর উপকরণ কিনে আনত। যদিও অরণির মনে হত অপব্যয়, তবু সায়ন্তনির যখন ইচ্ছে, বাধা দিত না।

"আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে হবে"

নিম্নবিত্ত ঘরের অরণির কাছে শৌখিনতা। বাড়তি টাকা থাকলে অপচয় করা কেন? ব্যাঙ্কে, মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট কর। দু-চিলতে কামরার পুরনো বাড়িতে মান্ধাতা আমলের কলঘরে চলটা ওঠা দেওয়ালের ওপর নীল রঙের প্রলেপ। বৌবাজারের সেগুন তক্তাপোশে শুয়ে ঘর সাজানোর স্বপ্ন। টাকার অভাবে জামা কিনতে গেলেও চিন্তা। সেখানে ঘর সাজানো বাতুলতা। তবুও সায়ন্তনির শখ।

সায়ন্তনি তির্যকভাবে বলত "ভবিষ্যতে কী আছে, কে জানে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমান মাটি করার কোনও মানেই হয় না"

সায়ন্তনি তখনও বোঝেনি। এখন বোঝে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে পারে, কামালে বৈঠকখানা লেন ছেড়ে ইস্টার্ন বাইপাসে ফ্ল্যাট কিনতে পারে, কিন্তু রুচিতে বৈঠকখানা লেনেই।

মোবাইলে ফোন "আজ দেখা হওয়া সম্ভব?"

"আজ হবে না" বিদিশা সংক্ষিপ্ত।

“ব্যস্ত?” অরণি উৎসুক।

“আর বলো না। চারটে মেজর বার্ন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। কেন যে এই পেশেন্টগুলো মরতে আর টাকার অপচয় করতে হাসপাতালে আসে?”

“আর কোথায় যাবে?”

“মরবার জন্য তো সরকারি হাসপাতাল খোলা। ওখানে গেলেই পারে। খরচ কম”

“ভালো চিকিৎসার জন্যই তো খরচ করে প্রাইভেট হাসপাতালে”

“ভালো চিকিৎসার জন্য বলো না। স্বপ্ন কিনতে আসে। প্রপার বার্ন ইউনিট ছাড়া বার্ন-এর চিকিৎসা হয়? এখানে বার্ন-এর ব্যবসা হয়”

বিদিশার কথার মধ্যে বিরক্তি-মেশানো শ্লেষ।

“রাখছি। অনেক কাজ” বিদিশা আর কথা বাড়াল না।

ফোন রেখে আবার সেই নিরালা নিঝুম অন্ধকার। সরকারি অফিসের কেরানি নয়। ইলেক্ট্রিক বিল ভরার সঙ্গতি আছে। তার জীবনে আলোর মধ্যেও অন্ধকার, ব্যাপ্তির মধ্যেও একাকিত্ব, সাজানো পৃথিবীর মধ্যেও নির্জনতা। সেখানে সে একা। সম্পূর্ণ একা। সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নিজের পৃথিবীটাকে ঠিক সাজাতে পারছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া, আর কীই বা আছে?

সাত

স্যাটারডে ক্লাবের লাউঞ্জে সায়ন্তনি বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুলগ্নাকে বলল “লাইফ ইস গেটিং সো ভেরি ডাল। উই হ্যাভ টু ডু সামথিং”

"আর কী করার আছে ?"

“সামথিং ইন্টারেস্টিং। সামথিং ডিফারেন্ট”

হাল্কা সিফনের শাড়িটা বুকে ফেলে, ইটালিয়ান লেদারের ব্যাগ থেকে এস্টিডা-ল্যডারের মেক-আপ কিট বের করল। আয়না দেখে ঠোঁটে লিপস্টিকের প্রলেপ দিল। নীল পাড় সাদা সিফনের সঙ্গে নীল লিপস্টিক যায়। একবার লাগাতে গিয়ে তার কালো গায়ে কিম্ভুত-কিমাকার। দোষটা জন্মের। মা কেলেকুষ্টি, না হলে এ দশা হত না। বাবা সুপুরুষ ছিলেন। বিয়েও করেছিলেন বাঁশদ্রোণীর লক্ষ্মী মেয়েকে। পটের বিবি। অথচ সমাজে অচল। আটপৌর শাড়িতে পার্টিতে নিয়ে যেতেও লজ্জা। শুনেছে কেতাদুরস্ত সাহেব বাবা, তার পটের বিবিকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন। রূপ থাকলে কী হবে? যৌবনের উচ্ছ্বাস নেই। তার দুরন্ত আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার মানসিকতাও নেই। আবেগ থাকলেও, প্রকাশ নেই।

হ্যান্ডসাম সুপুরুষ সোসাইটিতে যে বেশিদিন মহিলা-বিহীন থাকবে এমন নয়। জুটেও গেছিল মায়ের মতো কেলে ভূত। রূপ যখন নেই, যৌবন ঢেলে দিতে হবে। দিয়েওছিল। ফসল সায়ন্তনি। তাতে যদি বাবার কিছুটা পেত উতরে যেত। কপালও মন্দ। আদলটা মায়ের মতো। রুজ-লিপস্টিক ঘষে যদি পাতযোগ্য করা যায়। সেই চেষ্টাই। বিউটি পার্লারগুলো শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নেয়। ফেসিয়াল টোনিং, হারবাল থেরাপি করেও চেহারা ফেরে না। সকাল-সন্ধে ল্যডারের মেক আপ কিট দিয়ে নিজেকে পরিবেশন। কথা দিয়ে মজানো। বুকের আঁচল ফেলে আকর্ষণ বাড়ানো। তাতে যে কাজ হয় না, এমন নয়। বাবার জিনের প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড কুপুরুষ জুটেছে। যখন কিছুই জুটছে না, এই সই। চালালেই চলবে। কম বয়স। বাড়তি গড়ন। ফিগার হাগিং ড্রেস। মস্তি করার লোক জুটে যাবে।

এভাবেই জুটিয়েছিল কালীশেখরকে। পাইকপাড়ার কালীশেখর মুখোপাধ্যায়, বালিগঞ্জের সায়ন্তনির সংস্পর্শে জাতে উঠতে চেয়েছিল। কালীশেখর জাতে কুলশ্রেষ্ঠ বামুন হলেও, কথায় অর্থে সামাজিক দিক দিয়ে সায়ন্তনি যুগশ্রেষ্ঠা। কুলশ্রেষ্ঠর তকমা ধরে না বসে যুগের পথে পা বাড়ানো। তাই করেছিল কালীশেখর। উপেক্ষিতা সায়ন্তনির দিকে হাত বাড়িয়ে।

“তোমাকে আজ ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে”

“আমার ড্রেস?”

“তোমাকে বিদেশি ড্রেসে বেশি মানায়। জিনস্ টপস্ মিনি স্কার্ট”

“আর আমাকে?”

ঠোঁটে চুম্বন “তোমাকেও”

অ-ছোঁয়া আনন্দে কেঁপে উঠেছিল সায়ন্তনির বুক। তাকেও কারও ভালো লাগে। যেমনভাবেই জন্মাক অস্তিত্বের মূল্য আছে। কালীশেখরের প্রথম চুম্বন, উচ্চবিত্ত বালিগঞ্জের মেয়েকে টেনে এনেছিল পাইকপাড়ার গলিতে। কালীশেখরকে ভালোবেসেছিল কিনা জানে না। অস্তিত্বের মর্যাদা পেয়েছিল। ওর পাশে রানি রানি লাগত।

কালী তখন মণীন্দ্র কলেজে বিএ পড়ে। সায়ন্তনি সাউথ সিটি। আলাপ হওয়ার কথা নয়। জিডি বিড়লা সভাঘরের কলেজ ফেস্ট উত্তর-দক্ষিণের যোগসূত্র। সায়ন্তনি সেজেগুজে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ কালো সুপুরুষের প্রশ্ন “গ্রিনরুমটা কোথায়?”

“নীচে নেমে ডান দিক দিয়ে চলে যান সোজা। স্টেজের পেছনে”

চলে গেছিল কালীশেখর। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল “ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন দরজাটা?”

অনুপায় বগলদাবা করে গ্রিন রুমের দরজা পর্যন্ত নিতে হয়েছিল। বাঞ্ছারামের বাগানে ভালোই অভিনয় করেছিল। নাতির চরিত্র।

নাটক শেষে সায়ন্তনি বলেছিল “ভালো অভিনয় করেছেন”

“আপনার ভালো লেগেছে?”

“ভীষণ। ভীষণ ভালো লেগেছে”

সেই আলাপ। দ্বিতীয় দিন ফেস্ট থেকে বার করে এনেছিল কালীশেখরকে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে ধাবায় দুপুরের তরকা রুটির ফাঁকে, চোখের চাওনিও মাংসের বদলে যোগ। নিরামিষ খাওয়ায় মাংসের অভাব পূর্ণ করেছিল সায়ন্তনি। কালীশেখরের বৈচিত্র্যহীন উত্তর কলকাতার জীবনে দক্ষিণ কলকাতার মশলা। শুধু বিরিয়ানি তৈরি বাকি।

সায়ন্তনির কথার জের টেনে সুলগ্না বলল “হোয়াই? হোয়াট ইজ ইওর হাবি আপটু?”

“ডোন্ট টক অ্যাবাউট দ্যাট মোরন। টু হিম, লাইফ ইজ অল কেরিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্ক”

“হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইয়ং ক্যাচ? হোয়াটস্ হিস নেম?”

“রনিত ইউ মিন?”

“ইয়েস”

“টায়ারড্ অফ লেয়িং ওপেন মাই ক্রচ টু হিস স্টিক”

“হোয়াই?”

“সেম ওল্ড স্টোরি। ডোন্ট ইভেন গেট অ্যান অরগ্যাজম নাউ”

টু মাচ অফ এভরিথিং ইজ ব্যাড।

রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই বড়। পেয়ে গেলে, মূল্য থাকে না। রনিতের অস্তিত্ব সায়ন্তনির কাছে ম্লান, নিস্পৃহ। রনিত না হয়ে অন্য কেউ হতে পারত। দীপঙ্কর, শুভাশিস বা অতীন। তাতে সায়ন্তনির বোরডম কাটবে না। সুলগ্নাও সেখানেই।

একদিন কালীশেখরের সান্নিধ্যের জন্য অধীর আগ্রহে সারারাত না ঘুমিয়ে কাটাত। বুকটা ব্যথাভরা কামনায় মোচড় দিত। তখন অবশ্য বয়স কম। সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাও তীব্র। কখনও দিনে তিনবার। সে বয়স নেই। আকাঙ্ক্ষা এখন বৈচিত্র্য খুঁজছে।

সুলগ্না বলল “হার্ড ইউ ওয়ার এনজয়িং ইওরসেলফ উইথ ট্যানিয়া?”

“নট এক্স্যাক্টলি। ইট ওয়াজ অ্যাট দ্য অরগি ফেল্ট হার চার্ম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। হোয়াই নট গিভ এ ট্রাই”

“ওয়াজ ইট ফান?”

“ইট ওয়াজ গুড ফান। হ্যাভ ইউ ট্রায়েড ইট?”

“না। তোকে শোনার পর মনে হচ্ছে, ইটজ ওয়ার্থ এ ট্রাই”

“হোয়াই নট? হ্যাভেন্ট সিন ট্যানিয়া ফর এ হোয়াইল” ইঙ্গিতটা বুঝতে ভুল হয়নি।

তবুও কোথায় দ্বিধা। ইংরেজি বললেও সুলগ্না এখনও সাহেবদের মতো বলিষ্ঠ হতে পারেনি। প্রথাগত রীতি থেকে বেরনো সহজ নয়। উগ্র আধুনিকতাকে বরণ করলেও, সামাজিক সংস্কার হাড়ে-মাসে-মজ্জায়। তবুও মন বৈচিত্র্য খুঁজছিল।

সুলগ্না সায়ন্তনির মতো উচ্চবিত্ত পরিবারের নয়। সল্ট লেকের এএ ব্লকে ছোট্ট একতলা বাড়ি। ষাট দশকে যখন সল্ট লেক তৈরি হয়নি বাবা জমিটা জলের দরে কিনেছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় রিটায়ারের আগে দু-কামরার বাড়ি। হোলি চায়েল্ড থেকে মাধ্যমিক। বেথুন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক। শেষমেশ প্রেসিডেন্সি। দেখতে সুশ্রী। কম বয়সে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে উঠতি ছেলেদের টিপ্পনি। তখনও সল্ট লেক এত জনবহুল হয়নি। ভয়-ভয় করত। পাশ কাটিয়ে 'আর পারি না' 'কী সেজেছে গুরু' ‘মামনি, একটু ফিরে তাকালেও পারো' মামনি ফিরে তাকায়নি। প্রেসিডেন্সির করিডরের মধ্যে শেলি, কিটস, বায়রনের পাতায় চিন্তাধারাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। ইংরেজি অনার্স পড়ার সময় উচ্চবিত্ত অনির্বাণের সঙ্গে সম্বন্ধ।

কোন এক বিয়েবাড়িতে অনির্বাণের চোখে পড়ে গেছিল। সম্বন্ধের কথা ওদের বাড়ি থেকেই। মা হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বড়লোকের অমন ভালো ছেলে। যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। ডিসিপিএল-এ চাকরি। কপালকে ধন্যবাদ।

বাবা অবশ্য আপত্তি করেছিল "অমন অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দেওয়া কী ঠিক হবে?"

"কেন হবে না? ছেলে হিসেবে তো সব দিক দিয়েই ভালো। এক ভাই, এক বোন। ছোট পরিবার। সুলগ্না সুখী থাকবে"

যেন সুখটা পারিবারিক ছকের অঙ্কের বেষ্টনিতে সীমাবদ্ধ। সামাজিকভাবে যা শ্রেষ্ঠ, আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য, সেটাই সুখের পরিমাপ। সুখটাকে কত অনায়াসেই বাক্সবন্দি করা যায়। চিন্তাধারার পরিধিতে এনে, অলীক কল্পনায় বিচরণ। স্বপ্ন-সাগরে ভাসার মধ্যেই জীবনের স্বার্থকতা খোঁজা।

"তবুও... তেলে জলে মিশ খায় না। ওদের তুলনায় আমরা সাধারণ। সমানে সমানে বিয়ে হওয়া উচিত"

বাবার আপত্তি উচ্চবিত্ত 'হীরের টুকরো' অনির্বাণের ইচ্ছের কাছে টেকেনি। শুভলগ্নে মালাবদল। অনির্বাণের সামাজিক স্ত্রী। ভালোবাসতে চেয়েছিল অনির্বাণকে, তার ঘরকে। অনার্স শেষে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সপ্তপর্ণীর সুগৃহিণী। শ্বাশুড়ির মন জয় করতে একান্ত আগ্রহী।

প্রথম প্রথম, অনির্বাণও আবেগে বিহ্বল। সুলগ্নাকে জড়িয়ে বলত "আমার সোনা বউ... আদরের বউ... আমার বউ"

নিজেকে সঁপে ভালোবাসার আমেজে গুঙিয়ে উঠত "উঁ... উঁ... উঃ"

নিঃশব্দে ওর বাহুডোরে। যেন সব চাওয়া ওরই মধ্যে। সম্মোহিনী রাত, সুলগ্নার হৃদয় মন গুনগুনিয়ে উঠেছিল আমরা দুজনে স্বর্গ চালনা গরিবো ধরণীতে। কল্পনালোকে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল ভাষাহারা বন্ধনহারা ভালোবাসার আবেগে। নতুনভাবে কাছে পাওয়া। তার উষ্ণতায় বাঁচার রঙিন ছন্দ। শেলি হারিয়ে, বায়রন মুছে, চসার অতীত। বেথুন-প্রেসিডেন্সি এক লহমায় মুছে শরীর চেতনায়।

অনির্বাণকে আঁকড়ে বলেছিল "আমাকে তোমার মতো করে গড়ে নাও"

পতিব্রতা বাঙালি নারীর সঁপে দেওয়ার মধ্যেই সম্পূর্ণতা। সুলগ্নাও খুঁজেছিল। ভালোবাসা শব্দটা বোঝার আগেই ভালোবাসতে চেয়েছিল অনির্বাণকে। যেন হীরের টুকরো অবস্থাপন্ন ঘরের কৃতী ছাত্রকে বিয়ে করলেই স্বর্গ। মা-বাবারা কত বোকা। স্বর্গের সংজ্ঞাই জানে না।

স্বর্গ মানে, আর্থিক সম্পূর্ণতা।

স্বর্গ মানেই, সামাজিক সহায়তা।

স্বর্গ মানেই, ফলাও করে অর্থ-সামাজিক উচ্চাশার বড়াই।

স্বর্গকে যে কে বলেছিল দৈনন্দিন পরিমাপে ফেলতে, ঈশ্বরই জানেন। রোজকার চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশে নামিয়ে আনার মধ্যেই কর্তৃত্ব।

যা বোঝা যায়, তাই স্বর্গ।

যা চেনা যায়, তাই ধর্ম।

যা সামাজিক শ্রেয়, তাই জীবন।

সামনে মূর্তি না থাকলে আরাধনা করা যায় না। সামাজিক বলয় না থাকলে বিপন্ন লাগে। ২৪ ঘণ্টা অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সমাজ-সভ্যতা-জনগণের প্রয়োজন। বুঝতেও পারে না, প্রতি মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে নিজেকে বিক্রি করছে সম্পূর্ণতার নামে।

সেই সম্পূর্ণতা খুঁজেছিল অনির্বাণের মধ্যে।

"তোমাকে আমাদের সোসাইটিতে চলতে হবে। পারবে না?"

"নিশ্চয়ই পারব" অনির্বাণের কথায় সায় দিত।

অনির্বাণের প্রশস্ত বুকে নিজেকে সঁপে প্রতিজ্ঞা করত মনে-প্রাণে ওর সোসাইটির উপযোগী হবে। ঘর করতে গেলে ওর ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতেই হবে। বিয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজেকে আধুনিক করার ব্রত।

সায়ন্তনির মোবাইলটা বেজে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মুখ ফ্যাকাসে। ফোনটা কেটে দিল।

"কে?" সুলগ্না উদগ্রীব।

"অরণি। ট্যানিয়াকে লেডি ফ্লোরেন্স হসপিটালে ভর্তি করেছে"

"কী হয়েছে?"

"হি ডাসেন্ট নো। কিছুই বলতে পারল না। শুধু বলল সি ইজ আনকনসাস"

সপ্তাহ খানেক আগেই তো ট্যানিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওর বাড়িতে রাতের মজলিস ভালোই জমেছিল। অনেকেই ছিল। সিরিয়াল স্টার মৃদুল, সিরিয়াল টেলিফিল্মের হিরোইন মনোলীনা। ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্টার মনোময়। আরও অনেকে। হুইস্কি, বাজনা, নাচ, ধান্দাবাজি। সবই নিয়মমাফিক। পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনগুলোও।

বেশ কয়েক পেগ চড়িয়েছিল। স্বাভাবিক নিয়মে বা হুইস্কির ঘোরে বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে বারবার মাটিতে। পাশে হুইস্কি হাতে রনিত। প্রথমে দূরে বসলেও ক্রমশ কাছে। শেষে জড়িয়ে চুমু। ব্লাউজের ওপর দিয়ে বাঁ হাতটা বুকে।বিস্বাদ রনিতের ছোঁয়া। সায়ন্তনিকে আর আকৃষ্ট করে না। প্রাণ থাকলেও যৌবনের মাদকতা নেই। নতুন মানুষের সান্নিধ্যে উন্মাদনা চাই। যেই হোক না কেন। সেই নতুন ছোঁয়ায় নতুন অস্তিত্ব। কাউকে জাপটালেই অনুভূতি। অন্যের মধ্যে নিজেকে অনুভব।

ট্যানিয়ার দিকে তাকিয়ে। সুন্দর সেজেছে। সাদা সিফনের ঘাগরা চোলি। তার ওপর রূপালি চুমকি বুটির কাজ। লো-কাট ঘাগরার ওপর মুক্তর হার স্তনের উপরাংশে লুটিয়ে। হার-মাংসের যুগলবন্দি। এক হাতে ম্যাচিং মুক্তর ব্রেসলেট। অন্যটায় রেমন্ড ভিলের ঘড়ি। ছিপছিপে ট্যানিয়া সবেতেই সুন্দর। লম্বাটে মুখের হাসি যে কোনও বাজারি পণ্যকে পাতযোগ্য করতে সক্ষম। তাই মডেল হিসেবে রেট হাই। সেলিব্রিটির তকমা এখনও পড়েনি। তবে পণ্যের বাজারে ট্যানিয়ার মুখ সেলিব্রিটিদের থেকে কিছু কম নয়। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সে যারই হোক না কেন।

আশ্চর্য, ট্যানিয়া মালিয়া এখনও সিনেমা সিরিয়ালের অফার পায়নি। লাইনে জানাশোনা ভালোই। কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সংকোচে পারেনি। ট্যানিয়া কী মনে করবে। রূপ আছে, যৌবন আছে। কিন্তু সিনেমায় নামতে হলে কাফি নয়। আরও কিছু চাই।

নিজের অক্ষমতা দেখালেই সবাই নড়েচড়ে বসে। শুনতে চায় না। যে বেদবাক্য উচ্চারণের ধৃষ্টতা রাখে, সে বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়। বন্ধু মানে মন জুগিয়ে কথা বলা। ভেতরের কথা নয়। রূঢ় বাস্তব অন্তরমহলের। একাকিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজের সামনে ঠুলি এঁটে রঙিন দুনিয়া দেখা। আত্মতুষ্টির সঙ্গে দুনিয়াকে বোকা বানানো। ট্যানিয়াকে দেখা মাত্রই বন্ধু হতে চেয়েছিল। তার থেকে ছোট ট্যানিয়াকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায়নি।

চমকাল রনিতের টিপ্পনীতে "ইউ আর ফ্রিজিড্ টুডে"

ফ্রিজিড? মাই ফুট। সেম ওল্ড জেসচার্স ডোন্ট ইন্টারেস্ট হার এনি লঙ্গার। ইজ হি এ মোরন নট টু আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠেলে সরিয়ে দিল। শাড়িটা ঠিক করে উঠে বলল "গো অ্যান্ড ট্রাই আনাদার প্যাসানেট হোর টু কয়েঞ্চ ইওর সেক্সুয়াল এক্সট্যাসিস"

আশ্চর্য নিজের কথায়। কেলে ভূত কী কালীশেখরকে এভাবে কখনও বলতে পেরেছিল? এই ক'বছরে কত পাল্টে গেছে। তখন কালীশেখরের একটু স্পর্শের আশায় মন আঁকিবুকি করলেও, এখন রনিত, শোভনেশ, মনোময়, মৃদুলের ছোঁয়াতে অনুভূতি হয় না। সব পুরুষই এক। ম্লান। অরণির স্পর্শ সেখানে নেই। ওর প্রতি আসক্তি বহুদিন আগেই ক্ষীণ। এদের স্পর্শও। জীবনের স্পন্দনটাই ঢিমে হয়ে গেছে।

ট্যানিয়া সায়ন্তনির দিকে এগিয়ে বলল "হোয়াই ইজ ইওর হ্যান্ড এম্পটি? হোয়ার ইজ দ্য গ্লাস?"

"ডোনট ইউ ওয়ারি। আই উইল হেল্প মাইসেলফ"

মনোলীনা ট্যানিয়াকে জড়িয়ে ধরে মনোময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "কাম অন মনোময়, টেক এ স্ন্যাপ অফ আওয়ার্স"

সেলিব্রিটি হতে গেলে বাংলা নয়, ইংরেজি। ঝলসে উঠল মনোময়ের নিকন কুলপিক্স।

“রবিবারের পেজ থ্রিতে এটা চাই”

মনোলীনার অনুরধে মুচকি হাসি মনোময়ের। পুরনো খেলা। পুরনো নিয়ম। মানে, রাতের সঙ্গী জুটল। খ্যাংড়াকাঠি লিকলিকে মনোলীনার সঙ্গে শোয়ার কোনও আনন্দ নেই। কাপড়-জামা খুললে হাড়। তবু মেয়ে তো। পৌরুষের রাতের খোরাক মজুত। নেই মামার থেকে কানা মামা অনেক ভালো।

কী যে ভাবে এরা। পেজ থ্রিতে ছবি উঠলে সেলেব হয়ে যাবে। লোকে চিনলে আরও দুটো সিরিয়ালে চান্স? যা ভাবে ভাবুক। ওর কী। মজা তো মোফতে। ক্ষতি কী। মতিঝিলের দু-কামরার ভাড়া বাড়ির মনোময় ‘সুন্দরী’দের ভোগ করছে, তাই বা কম কী! মডার্ন জার্নালিজমের বাস্তব রূপ।

মনোলীনা সায়ন্তনিকে বলল “আই অ্যাম এনজয়িং দ্য পার্টি। দাঁড়াও আসছি”

টেলিফিল্ম প্রডিউসার নির্ভিক রায়ের কোলে বসে প্রশংসা “ইউ লুক চার্মিং”

বাবার বয়সি বুড়ো না কি চার্মিং। অবশ্যই। টেলিফিল্ম বা সিরিয়ালে যদি সুযোগ জুটে যায়।

ভড়ং দেখে সায়ন্তনি বিরক্ত “ইসন্ট ইট টাইম টু সার্ভ ডিনার?”

“আর ইউ ইন এ রাস?”

“নট অ্যাট অল। আদার্স মাইট বি”

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। হেসে সায়ন্তনিকে বলল “লেট মি ট্রাই”

সবাই চলে যাওয়ার পর ট্যানিয়া লক্ষ করল, সায়ন্তনি সোফায় নেই। কোথায় গেল? বেরিয়ে যেতে তো দেখেনি। বাইরের দরজা বন্ধ করে আয়নায় চেহারাটা দেখল। মুক্তোর সেট ড্রেসিং টেবলে। ঘাগরা খুলতে গিয়ে বাথরুমে ফ্লাশের শব্দ। সায়ন্তনি বেরিয়ে এল।

রূপশ্রী বার্নপুরে পাশের বাড়িতে থাকত। ফ্রক পরা ছোটবেলায় ওর সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলেছে। ব্যাডমিন্টন খেলেছে। সাঁতার শিখেছে। সাঁতার শেষে চেঞ্জিং রুমে মনোকিনি খুলে গা মোছার সময় রূপশ্রীর নীচের ঘন কালো চুলের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় শিউরে উঠত ট্যানিয়া। লাজুক মেয়ে। কখনও প্রকাশ করতে পারেনি। ওর সদ্য বাড়ন্ত বুকের ঔদ্ধত্য, গভীর অরণ্যের কী এক আকর্ষণ। নিজেকে ছাড়া, সেই প্রথম কোনও মেয়েকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেখা। অনুভূতিটা একেবারে অন্য। তখনও কোনও ছেলেকে নগ্ন দেখেনি। রূপশ্রীর বাড়ন্ত যৌবনে বুকের মধ্যে শিরশির। একটু ছোঁয়া ওই নরম তুলতুলে দেহটার উত্তাপের। নাঃ। পারেনি। একবারও রূপশ্রীকে বলতে পারেনি তার অনুভব। নারীদেহের মাদকতা, আকর্ষণের অনুভূতির শিহরণ সুপ্ত হলেও মুছে যায়নি।

“ডোন্ট ফিল লাইক গোইং হোম টুনাইট”

“স্টে ব্যাক”

ট্যানিয়ার সম্মতিতে সায়ন্তনি খাটে গা এলিয়ে দিল। বুক থেকে আঁচলটা সরে গেছে। ট্যানিয়া ওর বুকের দিকে তাকিয়ে, ঘাগড়া-চোলি খুলে ওয়ার্ডরোবে রাখল। হাইল্যান্ড পার্কের একাকী জীবনে অভ্যাসবসত প্যান্টি-ব্রা পরে বাথরুমে। সায়ন্তনি তাকিয়ে ট্যানিয়ার নিতম্বে। ছন্দ তুলে বাথরুমের দরজার আড়ালে। বুকে হিল্লোল।

নিতম্বের আমন্ত্রণ প্রথম অনুভব করেছিল সেদিনের অর্গিতে। তারপর থেকে বারবার আকর্ষণ করছে সায়ন্তনিকে। নরম ফর্সা নিতম্বের ছোঁয়ায় মাদকতা। নিজের কালো নিতম্বের চেহারা মনে হতেই হেসে ফেলল। পাছাকে সুদৃঢ় আকর্ষণীয় করার জন্য কী না করেছে। জিম, এক্সারসাইজ, ফিগার হাগিং ড্রেস। এমনকি প্লাস্টিক সার্জেনও। বাটক অগমেন্টেশনের জন্য। পাছা যে বুকের থেকে কম সুন্দর নয় বুঝতে সময় লেগেছিল কিছুদিন। চেহারা যাই হোক না কেন, বক্ষ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করেনি ঈশ্বর। শুধু পশ্চাৎদেশের আকর্ষণ যদি বুকের মতো আরেকটু পরিপূর্ণ করতে পারত, মায়ের থেকে পাওয়া কেলে চেহারাটাকে অত নিকৃষ্ট মনে হত না।

বাথরুম থেকে ওভাবেই ট্যানিয়া বেরিয়ে বলল "দিস মনোময় ইজ এ বাস্টার্ড। মেয়েছেলে দেখলেই ছুকছুক করতে থাকে। বউ আছে। শুনেছি দেখতেও খারাপ নয়। তবু খিদে মেটে না। এই জন্যই সিনেমা সিরিয়ালে যাইনি"

কিছুক্ষণ আগের প্রশ্নের উত্তর। ভয় হল। ঠিক পথে এগোচ্ছে তো? ট্যানিয়া না আবার বেঁকে বসে। বসলেও কিছু আসে যায় না। কেউ তো জানবে না। বড় ধাক্কা খাবে।

"ফোকটে পেয়ে যাচ্ছে, আপত্তি হবে কেন? ট্যাবলয়েডে খবর ছাপাতে এরা যা কিছু করতে প্রস্তুত। দেখলে না মনোলীনা দিব্যি চলে গেল মনোময়ের সঙ্গে"

"হ্যাভ ইউ সিন হার ন্যুড? সি ইজ অল স্কিন অ্যান্ড বোনস্"

"কুডন্ট কেয়ার লেস। থ্যাঙ্ক গুডনেস ইউ আর নট"

ট্যানিয়া ক্লান্ত শরীরটা সায়ন্তনির পাশে এলিয়ে দিল। সারাদিনের ক্লান্তি। জাস্ট নিড টু রিল্যাক্স। সিলিংয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে। ভাবছে, না কি প্রত্যাশা করছে। সায়ন্তনি ওর উরুর ভেতরে আলতো করে হাত বোলাতে লাগল।

ট্যানিয়া ফিসফিস করে বলল "ইউ ফ্যান্সি মি এ লট, ডোন্ট ইউ?"

"হাউ ডিড ইউ গেস?"

জবাব না দিয়ে হাতটা ট্যানিয়ার বুকে। ধীরে ধীরে নামিয়ে ওর ছিপছিপে নাভিতে। আঙুল বোলাতে লাগল নাভির গভীরে। চিনচিন করে উঠল পেচ্ছাপের জায়গাটা। অদ্ভুত এক অনুভূতি। আগে টের পায়নি।

রূপশ্রীর দিকে যদি সাহস করে এগোতে পারত।

"উফঃ" শিউরে উঠল ট্যানিয়া। সঁপে দিল সায়ন্তনির হাতে। সায়ন্তনি খেলে চলেছে ওর তন্বী কোমরে। নাভি থেকে প্যান্টি। আবার ওপরে ব্রার আন্ডার স্ট্র্যাপে। আবার নীচে প্যান্টির ইলাস্টিকে।

শরীর নিয়ে খেলা। বিভিন্নভাবে আগে কত খেলেছে সায়ন্তনি, নারীত্বকে আবিষ্কার করতে। সে তো অন্য খেলা। পুরুষের সঙ্গে। স্বার্থ নিয়ে। অন্যকে খুশি করতে, পাওয়ার আশায়। ভোগের জন্য নয়। কখনও যে তুষ্টি হয়নি, এমন নয়। সেটা উপরি পাওনা। প্রধান স্বার্থ।

সায়ন্তনি হাত ঢুকিয়ে দিল প্যান্টির মধ্যে। ঘন কালো চুলের জঙ্গল ভেদ করে ওপর অংশে হাত দিতেই শিউরে উঠল ট্যানিয়া। কতবার নিজেকে নিয়ে খেলেছে। কখনও তো এমন মনে হয়নি। এ যেন অন্যরকম। অন্য কাউকে কাছে পাওয়া। নিবিড়ভাবে অনুভব করা। আবেগে কেঁপে উঠল। সায়ন্তনির দিকে ফিরে চুমু খেল। প্রথমে আস্তে, পরে গভীর আবেগে। কেঁপে উঠেছিল সায়ন্তনি। নারীর চুম্বনে অন্য স্পর্শ। যা পুরুষের ঠোঁটে অনুভব করেনি। সে অন্য বন্যতা। অর্গিতে নেই। কেবল নিভৃতে একাকী।

ভালোবাসার অনেক রূপ। এ পর্যন্ত ট্যানিয়া শুধু নারী পুরুষের ভালোবাসায় ওয়াকিবহাল। এখন অন্য আরেক আসক্তির। এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সামাজিক দৃষ্টির বাইরে নিভৃত অনুভূতির পরিতৃপ্তি। বাঁচার অচেনা স্বাদ।

সায়ন্তনি বলল "বিলিভ মি, ইট ওয়াজ অ্যান এক্সকুইজিট এক্সপিরিয়েন্স উইথ ট্যানিয়া। নাউ সি ইজ আনকনসাস। মাস্ট মেক এ মুভ"

সুলগ্নার মনে পড়ে গেল হোলি চাইল্ড স্কুলের কথা। তখন কতই বা বয়েস। যৌবন বিকশিত হচ্ছে স্বরের পরিবর্তনে, স্তনের পূর্ণতায়। রূপলাবণ্য নিজ সৌন্দর্যে বিকশিত। বুঝতে পারছিল অন্যদের চেয়ে সুন্দর। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও ফিরে ফিরে তাকায়। মাসিক শুরু হলেও তার তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেনি। অনুভব করছিল, দেহের নিত্যনতুন পরিবর্তন।

বাথরুম করে বেরোতে পথ আগলেছিল সহপাঠী স্বাতী "কোথায় যাচ্ছিস?"

"ক্লাসে...."

"একটু দাঁড়া" হট করে স্তনে হাত "তোর বুকটা কী সুন্দর। আমার যদি তোর মতো হত"

ভয়, লজ্জায় কুঁকড়ে উঠেছিল। ছিঃ ছিঃ। এ কী করছে স্বাতী। ফ্রকের ওপর দিয়ে সুডৌল স্তনে চাপ। কেঁপে উঠেছিল সুলগ্নার শরীর অনাবিষ্কৃত অনুভূতিতে। এক ঝটকায় স্বাতীর হাত ঠেলে পালিয়ে বেঁচেছিল। এ কী করল স্বাতী! মধ্যবিত্ত মন। একদিকে সামাজিক প্রথানীতি, অন্যদিকে ক্ষণিকের ভালোলাগা।

কোনোটাকেই অস্বীকার করতে পারেনি। পরের কয়েকদিন সব কিছু ওলটপালট। মুহূর্তের ছোঁয়া, প্রথম, তার স্তনভাণ্ডে অন্য কারও পরিক্রমা। অন্য হাতের স্পর্শ। ভালোলাগায় কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর।

তাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেলাতে পারেনি। সামাজিক সংস্কার ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে চেপে দিয়েছিল বাড়ন্ত যৌবনের সুপ্ত বাসনাকে। ফিরেও তাকায়নি স্বাতীর ইঙ্গিতে। ধামা-চাপা পড়লেও, অবচেতনে থেকে গেছে। সায়ন্তনির ইঙ্গিতে মাথাচাড়া দিয়েছে। তখন ছিল নাবালিকা। এখন গৃহবধূ। অনেক পরিবর্তন এ ক'বছরে। পরিবর্তন হয়নি অন্তরের কামনার। সামাজিক নাগপাশের বেড়াজাল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধুয়ে ফেলতে চাইছে প্রথাগত সংস্কার। ভেতরের অপ্রাপ্তি প্রকট। 'এক্সকুইজিট এক্সপিরিয়েন্স' কী সেই এক্সপিরিয়েন্স, যার স্বাদ অপূর্ণ সুলগ্নার জীবনে?

সায়ন্তনি উঠে পড়ল। ট্যানিয়ার কাছে যেতে হবে। কেন অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে? সি মাস্ট বি দেয়ার উইথ হার।

সায়ন্তনি চলে গেল। রেখে গেল নতুন দুনিয়ার ঝংকার। সুলগ্না অনুভব করছে নতুন টান, নতুন ভালোবাসার অনুভূতি। ছেলেমেয়ের ভালোবাসার রূপ সে অনির্বাণের মধ্যে দেখেছে। এখন দিক পরিবর্তনের সময়। শুধু দেহের? যে ভাবে উঠে গেল, মনে তো হয় না শুধুই দৈহিক। খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর। সেই পরশ কী সায়ন্তনির মধ্যে? একবার চেখে দেখলে কেমন হয়? মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে।

গাড়ি না থাকলেও শান্তি।

উদ্দামতা না থাকলেও জীবন।

ভোগ না থাকলেও সুখ ছিল।

অনির্বাণের দুনিয়ায় এসে সব গোলমাল। জানে না কোথায় দাঁড়িয়ে। যদি ছুটতে হয় ছুটবে। পরখ করতে হবে মাদকতার রহস্য। কীসের মোহে মা অনির্বাণের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল? কিছু তো আছে এই দুনিয়ায়। যা অজানা। কিংবা চেখে দেখা হয়নি।

থাকব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে ।

তাকে দেখার আবেগে আকর্ষণ বাড়ছে। কাছ থেকে রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দ আস্বাদন করে দেখবে। না-পাওয়াটা এবার ভোগের সময়। এই ভোগের মধ্যেই জীবনের সার। সায়ন্তনি সেই ভোগের প্রথম পদক্ষেপ।

আট

দেবজিৎ রুমাকে বলল "ফিরতে রাত হবে। না-ও খেতে পারি"

বিছানার চাদর ঠিক করতে করতে রুমা বলল "আজ তো টিঙ্কুর কলেজের ফাংশন। তুমি যাবে না?"

"নাঃ, আমার যাওয়া হবে না। মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং। তারপর আইটিসি সোনার বাংলায় ডিনার। একাই চলে যেও। টাইম করতে পারলে তোমাদের জয়েন করব"

রুমা কথা বাড়াল না। স্কুলের কাজ শেষ করে, কীভাবে যাবে ছক করায় মনোযোগ দিল। দেবজিতের ওপর ভরসা বাতুলতা। যা করেছে, নিজেই। দেবজিৎ তার কোনও কাজে বাধা দেয় না। পারলে সাহায্য করে।

যে সময় দেবজিতের চাকরি ছিল না, রুমার প্রথম মিসক্যারেজ। ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। স্কুলের কাজ শেষে বাসে ঝুলে বাড়ি ফিরে কিছুই করতে মন চাইত না। দেবজিৎ তখন শুধু ঘরের কাজ নয়, চায়ের পেয়ালাটাও এগিয়ে দিত। গাড়ি ছিল না। ওইটুকুই মনে হত কতখানি। কাজটা যে আছিলা, ওর থেকে ভালো কেউ জানে না। যা বল করে দেবে। প্রতিবাদ নেই। সাংসারিক দায়িত্বে কোনও 'কিন্তু' নেই।

সেবার টিঙ্কুর জ্বর। হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। রুমা স্কুল থেকে ছুটি না পেলেও, সব কাজ ফেলে দেবজিৎ টিঙ্কুর বিছানার পাশে দিনরাত। রুমা যে কাজের চাপে ওকে সাহায্য করতে পারছে না, কোনও আক্ষেপ নেই। বাবা হিসেবে কর্তব্যের চেয়েও বেশি করে। রুমার অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব তার।

অদ্ভুত মানুষ এই দেবজিৎ। মচকায়, তবু ভাঙে না। চাকরি নিয়ে কতবার টাল-মাটাল। একটুও বিব্রত দেখেনি। শুধু একবারই ভেঙে পড়তে দেখেছিল, যখন দ্বিতীয়বার রুমার মিসক্যারেজ হল। ওদের স্বপ্ন চুরমার। সারাদিন মনমরা। কোনও কথা নেই। তারপর সিরোদকার অপারেশন। হাসি ফিরিয়ে আনল। টিঙ্কুকে নিয়ে স্বপ্ন।

পুজোয় নিজে রুমার জন্য শাড়ি কিনে বিছানায় বিছিয়ে বলবে "দেখ, পছন্দ হয়েছে কি না"

লক্ষ করেছে দুজনের পছন্দের মিল। একবার পরীক্ষার জন্য বলেছিল "অতটা ভালো লাগছে না"

ব্যাস। হয়ে গেল। রাতেই গাড়ি ড্রাইভ করে প্রিয়গোপাল বিষয়ীতে। দ্বিতীয়বার আর সাহস করেনি পরীক্ষা করতে।

দেবজিৎ বলেছিল "তোমায় কষ্ট করে রাত-বেরাতে বার করে এনেছি। বোনাস আরেকটা শাড়ি নিতে হবে। আমার পছন্দটাও থাক। তোমারটাও"

রুমাকে খুশি করাটাই ওর মকসদ। খুশি করা নয়, ওর যাতে মনে না হয়, বাড়ির প্রতি অবহেলা করছে।

সাধারণ ছাপা শাড়ি পরে। মহাকরণের বড়কর্তার বউয়ের শাড়িতে খুব আগ্রহ নেই। বিষ্ণুপুরে গেলে শখ করে দু-চারটে বালুচরি স্বর্ণচুরি। দক্ষিণ ভারতে গিয়েও কয়েকটা কাঞ্জিভারাম কিনে ফেলেছিল। স্কুলের মাস্টারনি। কোথায় বা শাড়ি পরবে? স্কুলে তো পটের বিবি সেজে যাওয়া যায় না। হেড মিস্ট্রেস বলে কথা। আড়ালে সবাই টিপ্পনি কাটবে বুড়ো বয়েসে ভীমরতি। যেটুকু সাজগোজ দেবজিতের সঙ্গে পার্টিতে। কোনও উৎসবে গেলে। প্রকারান্তরে সেগুলো নেহাত কম নয়।

দেবজিৎ বেরিয়ে যেতেই ঘরের কাজে মন দিল। সারাদিন স্কুলের খাটাখাটনির পর, বাড়ির কাজ ভালো লাগে না। তাই এমন একটা ছুটির দিনের জন্য অনেক কাজ পড়ে থাকে। সেগুলো সেরে ফেলতে হবে। জামা-কাপড় স্তুপাকার। বাথরুম কদ্দিন পরিষ্কার হয়নি। বেডসিটগুলো ওয়াশিং মেশিনে দিতে হবে। ক্ষেমতির মা কিচেনটাও ঠিকভাবে পরিষ্কার করেনি। কত কাজ বাকি।

দেবজিৎ বাড়িতে থেকেও নেই। না ডাকলে কোনও মাথাব্যথা নেই। যা রুমা বলবে, তাই সই। বাজার করতে বললে সারাদিন খাটাখাটনির পরেও ড্রাইভ করে বাজারে। ২৪ ঘণ্টা আর্দালি আছে। তাকেও পাঠাতে পারে। তা নয়। নিজে গুছিয়ে বাজার করবে। রুমাই বাড়ির কর্ত্রী। বাড়ি কীভাবে চলবে সেটা রুমার মতামতে। মতামত চাইলে দেবে। না চাইলেও আপত্তি নেই। কোনও জিনিস কেনার দরকার হলে, ওকে বললে বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করবে।

জীবনটা কত বদলে গেছে। যখন ওরা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত, এত চিন্তাভাবনা ছিল না। কলেজের কথা মনে পড়লেই হাসি পায়। তখন দেবজিৎকে চিনত না। ফ্রেসারস ওয়েলকামে কলেজ নেতা দেবিজৎকে কিছু বলার অনুরোধ করেছিল। বটানি বিভাগের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে, দেবজিৎ মাইকে শুরু করল "আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা। এখানে এসেছ বটানি পড়তে। বটানি গাছের সার তত্ত্ব। এই গাছের তত্ত্বর সঙ্গে জীবনের তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।গাছেদের স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স যেমন সত্যি, তেমনি মানুষের স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্সও। ডারউইনের থিওরির ওপরই চলে। সার্ভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট"

বাকি লেকচার বটানি থেকে জীবন দর্শনে। অবাক লেগেছিল রুমার। হাসিও পেয়েছিল। লোকটা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যেতে পারে। দেবজিতের বাকচাতুর্য লজিক্যাল কনক্লুশনকে অস্বীকার করতে পারেনি রুমা। পূর্ণশ্রী মজুমদার। রাতে ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই ভালো লেগেছিল দেবজিৎকে। প্রথম যৌবনের ভালোলাগা কোন দিন ভালোবাসায় পরিণত বুঝতে পারেনি।

ফোনটা বেজে উঠতেই "হ্যালো"

"সীমা"

“কেমন আছিস? কদ্দিন ফোন করিসনি”

“ব্যস্ত ছিলাম। বেশ কয়েকটা ফাংশান নিয়ে হিল্লি-দিল্লি”

“বেশ রোজগার হল”

“নেহাত খারাপ হয়নি”

“সিডি বার করছিস?”

“এখন নয়, পুজোতে। এখনও জয়ন্তর সুরগুলো ঠিক করা হয়নি”

“কে গান লিখেছে?”

“মৈনাক। দারুণ ভালো লেখে রে। একটা গান লিখেছে। ফ্যান্টাস্টিক। সাহিত্যিক। আজকালের গান গাই বটে। যদিও ভাষাটা মেনে নিতে পারি না। লেখায় যদি সাহিত্য না থাকে, তবে কীসের লেখা?”

“সাহিত্যের ভাষা অনেক পাল্টে গেছে”

“যা ভালো লাগে তাই সাহিত্য। তুম আওগে সান্ডে, খিলায়েঙ্গে আন্ডে। ছন্দ থাকলেও এতে কী সাহিত্য বুঝি না”

সীমার কথায় হেসে ফেলল। গানের ভাষার অনেক অবনতি হয়েছে, স্বর্ণযুগ থেকে। ওরা নাকি স্বপ্ন দেখত, বাস্তব থেকে দূরে। এখন জীবনধর্মী লেখা। জীবনধর্মীরা ফাংশনে স্বর্ণযুগের গান 'নতুনভাবে' রিমিক্স গাইছে। আগে এদের বলা হত কিশোর-কণ্ঠী, রফি-কণ্ঠী। এখন তারা শিল্পী। ‘কণ্ঠী’ আর ‘শিল্পী'র তফাত বোঝে না। বাস্তববাদী হয়েও জনপ্রিয়তা নেই। রিয়্যালিটি শো-তে এখনও সে যুগের গান। জীবনমুখী গান কী মরণমুখী?

সীমা বিশ্বাস করে না সংস্কৃতি নিম্নগামী। অনেক প্রতিভা একটু সুযোগের অপেক্ষায়। ভালোই জানে, সুযোগটা প্রতিভা-কেন্দ্রিক নয়। নেট-ওয়ার্কিং স্ট্র্যাটিজি। নইলে নিজের টাকায় সিডি। নিজেই প্রচার কর। কম্প্যানির ব্যানারে। সংগীত অ্যাকাডেমি থেকে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিল। বিভাগে প্রথমও। কোনও ব্রেক আসছিল না। লাইনে মামা-কাকার জোর না থাকলে প্রতিষ্ঠা সহজ নয়।

প্রেসিডেন্সিতে থাকাকালীন গানের শখ। রুমা যখন দেবজিতের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে, সীমার তানপুরায় কণ্ঠস্বরের সাধনা। সুর আছে, গান আছে, সাধনা আছে। ওর মধ্যে জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা। অন্য এক দিক থাকতে পারে, ভাবতেও পারেনি, চায়ওনি। সংগীত অ্যাকাডেমির পর সব দরজা বন্ধ। কোনও সুযোগ লাগছে না। হঠাৎ অনুভব করল, সে বড় একা। চারিদিকে শূন্যতা। সাধনা আর পড়ার বাইরে যে পৃথিবী আছে, আগে অনুভব করেনি। মানুষেরও প্রয়োজন।

ঠিক সেই সময় ধূমকেতুর মতো জীবনে এল প্রখ্যাত সুরকার অভিষেক সরকারের ছেলে জয়ন্ত। বাবার ছন্নছাড়া রেশ সাধছিল নিজ ঢঙে। নামী বাপের ছেলে। সেভাবেই চিনত। নিজস্বতা তখনও তৈরি করতে পারেনি। অ্যাকাডেমির সিঁড়িতে সৌম্য লম্বা বছর তিরিশের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ, একদিন এগিয়ে বলল "আপনার গলাটা দারুণ"

তুমি কে হে বাবা? কলেজ জীবনে আলাপের চেষ্টা বা টিপ্পনি যে শুনতে হয়নি, সীমা অতটা খারাপ দেখতে নয়। গানের দুনিয়ায়, এই প্রথম। যেচে আলাপ করছে। ভেতরে রোমাঞ্চ। তাকিয়ে চোখ নামাল।

"আপনি?" নির্লিপ্ত প্রশ্ন।

"অধমের নাম জয়ন্ত সরকার। শুনলেই বোঝা যায় আপনার সাধনা করা গলা"

কলেজ জীবনে প্রেমে পড়েনি। অত সহজে মজবার নয়। হেসে বলল "আমার গান কোথায় শুনলেন?"

"বহুবার। অ্যাকাডেমির ফাংশানে। আমি সুরকার হওয়ার চেষ্টা করছি"

হওয়ার চেষ্টা করছে, হয়নি। নামী কেউ হলে বাজিয়ে দেখত, যদি ভাগ্যের চাকা ঘোরে। ও তো তার মতোই স্ট্রাগলিং। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে নিজের ক্যাসেট নিয়ে অনুরাগ মিউসিকে ধরনা দিলে কাজ হতে পারে।

"বেশ" বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ও পথ আগ বলল "এমনি-এমনি আলাপ করিনি। কয়েকটা গানের সুর দিয়েছি। বাজারে ছাড়ার মতো নতুন গলা খুঁজছিলাম। আপনি গাইলে দুজনের ভাগ্যই খুলে যেতে পারে"

শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর জড়িয়ে তাকাল। আপাদমস্তক দেখল জয়ন্ত সরকারকে। সুপুরুষ না হলেও নেহাত খারাপ দেখতে নয়। ছিপছপে, পরিচ্ছন্ন দাড়ি কামানো, মনকাড়া মিষ্টি হাসি। হাল্কা সেন্টের গন্ধ। শৌখিনও বটে।

আকর্ষণ অনুভব করছে। নতুন সুরের লোভে ঝুঁকি নিতে। অবধূত-এর দিকে ফিরে বলল "চলুন তাহলে কোথাও গিয়ে বসি"

আগে তো কারও প্রস্তাবে এভাবে সায় দেয়নি।

"দোকানে নয়। ওখানে চা, আড্ডা। ময়দানে"

ভিক্টোরিয়ার সামনের মাঠে হাঁটতে হাঁটতে বলল "কে গান লিখেছে?"

"ছোটবেলার বন্ধু, মৈনাক"

ঝালমুড়ি চিবতে চিবতে সীমা বলল "শোনা যাক আপনার সুর"

খোলা হাওয়ার বসন্ত বাতাসে ফাগুয়ার সুর। তার মূর্ছনা শুধু সংগীত দুনিয়ায়। ঝংকার তুলেছিল মনের নিভৃতেও।

কথায় বিদ্রোহী চিন্তাধারা। সুরে অভিনবত্ব। নতুন প্রেরণা। নতুন দিগন্ত। ভালো লেগেছিল ওর সুর। ভালোবেসে ফেলেছিল জয়ন্ত সরকারকে।

সীমাকে থামিয়ে রুমা বলল "ঘরের কাজ পড়ে। এখন রাখি রে। একদিন সময় করে চলে আসিস্ জয়ন্তকে নিয়ে" ফোনটা রেখে দিল রুমা।

মনে পড়ল প্রেসিডেন্সি দিনের কথা। ৫' ৩'' হলেও, সেই বয়সে দেখতে খারাপ ছিল না। সাদা-মাটা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। দেবজিৎ কলেজের ডাকসাইটে নেতা। উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম। ফিসিক্স হনার্স। মোহময় বক্তৃতা। কাঁপানো কণ্ঠস্বর। নতুন প্রাণে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান। দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন। কাঁচা রক্তে আগুন জ্বালাতে পারত। যা বলছে, সেটাই ঠিক। চে গুয়েভেরা থেকে ফিডেল কাস্ত্রো। মার্কসিজম থেকে সোশালিজম। আগামীর পথ। বিই কলেজের স্নাতক রুমার বাবা সরকারি চাকুরে। দু বোন রুমা আর উমার ছোট্ট সংসার। ছোট বোন উমা ওর মতো পড়াশোনায় ভালো ছিল না।

বাবা বলত "রুমাকে নিয়ে চিন্তা নেই। চিন্তা উমাকে নিয়ে। পড়াশোনায় রুমার মতো নয়। দেখতেও তেমন নয়। বিয়ে দেব কী করে?"

মা আপত্তি জানিয়ে বলত "উমা শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই"

উমা বাধ্য শান্ত মেয়ে। মায়ের বড় প্রিয়। ওকে নিয়ে ঝামেলা নেই। বাড়িতে আছে বোঝাই যেত না। নিঃশব্দে নিজের পৃথিবীতে। না বললেও ঘরের সব কাজ করে দেয়। চিন্তা রুমাকে নিয়ে। রগচটা মেজাজি। মনমতো না হলেই বাড়ি মাথায়। চিৎকার, চেঁচামেচি। সব কিছু মনের মতো চাই। দুটো জামা কেনা হলে, রুমার পছন্দ আগে। যেটা পড়ে থাকল, উমা তাতেই খুশি। যা রুমা পরবে না, উমা পরবে। যা রুমা নেবে না, উমা কখনও না বলবে না।

এ হেন মেয়ে কী করে দেবজিতের প্রেমে পড়ল, সেটাই আশ্চর্য।

গ্রীষ্মের দুপুর। প্রেসিডেন্সি জমজমাট। আধ-খোলা জামা, ঘেমো গায়ে ছেলেরা উদগ্রীব। কলেজ ইউনিয়ন ইলেকশন। কে জিতবে? স্লোগান চলছে। নেতারা কচিকাঁচা মেয়েদের দলের মাহাত্ম্য বোঝাতে ব্যাকুল। রুমা ভোট দিয়ে ফেলেছে। কোন পার্টি জিতবে জানে না। চায় দেবজিৎ জিতুক।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখল বিল্ডিংয়ের বাইরে হেয়ার স্কুলের মাঠে দেবজিৎ বসে। ওকে ঘিরে একদল। ওরা কী বলে যাচ্ছে। দেবজিৎ চুপ। বেকার বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ আওয়াজে ফিরে তাকাল। একদল গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে। চিৎকার, অকথ্য ভাষায় গালিগালজ করছে। একটা আওয়াজ ধুম। আবার একটা আওয়াজ, ধুম। কীসের বোঝার আগেই একটা দেহ তার ওপর ঝাঁপিয়ে। কে? ভয় শিউরে উঠল। একজন ওকে মাটিতে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায়, লোকটাকে ধাক্কা

দিয়ে নামাতেই তীব্র বিস্ফোরণ। আতঙ্কে আঁকড়ে ধরল তাকে। বাঁ কান ঝনঝন করছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত যেতেই লোকটি নিজেকে ছাড়িয়ে "উঠুন। আসুন আমার সঙ্গে"

ছুটল বেকার বিল্ডিংয়ের দিকে। জানা নেই কার হাত ধরে ছুটছে। বেকার বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লোকটা বলল "একটু হলেই পেটোটা আপনার গায়ে পড়ত"

ফিরে তাকাল। দেবজিৎ "শালারা, বাইরে থেকে দলবল নিয়ে ইলেকশন ভন্ডুল করতে এসেছে"

কাঁপা, ভয় মেশানো গলায় রুমা বলল "কারা?"

"বুঝবেন না। চুপচাপ এখানে দাঁড়ান। কোথাও যাবেন না। আমি আসছি" বলেই উধাও।

রুমা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। বুকটা ধক্ ধক্ করছে। আকস্মিক ঘটনার জন্য, না ওর দেহের স্পর্শ, জানে না। এর আগে কোনও পুরুষ এভাবে আঁকড়ায়নি। দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা ভুলে আলিঙ্গন শিহরণ জাগাচ্ছে। যা আগে পায়নি। ভালো লাগার নায়কের ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ "লাগেনি তো?"

"না না" রুমা কথা বলতে পারছে না।

"কাঁপছেন কেন? আমি তো আছি"

মুহূর্তে ভয়-ডর বিলীন। চিৎকার চেঁচামেচি গৌণ। দেবজিৎ আছে তো।

"এখানে থাকবেন না। বাড়ি চলে যান। বাইরের মস্তান ঢুকে পড়েছে। আরও গন্ডগোল হবে। একা যেতে পারবেন তো?" রুমাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল "কোথায় থাকেন?"

"বালিগঞ্জ গার্ডেনস"

"পেছনের গেট দিয়ে সেনট্রাল এভিনিউ হয়ে চলে যান। একা যেতে পারবেন?"

"ভয় করছে" ফিসফিস করে বলল রুমা।

"সেনট্রাল এভিনিউতে গিয়ে অপেক্ষা করুন" কী মনে হতে বলল "আপনাকে একা যেতে হবে না। আমি পৌঁছে দেব। একটু সময় লাগবে। কেমেস্ট্রি ল্যাবে বসুন। আমি আসছি। বাড়ি পৌঁছে দেব" সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে গেল।

সেই প্রথম আলাপ। বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। চলে যাওয়ার পর ছুঁয়ে গেছিল ওর হৃদয়। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে ছটফট। ভয়ে, না আবেগে, জানে না। তার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। হয়ত আগেই ছিল। ইলেকশনের পেটোবাজি ভেতরের ইচ্ছেটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বোঝেনি সেটা শেষমেশ ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াবে। তার রেশ আজও মোছেনি।

সেদিন মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেবজিতের মন নেচে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল ছুটে বেরিয়ে পড়ে অজানা আনন্দের খোঁজে। কালো মেঘে ঢাকা দিগন্তে হারিয়ে যেতে প্রকৃতির কাছাকাছি। আলিঙ্গন করে নিতে তার রূপ, রস, তাল, ছন্দ। নির্মল আনন্দ।

রুমা আপত্তি তুলেছিল "থাক। আজ বেরিয়ে কাজ নেই"

"বেরোবে না কেন? বৃষ্টিতে বেরতেই তো মজা" প্রতিবাদ করেনি। ওর ইচ্ছেকে অস্বীকার করতে পারে না।

শাড়িটাকে উঠিয়ে, ওর পাশে। গন্তব্য অজানা। অনেক আগে থেকেই বিদ্যুতের ঝিলিক। বেরতে না বেরতেই, মুষলধারে বৃষ্টি। কাচ বন্ধ করে বৃষ্টি থেকে রক্ষা। দেবজিৎ গাড়ি চালাচ্ছে। কোনদিকে ছুটছে খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পরে হুঁশ হল থিয়েটার রোড দিয়ে ভিকটোরিয়ার দিকে। জানলার ওপরটুকু ফাঁক করে বর্ষার ঘ্রাণ নিলো দেবজিৎ।

"কী করছ? ভেতরে জল আসছে"

"নয় একটু ভিজলাম। ক্ষতি কী?"

আর কিছু নয়। ভিজলে ঠান্ডা লাগতে পারে। এই বয়সে ঠান্ডা লাগলে বিড়ম্বনা। সেদিকে হুঁশ নেই। ভেজাতেই আনন্দ। শুধু প্রকৃতি নয়, রুমাকেও বর্ষণমুখর বিকেলে কাছে পাওয়া। ঝাপসা হওয়া উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টি দেখতে খারাপ লাগছিল না। গায়ে তো জল লাগছে না। ট্র্যাফিক জ্যামে শামুকের মতো গাড়ি এগোচ্ছে।

ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড় করিয়ে বলল "এস"

"কোথায়?" ওর পাগলামি দেখে, হেসে ফেলল।

"এস না"

দরজা খুলে বার করে এনেছিল বৃষ্টিতে। ছাতা ছাড়া জলে ভিজে যাচ্ছে, সে হুঁশ নেই। বাবু বাচ্চাদের মতো, রুমার হাত ধরে ভিজছেন। ঠান্ডা লেগে সর্দি হবে যে। কে কার কথা শোনে?

বলে উঠল "বৃষ্টিতে ভিজতে দারুণ লাগে" অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে গেয়ে উঠলঃ

এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে,

চলো চলে যাই তুমি আমি,

দুজনেতে মজা করি,

ভিজে আসি পাশাপাশি

আবাক রুমা! ও গাইতে পারে জানা ছিল না। নাই-বা মান্না দের মতো সুরেলা, অনুভূতিটা একটুও কম নয়। এখন সে, নীল-সাদা বাড়ির মুখ্য আমলা নয়। কলেজের নবীন তরুণ। দয়িতার হাত ধরে প্রকৃতির কোলে। ফিরে গেছে, প্রেসিডেন্সির দিনগুলোতে। ভেজার মধ্যেই আবার কাছে পেয়েছিল ওকে। এখানে

আর্দালি নেই, অবিরাম ফোনের উৎপাত নেই, সামাজিক তকমা নেই। শুধু নির্মল মন। পবিত্র বন্ধন। উদাসী বাউলের হৃদয়ের স্পন্দন। সুরটা ভেতরেই ঘুমিয়ে ছিল। ও শুধু ছন্দ আঁকছে গভীরের স্পন্দনে। যে ছন্দ আবেগে জড়ায় মনের মানুষকে। যুগলবন্দিতে নতুন স্বপ্ন দেখে চাওয়ার ডালি ভরে। জীবন গড়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। কতক্ষণ ভিজেছিল, খেয়াল নেই। এক সময় বৃষ্টি ফিকে।

"এবার ফেরা যাক"

বাড়ি ফিরে দেখে টিঙ্কু ফেরেনি। দেবজিৎ ফোনে "কোথায়?"

"প্রেসিডেন্সির সামনে আটকে। ঠনঠনিয়ার এত জল। বাস আসছে না"

"সাবধানে এস" ফোনটা নামিয়ে দেখল, রুমা নেই। বসার শোবার ঘরেও নেই। উঁকি মারল বাথরুমে। শাড়ি ছেড়ে, বিবস্ত্র তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে। কদ্দিন ওকে দেখেনি এভাবে। কাজের চাপে তো অবকাশই হয় না। টিঙ্কু থাকলে প্রশ্নই ওঠে না। গা মুছে শাওয়ারে। খেয়াল করেনি, দেবজিৎ দেখছে। ওর-ও জামা ভিজে। জামা-প্যান্ট খুলে, জাঙ্গিয়া বালতিতে। রুমার দিকে এগোতেই সম্বিৎ হল, ও এগিয়ে আসছে।

"নাও, তোয়ালে দিয়ে গা টা মুছে নাও" তোয়ালেটা ছুড়ে দিল দেবজিতের দিকে। তোয়ালেটা টাওয়েল র‍্যাকে ঝুলিয়ে রুমার সঙ্গে শাওয়ারে। জাপটে ধরল "কী করছ? মেয়ে এসে পড়বে"

"অনেক দেরি। ও এখন প্রেসিডেন্সির গেটে"

কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে নিল। রুমা ওর ঊর্ধ্বমুখী উষ্ণতাকে পেটে অনুভব করছে। ভালো লাগছে নিবিড়, কোমল স্পর্শ। হারিয়ে গেছিল খিদেটা। ও হারানো যৌবন নিয়ে হাজির। শাওয়ারের জলে চুমু খেল। আবেগে কাঁপছে। মনে পড়ছে ফুলশয্যার কথা। ফুলের মখমলে বিছানায় শুয়ে, নিবিড় আলিঙ্গন। আজ মেঘমেদুর বর্ষামুখর সান্ধ্যায় ফিরিয়ে এনেছে বিগত দিনের হারানো রোমাঞ্চ।

রুমা ফিসফিস করে বলল "নাঃ... নাঃ... নাঃ" অস্পষ্ট গোঙানির নিঃশ্বাস মিলিয়ে গেল শাওয়ারের জলে। মন চাইছে, ও আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরুক। মুখে বলছে 'নাঃ... নাঃ... নাঃ"। সে শোনার হুঁশ নেই ওর। নিঃশব্দ কাম বাধা-বন্ধহীন। খেলে যাচ্ছে রুমার নাভির চারধারে। দুহাতে ওর নিতম্ব তুলে নিল। ভাসিয়ে দিল। শাওয়ারের জলের শব্দ ম্লান দীর্ঘশ্বাসে। আহঃ... আহঃ... আহঃ... হৃদস্পন্দন দ্রুত। অনুভূতির দোলায় ফেলে আসা মায়াপুরীর পথে। এখনও হারায়নি নবীনের গান, এখনও হারায়নি সুপ্ত প্রাণ। মধ্যগগনের মুহূর্তকে নিজের করার আহ্বান। প্রসিডেন্সির পেটোবাজির সময়, যে বুকে আগলে নিয়েছিল। তার জীবন সাথী, কাছের মানুষ, দেবজিৎ।

নয়

বিদিশা আর পেরে উঠছে না। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টেনে টেনে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। গাড়িতে বসে ভাবল বাইপাসের ২০ মিনিটের ড্রাইভ এক ঘণ্টাও হতে পারে।

বাইপাসের দু-ধারে মাল্টিস্টোরিডের স্বপ্ন বিক্রি করছে প্রোমোটাররা। প্যারালাল ইকনমি। চড়া দরে কালো টাকার আকাশচুম্বী কনক্রিট জঙ্গল। লোকে ছোট্ট খুপরি কিনে, বিলাসবহুল আসবাবে ইন্টিরিয়র সাজিয়ে, পার্থিব সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছে। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের গাড়ির বহরে ভরে যাচ্ছে পূর্ব কলকাতার একমাত্র লিংক রোড। টাউন প্ল্যানিংয়ের বালাই নেই। গাড়ির সংখ্যার সঙ্গে রাস্তার রেসিওর কোনও হিসেব নেই। তার ওপর নিত্য নতুন মল, শপিং কমপ্লেক্স। গজিয়ে উঠছে এই প্রশস্ত রাজপথের দু-ধারে। কলকাতার প্রগতি হচ্ছে। মল স্কাইস্ক্র্যাপার দেখে ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুরা ফিরে গিয়ে বলছে “দেয়ার হ্যাস বিন ট্রিমেন্ডাস প্রগ্রেস অফ কলকাতা”

মধ্যবিত্ত বাঙালি কলকাতায় বসবাস করতে পারছে না। শ্যামবাজার, বিডন স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোডের পুরনো বসত বাড়ি প্রোমোটারদের বিক্রি করে ঠাই নিচ্ছে মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, সোদপুর, বারুইপুর, রংপুরে। পুরনো বসতবাড়ির কলকাতা নতুন রূপে সাজছে। প্রগতির ছোট্ট কুঠরিতে। হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত, সংস্কৃতি। কাঁচা টাকার ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি হচ্ছে কলকাতা। নেহাত কম নয়।

বাবা যখন বৈষ্ণবঘাটাতে ফ্ল্যাট কিনেছিল, তখনো এদিকে এত যান চলাচল ছিল না “আমার জীবদ্দশায় না হলেও, তোদের সময় দেখবি এই পূর্ব কলকাতা রমরম করছে। কলকাতায় আর জায়গা নেই। কল্যাণীর উন্নতি হয়নি কমুনিকেশনের অভাবে। ইন্ডাস্ট্রিও হয়নি। বিধান রায়ের স্বপ্নের উপনগরী এখন অ্যান্টি-সোশালদের ঘাঁটি। এ পাশে হবে”

হয়েছেও। পরিণাম, ক্লান্ত দেহে গাড়িতে বসে ট্র্যাফিক জ্যামের মোকাবিলা।

সুবিমলের চলে যাওয়ার পরও এমনিভাবেই নিরঙ্কুশ স্তব্ধতায় হাঁকপাক করেছিল। ভালোবাসার রোমাঞ্চ বোঝার আগেই বেদনা। প্রথম জীবনে, প্রেম যে কী করে আসে জানে না। ছোটবেলার বন্ধু লিপিকার মেধাবী সুপুরুষ দাদা সুবিমল। ছোট্ট বিদিশার কাছ থেকে দেখা প্রথম পরপুরুষ। বাড়তি বয়স। এই বয়েসে আকর্ষণ হওয়া স্বভাবিক। বিদিশার বাড়ন্ত যৌবনের প্রতি ওর আকর্ষণ স্বাভাবিক।

মা বলেছিল “বড় হচ্ছিস। সাবধানে চলাফেরা করবি”

প্রথম যৌবনের এই আবেগকে সব মায়েরাই ভয় পায়। তাই বাড়ন্ত মেয়েদের আগলে রাখার প্রবণতা। বিদিশার মা সেই রক্ষণশীলতার প্রহরী। সুবিমল বলে নয়। যে কোনও পুরুষ ঘেঁষলেই সচেতন "ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটাকে যাতে কষ্ট না দেয়"

বিদিশার মনে হত, যেন ডেনিস গেবর বা ক্রিককে দেখছে। লেজার হলগ্রাম তখন থেকে ডবল হেলিক্স। বিদিশার পৃথিবী বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নোবেল লরিয়েটদের জীবনী পড়ে বৈজ্ঞানিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। তারা তো গল্পের মানুষ। বিদিশার কাছে তারা রক্ত-মাংসের নয়। সুবিমলকে দেখে মনে হত, কোনোদিন নোবেল প্রাইজ পেতে পারে। বিদিশার কাছে জলজ্যান্ত আদর্শ। ওর দৃপ্ত বুদ্ধির ছোঁয়া নাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে। মেধা আর সৌজন্যের সমন্বয়। চোখের তারায় চুম্বক। চোখ যেন মন, মগজের ভাষা বলে দেয়। তাকে নিয়ে যায় এক কল্পনার মায়ালোকে। চোখ বুজলেই জীবন্ত নোবেল লরিয়েট।

ও তার জীবনে কোথায় ছিল বোঝেনি। কোথাও ছোট্ট মনের একান্ত নিভৃতে। প্রথম প্রেম। অত সহজে ভুলবে কী করে? পরিণতি বেদনার হলেও।

পার্টিক্যাল ফিসিক্সের একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিল না। খাটের ওপর বসে লিপিকার মায়ের তৈরি ফুলকো লুচি পা দোলাতে দোলাতে গোগ্রাসে গিলছিল।

পাশের ঘর থেকে সুবিমল "মা খেতে দিলে না?"

মা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিয়েছিল "দাঁড়া। হাত বাঁধা। লুচি ভাজছি। একটু পরে দিচ্ছি"

লুচির প্লেট রান্নাঘরের বেসিনে নামিয়ে বলেছিল "মাসিমা, দিন না। আমি দিয়ে আসছি"

"ওই হাঁড়িতে কষা মাংস। প্লেট বার করে দিয়ে আয়। লিপিকা আসতে এত দেরি করছে কেন?"

বই সামনে সুবিমল জানলার বাইরে চেয়ে। সারি-সারি বাড়িগুলোর দিকে নয়। নিজের চিন্তায়। সাদা-লাল ফ্রকে বিদিশা খাবার এগিয়ে দিল "মাসিমা পাঠিয়েছে"

প্লেট নিয়ে বলেছিল "তুমি কেন? নিতাইয়ের মা কোথায়?"

"মাসিমা আমার হাতেই পাঠিয়ে দিলেন। আপত্তি থাকলে নিয়ে যাচ্ছি"

বাচাল মেয়ে কোথাকার। এনে ফেরত নিতে চায়। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। কষা মাংস লুচিটা চিবিয়ে বলল "আচ্ছা মেয়ে তো। খিদে পেয়েছে। উনি খাবার নিয়ে চলে যাচ্ছেন"

আপাদমস্তক মাপল ওকে। ছিপছিপে। সাদা-লাল ছোপ স্কার্ট-ব্লাউজ। লম্বা চুল বিনুনি করে বাঁধা। বুকটা বয়স আন্দাজে বেশি বড় "কী পড়তে ভালো লাগে?"

"ফিসিক্স" বিদিশা এক কোণে।

"কোন দিকটা?" লুচি মাংসের ঝোলে লেপটে।

“পার্টিক্যাল ফিসিক্স”

লিপিকা এখনও আসেনি। মাসিমার সঙ্গে গল্প না করে, সেই ফাঁকে ওর কাছ বুঝে নিতে পারে “এনার্জির বেসিক কনসেপ্টটা ঠিক বুঝতে পারি না”

লুচি চিবিয়ে বলেছিল “কী বুঝতে পারো না?”

“হাউ ইজ দ্য এনার্জি জেনারেটেড?”

“ইলেক্ট্রনগুলো স্টেডি স্টেটে আপ-স্পিন আর ডাউন-স্পিন হয়ে পেয়ারিং করে। একে বলে বোস বা কুপার পেয়ারস্। সত্যেন বোসের বোস-আইনস্টাইন থিওরি। বাইরের এনার্জিতে পেয়ারিং ভেঙে যায়। বেস স্টেট থেকে হায়ার এনার্জি লেভেলে। একটা স্পেহরিকাল স্টেডি স্টেট বা গোলাকার থেকে বেরিয়ে আসে। এটাকে বলে ফার্মি স্পিয়ার। এমিশনটাকে বলে ইলেক্ট্রন। লাইট হলে ফোটন বা আলোর রশ্মি। এই এমিশনের জন্য যে গ্যাপটা ক্রিয়েটড হয় সেটা পসিট্রন”

“স্পিনের ব্যাপারটা বুঝলাম না”

“না বোঝার কী আছে? পেয়ারিং ভেঙে এনার্জি এমিশন। লাইটের ব্যাপারটা ইনকমপ্লিট। লাইট শুধু ফোটন নয়, ইটজ দ্য প্রব্যাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং এ ফোটন ইন দ্য ক্লাউডেড ঝোন”

ভাসা ভাসা বুঝলেও বিদিশা মুগ্ধ ওর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে। তার প্রতি শ্রদ্ধা, কখন ভালোলাগা থেকে ভালোবাসায়।

সন্ধে নেমেছে। লেডি ফ্লোরেনসের বিস্তৃত কার পার্ক খাঁ খাঁ। গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে, হঠাৎ কতগুলো ছেলে অন্ধকার থেকে ভুঁই ফুঁড়ে উঠল “ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে কথা আছে”

এরা কারা? কী চায় এত রাতে নির্জন কারপার্কে?

কাচটা নামিয়ে বলল “বলুন”

“বার্ন পেশেন্টগুলো কেমন আছে?”

“আপনাদের তো বলেই দিয়েছি। তিন সপ্তাহ না গেলে বলতে পারব না”

“আমরা পেশেন্ট পার্টি। কেস হিস্ট্রি ফাইলের একটা কপি চাই”

“সেটার প্রোটকল আছে। আপনাদের উকিলকে হাসপাতাল কতৃপক্ষকে চিঠি দিতে বলবেন। প্রোটকল অনুযায়ী ওরাই কেস নোটসের ফোটোকপি পাঠিয়ে দেবে”

“অতশত প্রোটকল বুঝি না। কাল ফেরার সময় আপনার হাত থেকে কপিটা নেব। দেখতে চাই, আপনি উলটো-সিধা লিখেছেন কি না?”

প্রচ্ছন্ন হুমকি। ‘উলটো’ লিখে থাকলে, বিদিশার কপালে দুঃখ। সন্দেহটা ঠিক। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। ছোটবেলা থেকেই আঁচ করতে পারে। পরে দেখেছে তাই সত্যি। এদের ব্যাপারেও, সেরকমই অনুভূতি। এখন তা স্পষ্ট। আন্দাজ করেছে, পেশেন্টগুলো মারা যেতে পারে। পুলিস কেস হবে। তাই আগেভাগে ব্যবস্থা। না চাইলেও পরোক্ষভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। কী করবে, পরে ভাবা। এখন এদের থেকে পরিত্রাণ চাই “কাল সকালে, আপনাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে দেখা করবেন”

“ঠিক আছে”

কাচটা তুলে গাড়িতে স্টার্ট। কী করবে, রাতে ত্রিদিব নন্দীকে ফোন করে জেনে নেবে। এখন এখান থেকে পালাতে হবে। সাইন্স-সিটি থেকে গাড়ি আর নড়ছে না। উন্নত কলকাতা, দূরদর্শিতার অভাবে স্তব্ধ। তার সোপানে বিদিশার জীবনটাও, স্তব্ধ জনজীবনের মতো থেমে।

মা, ও না আসা পর্যন্ত, না খেয়ে বসে থাকে। কতবার বলেছে ওর জন্য অপেক্ষা না করতে। খাবার ঢেকে শুয়ে পড়তে। ডাক্তারির সময়ের বালাই নেই। মাইক্রোওয়েভে খাওয়ার গরম করে নিতে পারবে। কে কার কথা শোনে? মায়ের মন তো। নিজে হাতে রাতের খাবার বেড়ে দেওয়াতেই তৃপ্তি। টিভিতে খবর দেখবে যতক্ষণ না ফেরে। বিয়ে না করে, কাল হয়েছে। এখনও বাবা-মা ভাবে ওই সেই ছোট্ট বিদিশা। যাকে আগলানো প্রয়োজন। রিটায়ার করার পর যদি নাতির মুখ দেখতে পারত, কিছু নিয়ে থাকতে পারত। ছেলে বিদেশে এক বিদেশি জাহাজ কম্পানিতে চাকরি করে। মিডিলসেক্সে ভালো ফ্ল্যাট কিনেছে। মেমসাহেব বউ। এখন পুরো দস্তুর ব্রিটিশ। এখানকার সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। এখন ওয়েস্ট-এন্ড কালচারে দীক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, বাবা খুশি হত যদি বৌমা মেমসাহেব না হয়ে বাঙালি হত। অলিভিয়া মুখোপাধ্যায়, নিকোলাস মুখোপাধ্যায়কে তো বাংলা নিয়ে কিছু বলা যায় না। শুধু 'হোপ ইউ আর এনজয়িং ক্যালকাটা’ এর বাইরে বাবার কিছু বলার নেই।

সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে, নাইটি হাউস কোটে খাবার টেবলে “কেন আমার জন্য বসে থাক। আমার ফেরার কী কোনও টাইম আছে?”

“আমার আর কী কাজ” মা ভাত বেড়ে বলল “এত খাটা-খাটনিতে তোর চেহারাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে”

ভাতের সঙ্গে ডাল মেখে বলল “কোথায় রোগা? আমার মনে হয়, ওজন বেড়ে যাচ্ছে। খাওয়া কমাতে হবে”

“তোদের কী যে স্লিম হওয়ার ফ্যাশন, বুঝি না। আমাদের যুগে খাওয়াটা বড় অঙ্গ ছিল”

“তোমাদের যুগে খাওয়া নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি ছিল” কই-মাছের কাঁটা বেছে বলে চলল “বাবা কি টেলিফোন বিলটা জমা দিয়েছে?”

“দিয়েছে বোধহয়। সকালে তো বেরিয়েছিলেন। আর একটা মাছ দিই? তুই তো কই মাছ ভালোবাসিস্”

“না, আর না। রেখে দাও। কাল খাব”

মুখ ধুয়ে ঘরের ছোট্ট টিভি চালাতেই, ছ্যৎ করে উঠল বুকটা। কোনও রিপোর্টার, তিলজলার আগুনের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে গিয়ে জ্বালাময়ী তত্ত্ব পেয়েছে। ফলাও করে খবরে। আজকাল এতগুলো খবরের চ্যানেল ২৪ ঘণ্টার জন্য। সর্বক্ষণ, মশলা মেশানো খবর খুঁজছে। আরও মশলা মিশিয়ে পরিবেশন। যে যত রসালো খবর দিতে পারবে, তার তত হাই টিআরপি রেটিং। তত বিজ্ঞাপন। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, অবান্তর। খেলেই হল। পর্দায় আগরওয়ালকে জেরা করছে।

আগরওয়াল স্ক্রিনে “হাম তো কুছ নেহি জানতা থা। আগ লাগা। চার আদমি কা বার্ন হুয়া। উনহে তুরন্ত লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতাল মে ভর্তি কর দিয়া। অভি উধার হ্যায়”

“লোক বোল রহা আপহি আগ লাগায়া?” রিপোর্টারের চাঁচাছোলা প্রশ্ন।

“মেরা কম্পানি। ম্যায় কেও আগ লাগাউ?”

“বোল রহা থা, কম্পানি লস মে হ্যায়”

“তো কেয়া? ফ্যাক্টরি মে আদমি রহনে সে কোই আগ লাগাতা? ম্যায় ভি আদমি হুঁ”

“ফির আগ কিউ লাগা?”

“ম্যায় কেয়া জানু? জাননে, আগ কভি লগতা?”

“লোক কা কহনা হ্যায়, আপকা আদমি আগ লাগয়া”

“পাঁচ আদমি দশ বাত বোলে। হামারা কেয়া ফরক পড়তা?”

সিন কাট করে লোকাল ওসি-র ইন্টারভিউ “আমরা এ ব্যাপারে তদন্ত করছি। ওর ইনসিওরেন্সের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিচ্ছি”

ভয় করছে। কাল না আবার নিউজ চ্যানেল ওর ওপর চড়াও হয়। বিদিশা কথা বলবে না। ত্রিদিব নন্দীও এসব ব্যাপারে কথা বলা পছন্দ করে না। ইউসুয়ালি ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল সার্ভিস বা সিইও সমুদ্র গুপ্তই বলে। স্টেটমেন্টের ওপর লেডি ফ্লোরেন্সের সুনাম জড়িয়ে। ঠিক ভাবে হ্যান্ডেল করলে সুনাম। মানে, আরও ব্যবসা। কোন্ গণতান্ত্রিক নেতা কী বলেছে সেদিকে ঘুরে গেল। ওর ওসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেই। টিভি বন্ধ করে, শুয়ে পড়ল।

জীবনটাই ঝামেলা। পিছু ছাড়ে না। এই পেশেন্টগুলোর জন্য তো এক-তরফা চমকানি দিয়ে গেছে। যদি মিডিয়া পেছনে পড়ে, আরেক বিপদ। পান থেকে চুন খসলে, আগুন জ্বলতে কতক্ষণ? যেমন ছোট্ট মেয়ের বিদিশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুবিমল। চোখের ভাষায় তার আত্মপ্রকাশ। লিপিকার সঙ্গে আড্ডার সময়, নানান আছিলায় ঘরে। দৃষ্টিটা ওর দেহে। চোখ এড়ায়নি। সুপুরুষ তাকে দেখে আকর্ষিত। সে কথা ভেবে, সেই বয়সে কেমন রানি-রানি লাগত। ভালো লাগত ওর আকর্ষণ নিয়ে লুকোচুরি। উঠতি যৌবনের অহং।

দুপুরে লিপিকার কাছে একটা বই নিতে গেছিল। বেল বাজাতেই দরজায় সুবিমল "লিপিকা নেই?"

"এখনও ফেরেনি। এক্ষুনি এসে পড়বে। এস"

লিপিকার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে বলল "মাসিমা নেই?"

"না। মা-বাবা তারাপীঠে পুজো দিতে গেছে" ছিটকিনি আটকে ওর পেছন পেছন।

ঠিক বুঝতে পারেনি। লিপিকার ঘরে বসে বইগুলো ওল্টাবে ভাবছিল, যতক্ষণ না ফেরে। হঠাৎ, দু হাত, পেছন থেকে জাপটে ধরল বুক দুটো। চমকে উঠেছিল। ওর দেহের উষ্ণতা তার দেহে। কানের পাশে ঘনঘন শ্বাস। গালে গাল ঘষছে। ভালো লাগছিল এই প্রথম পুরুষের নিবিড় স্পর্শ। এত কাছ থেকে পাওয়া। চুম্বকের মতো আকর্ষণ। ভয় করছে। মন বলছে, না না এ করা ঠিক নয়। দেহ বলছে, উচিত-অনুচিতে কী আসে যায়? ভালো লাগছে তো করুক। ওর প্রশস্ত বুকটা পেছনে চেপে দলে-পিষে দিতে চাইছে।

তবুও প্রতিবাদের সুর "না... না... না সুবিমলদা"

আবেগে কাঁপছে। ভালো লাগার আবেগে। নতুন পাওয়ার আবেগে। যা আগে অনুভব করেনি। মাসিক অনেক আগেই শুরু হলেও, এই প্রথম অনুভব করল, সে কিশোরী থেকে যুবতীতে রূপান্তরিত।

সামনে এসে আঁকড়ে ধরেছিল। উষ্ণ আবেগ বিদিশার ঠোঁটে। ভয় হলেও, অস্বীকার করতে পারেনি। বুকটা ভয় মেশানো ভালো লাগায় কাঁপছে। বিদিশাকে ঠেলে দিয়েছিল লিপিকার খাটে। না... না... না... এটা হতে দেবে না। চুমু খাওয়া, ভালো লাগা অন্য। বাকিটা কখনই নয়। সুবিমল তাকে সম্পূর্ণ নারী করে দিয়েছে। তার মর্যাদা কেড়ে নিতে পারে না। এটা অন্যায়। ঘোরতর পাপ।

দু-হাতে সুবিলমকে ঠেলে বলল "না সুবিমলদা না। আর নয়। ফর হেভেন্স সেক লিভ মি অ্যালোন"

বাধা মানেনি সুবিমল। কী হতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও, ওকে সরিয়ে দেওয়ার আর ক্ষমতা ছিল না বিদিশার। ভয়ে-আতঙ্কে কেঁপে বলেছিল "না, না, না। স্টপ ইট সুবিমলদা"

বাধা মানেনি। দু-হাতে চেপে ফ্রক ওপরে। সাদা প্যান্টি নামিয়ে।

"না না না না সুবিমলদা। আই বেগ অফ ইউ। প্লিজ লিভ মি"

মানেনি। জোর করে ছিড়ে দিয়েছিল ওর নারীত্বের প্রথম বর্ম। ব্যথা লেগেছিল। রক্ত ঝরেছিল। কষ্ট পেয়েছিল। তাকে প্রতিকারের আর কোনও পথ পায়নি। ছোট্ট মনটার ভালোবাসাটাকে কে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে। কে যেন তার নারীত্ব নিয়ে, ছিনিমিনি খেলেছে।তার নরম মানুষটাকে, কে যেন পৌরুষ দিয়ে আঘাত করেছে।

লিপিকার জন্য অপেক্ষা করেনি। কাউকে বলতেও পারেনি। বাড়ি ফিরে, নিজের ঘরে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। এর নাম ভালোবাসা? কেন তাকে আবেগের বলি হতে হয়েছে? ভেতরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট একটা ঘটনা যে বড় ভাবে পৃথিবী নাড়িয়ে দিতে পারে, খুব ভালোভাবেই জানে।

তাই টিভির ছোট্ট খবরকে তুচ্ছ করে দেখছে না। বিছানায় এপাশ-থেকে ওপাশ ওলট-পালট। অস্থিরতায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

পান থেকে চুন খসলে, আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

দশ

হাসপাতালের বেডের পাশের চেয়ারে সায়ন্তনিকে দেখে ট্যানিয়ার শুকনো হাসি। বেডের একটা দিক ওঠানো। আধশোয়া। কোমর পর্যন্ত সাদা বেডসিট। মুখটা ফ্যাকাসে। হলুদ সিল্কের শাড়ি ঠিক করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সায়ন্তনি বলল "হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

ট্যানিয়া উদাসীন। জানলার বাইরে তাকিয়ে "ডোন্ট নো। কিছুই মনে করতে পারছি না"

"মানে? হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর ইউ বিকেম আনকনসাস?"

"অ্যাট এ পার্টি ইন ইওর রনিতস হাউস"

'ইওর' শব্দটায় অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। অন্য সময় প্রতিবাদ করত। এখন ঠাট্টাও শোভন নয়।

"তারপর?" ঠাওর করতে চাইছে সেদিন কী ঘটেছিল।

"ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ ওয়াইল্ড পার্টিস্"

ভেতরে একটা ব্যথা। রনিতের খেলা থামবে না। ওয়াইল্ড পার্টিতে বৈচিত্র্য খুঁজছে। ট্যানিয়াকে কেন? বুঝতে পারছে না। মনোলীনাকে নিয়ে দিব্যি খেলছিল। হঠাৎ ট্যানিয়া কোত্থেকে? দু-সপ্তাহ আগে ওর সঙ্গে দেখা মনোলীনার বাড়িতে। মনোলীনা এরকম পার্টি মাঝে-মধ্যে দেয়। সাধারণত ওর ফিল্মি দুনিয়ার লোকজনদের নিয়ে। যোগসাজসে আরও দু-পাঁচটা বিজনেস জুটে যায়। ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে গেলে পার্সোনাল র‍্যাপো রাখতেই হবে। পিআরও নেটওয়ার্কিংয়েই ব্যবসা। ভালোই জানে। যদিও রনিত সিরিয়ালে ছোটখাটো দু-একটা রোল করেছে, ওই দুনিয়ার পাকাপাকি অভিনেতা হিসেবে পরিচিত নয়। বয়স কম। বাবার অঢেল টাকা। মেয়ে পটানো জীবনের মূল লক্ষ্য। ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড থেকে ফিউ নাইটস পাসিং। ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ।

এক সময় সায়ন্তনি রনিতের কাছে সঁপে দিয়েছিল। এক সঙ্গে ঘোরা, সিনেমা দেখা। মাঝেমধ্যে দিঘা-শঙ্করপুর-মন্দারমণিপুর। সময়টা ভালোই কাটছিল।

ও দুষ্টু-মিষ্টি হেসে বলত "ইউ আর এক্সিলেন্ট ইন বেড"

ভডকাতে চুমুক। অভ্যাসবসে আঁচল ফেলে সায়ন্তনি "ইউ টু"

রনিতের মাধ্যমেই উপভোগ করেছিল কামসূত্রের কয়েকটা অধ্যায়। বাৎসায়ন মানুষকে যে রঙিন পদ্ধতি শিখিয়েছেন, প্রগতিশীল সমাজ আজও তার ওপর কোনও ফুটনোট অ্যাড করতে পারেনি। বাৎসায়নের শাস্ত্র ধরে নিভৃত অন্দরমহলে, অলিগলিতে, বেডরুম থেকে ড্রয়িং, পথে-ঘাটে-মাঠে-ময়দানে উপভোগ করেছে।

চাঁদমামা আকাশ থেকে আর হাতছানি দেয় না। হাত বাড়ালেই তাকে পাওয়া যায়। যে যৌবনের রং অরণি দেখাতে পারেনি, কালীশেখর আধুরা রেখে গেছে, তাকেই সম্পূর্ণ দেখিয়েছিল রনিত। প্রতিটা রাত, নতুন রাত। দেহের অনুভূতিগুলো নতুন করে অনুভব করা। ওর কালো দেহ তার প্লাবনে আলোকিত। অন্য উন্মাদনায়। অন্য পরিতৃপ্তিতে।

সায়ন্তনির দূরে সরে আসার পর, শুনেছে মনোলীনার সঙ্গে জড়িয়েছে। উন্মাদনা? না, রঙিন পর্দায় ঠাই? ছিপছিপে ৫'২" মনেলীনাকে সাজলে খুব খারাপ দেখায় না। পানের মতো মুখ, ছোট স্তনযুগল, সরু নিতম্ব, সারল্যে ভরপুর শিশুসুলভ। ওই দেহে যৌবনের কোথায় আকর্ষণ? তবুও রুজের প্রলেপে টিভিতে দেখে কেউ অচল মনে করে না। যাদবপুরের সেন্ট্রাল পার্কের মেয়ে, টিভিতে মুখ দেখিয়ে 'ছেলেব'! টিভি পেজ থ্রি কী সেলেব করে?

রণিতের কোমর জড়িয়ে বলেছিল "উই আর ইন লাভ"

আদৌ প্রেম কি না জানে না। ফিল্মি পার্টিতে প্রেমের অনেক কথা ওড়ে। যেন মুড়ি-মুরকির মতো রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক রাতের সম্ভোগও প্রেম। গালে গাল ঘষাও প্রেম। বুকের ওপর হাত বোলানোও প্রেম। নিত্য-নতুন ব্যঞ্জনা, বহিঃপ্রকাশ। সংজ্ঞা অজানা। নিজের মতো ব্যাখ্যা করার মধ্যে আপন আলোকে দেখা। চেনা জানা।

চাইলেই পাওয়া যায়।

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

চেনাজানা পরিধিতে নিয়ে আসা যায়।

নিজের সার্থকতা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। কিছুটা স্বস্তিও। রনিতকে শেষমেশ ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে।

মনোলীনাকে বলেছিল "বেস্ট অফ লাক" রনিতকেও "টু ইউ টু"

মনোলীনার পাছায় হাত। নাকটা কাছে। রনিত বলেছিল "সি ইজ বিউটিফুল। ইসন্ট সি?"

কারও দেহে বিউটি। কারও মুখে। কারও বা মধ্যেরাতের উন্মাদনায়। বিউটি খুঁজে না পেলে নিশিযাপন কেন? জবাব আশা করেনি। ওর আবেগে সুড়সুড়ি। সায়ন্তনির মুখে না থাকলেও, নিরাবরণ কামে বিউটি কম ছিল না। মনোলীনার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। মুচকি হেসে বলেছিল "এনজয় ইওরসেলফ্"

"দ্যাটস হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু"

দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনা। বুঝতে অসুবিধা হয়নি। মাথা গরম, গা রিরি করে উঠেছিল। সৌন্দর্য কম বয়েসের অহং! এক্স-রনিতকে জয়ের আনন্দ। অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। নিজেকে দামি করা।

ওর দিকে তির্যক “হোপ ইওর উইসেস আর ফুলফিল্ড”

বুঝতে পারেনি “হোয়াট উইস?”

এ না হলে সেলিব্রিটি। না জানলেও, কথা বলতে হবে। না বুঝলেও, অজ্ঞবিজ্ঞ দেখাতে হবে। মিডিয়া এদের বিক্রি করে কামাচ্ছে। হায় রে! ব্রিটিশদের কাছ থেকে যদি শিখত, কখন চুপ করতে হয়। চূড়ান্ত অজ্ঞতা নিয়েও দুনিয়ায় রাজত্ব করতে পারত। মনোলীনার চিন্তার সময় নেই। চিন্তা করলে সিনেমা সিরিয়ালে কেন? অন্যদের পাখিপড়া শিক্ষা পর্দায় ঠিক নামাতে পারেলেই সেলেব। ডিরেক্টরস চয়েস। ভাবতে গেলে, তিন সিফটে কামানো যাবে না। যাদের ভাবার, ভাবুক। ওর কামানোর। নাম করার। অন্যের মনোবাঞ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

“মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম। খেয়ে যেও কিন্তু”

সরে পড়ল। সায়ন্তনিকে ইনভিটেশন কেন? সে তো, ওদের দুনিয়ার নয়। কয়েকবার ক্লাবে পার্টিতে দেখা হয়েছে। তবে ওই পর্যন্ত। খুব পরিচিত নয়। তবুও ইনভাইট করে আমিত্ব ফলাও। কেউ ধান্দায়, কেউ সান্নিধ্যে, কেউ বা অহং প্রকাশে। সব কিছুতেই আমিত্ব। কালো, দেখতে ভালো না বলেই কি রূপের হাটে নিমন্ত্রণ? না কি, রনিতের এক্স বলে। দেখাতে চায়, ওর রাতের উত্তেজনা এখন তার কব্জায়। একা ঘুরতে লাগল। ওদের কথোপকথনে যোগ দেওয়া যাবে না। তার থেকে নতুন উদ্যম খোঁজা অনেক ভালো।

ঐত্রিলাও মিসফিট। স্বামীর সহচর হয়ে আসা। ও ভালোবাসে গান, সাহিত্য, কাব্য, প্রবাহমান সংস্কৃতি। এখানে তো সে সব নেই। সায়ন্তনির দিকে এগিয়ে বলল “আপনাকে চিনলাম না”

“সায়ন্তনি। সায়ন্তনি নাগ”

“ঐত্রিলা সেন। অভয় সেনের স্ত্রী”

ঠিক চিনতে পারেনি। কে অভয় সেন? তাকাতেই বুঝতে পেরে বলল “ওই যে ওখানে আমার স্বামী। সিরিয়াল করে। আপনি সিরিয়াল দেখেন?”

“খুব একটা দেখা হয় না। সময় পাই না”

বলল না, ও সব বুড়ো বা বউদের জন্য। ও বুড়োও নয়, বউও নয়। এরকম অগণিত অজ্ঞাত কলাকুশলী টিভির দৌলতে পরিচিতি পায়। কাগজে ছবি বেরোলে মনে করে সেলেব। ক্লাব-পার্টিতে আশা করে তাদের চিনবে। যেন সুচিত্রা সেন বা উত্তমকুমার। টিভিতে না এলে, ব্যাঙ্কে বা গভর্নমেন্ট অফিসে কেরানিগিরি করত। রূপালি পর্দার মতো ছোট পর্দাও এদের সেলেব তকমা দিয়েছে। এদের বাড়-বাড়ন্তে যোগ্যদের মানুষ ভুলতে বসেছে। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী সেলিব্রিটি নয়। ওদের চিন্তাধারার প্রকাশ থাক সীমাবদ্ধ জগতে। চ্যাট-শো অলোকিত করুক অর্ধ-শিক্ষিত সেলেব। তাদের অর্থহীন বক্তব্যের ফুলঝুরিতে হারাচ্ছে

আগামীর জ্ঞান প্রাপ্তি, চিন্তার ক্ষমতা। গোটা সামাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, মিডিয়ার তকমা দেওয়া সেলেবরা। এদের ও গুরুত্ব দেয়ে না।

ঐন্দ্রিলাকে বলল "বড্ড আওয়াজ। পাশের ঘরে চলুন" বেডরুমে রাজস্থানি বেডসিটে গা এলিয়ে জিজ্ঞেস করল "আপনি কী করেন?"

"বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সে সাধারণ নটা-পাঁচটার চাকরি। আপনি?"

"হাউসওয়াইফ। হাসব্যান্ড আইটিতে"

"মনোলীনাকে চিনলেন কী করে?"

"ক্লাব-পার্টিতে"

"আমরা দুজনেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির। যদিও ও আমার থেকে বড়"

মানে, প্রেম করে বিয়ে। ঐন্দ্রিলার পরনে মেরুন কটকি শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ। বছর তিরিশের বোধহয়। হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। উগ্র চটক নেই। সম্ভ্রান্ত কোমলতা। স্তন আর পাছার প্রাচুর্য মাঝারি দেহে হিল্লোল তুলছে। নিখুঁত দাঁতের সেটিং মধুবালাকে মনে করিয়ে দেয়। গ্ল্যামার ছাড়াই ডিগ্নিফায়েড।

ঐন্দ্রিলা বলল "আমার ভিড়ভাট্টা একদম ভালোলাগে না" মিষ্টি হাসি "কর্তা আসেনি?"

"ও পার্টি-টার্টি পছন্দ করে না। আপনি কী সব পার্টিতেই যান?"

"সব নয়। কিছু কিছু। বাড়িতে থেকেই বা কী করব?"

"ছেলে-মেয়ে নেই?"

"একটি মেয়ে, এখানে থাকে না। মাসির কাছে, আসানসোলে" ঐন্দ্রিলার কথায় দীর্ঘশ্বাস "আপনার ছেলে মেয়ে?"

"নেই। ঝাড়া হাত-পা"

আশ্চর্য! মেয়ে কাছেও নয়, বোর্ডিং স্কুলেও নয়। বুঝতে পারছে না। বিয়ের পরে দু-দুবার প্রেগনেন্ট হলেও অ্যাবরশন হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছিল সিরদকার অপারেশন করাতে। তৃতীয় প্রেগনেন্সিতে বেডরেস্ট। অত ধৈর্য নেই। বুকের দুধ খাওয়াতে স্তনমাধুর্যের হানি, রাজি নয়। বাচ্চা মানুষ করার মানসিকতাও নেই। বাচ্চা থাকলে, অরণির সঙ্গে বন্ধনটা নিবিড় হতে পারত। আর চেষ্টা করেনি। অরণি ক্রমশ দূর থেকে দূরতর। নাকি ও-ই সরে এসেছে। কে জানে?

ঐন্দ্রিলা বলল "কোথায় থাকেন?"

"রুবির উল্টোদিকে। আপনি?"

“বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলিতে। শহরের হইহট্টগোল ভালোলাগে না। নেহাত ওকে টালিগঞ্জে রোজ কাজে যেতে হয়, তাই। এখন আনোয়ার শাহ কানেক্টরটা হয়ে সুবিধে হয়েছে। নইলে রাজেরহাটে চলে যেতাম”

“মনোলীনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?”

“ওর থ্রু দিয়ে, যতটুকু” প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনোলীনাকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

“এমা, তোমাদের হাতে গ্লাস নেই। খাবার রেডি। যখন ইচ্ছে খেয়ে নিও”

বেরিয়ে যেতে সায়ন্তনি ওর দিকে তাকাল। কোথায় একটা আকর্ষণ অনুভব করছে। সাদামাটা, মোটামুটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী বাঙালি বউয়ের কোথায় চটক, না বুঝলেও। ট্যানিয়ার উগ্রতা নয়। কোথায় একটা কোমলতা, সম্পূর্ণতা।

“একদিন আসুন না আমার বাড়িতে” ঐত্রিলা চামড়ার ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে “টেক্সট করে দিচ্ছি। আসবেন কিন্তু”

এখন পর্যন্ত যাওয়া হয়েনি। ট্যানিয়ার খবর পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে।

ট্যানিয়াকে বলল “রনিত ইনভাইটেড ইউ। আই অ্যাম সারপ্রাইজড। ওয়াজ মনোলীনা দেয়ার?”

“আরেকটা মেয়ে ছিল। মনোলীনাই বোধহয়”

মনোলীনার সঙ্গে ট্যানিয়ার আলাপ হলেও ওর আর রনিত সম্পর্কে এখনও জানে না। মানে রনিত, ওকে মনোলীনা সম্বন্ধে কিছু বলেনি। কী খেলা খেলছে? ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এর ডাকে দু-পা ফাঁক করেছিল। ভালোই হয়েছে। আগে থেকে সরে এসেছে। নইলে ফ্যাসাদে পড়ত। শুধু বড়লোক বাপের প্লেবয় ছেলে নয়। অন্য জিনিস।

সন্তর্পণে এড়িয়ে বলল “ফরগেট ইট। হাউ কাম, ইউ ল্যান্ডেড হিয়ার?”

ড্রয়ার থেকে পেপার ন্যাপকিন দিয়ে পিচুটি মুছে বলল “নো ক্লু। রনিত ইনভাইট করে। কোয়াইট এ ফিউ আদার্স। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে। মেয়েটি মনোলীনা নাম-ই বলেছিল”

আসানসোলের লরেটো কনভেন্টের ট্যানিয়া বরাবরই লাজুক, শান্ত। সুন্দর দেখতে ছিল বলে ছোটবেলায় কম জ্বালাতন সয়নি। ছেলেরা পেছন ছাড়তই না। বার্নপুরে থাকলে আর পাঁচটা গেরস্ত বউয়ের মতো হত, যদি না রূপশ্রী একদিন আনন্দবাজার নিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকত “মিস ক্যালকাটা কন্টেস্ট হচ্ছে। নাম দিয়ে দে”

“আমি?”

“কেন নয়? তুই আমাদের মধ্যে সব থেকে সুন্দর”

ইসকোর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের মেয়ে তাজ বেঙ্গলে কলকাতার বিউটি পেজেন্টে দাঁড়াবে, ভাবাই ভুল। দো-আঁশলা রক্ত বলেই সাহস পেয়েছিল। বাবা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার। মা আইরিশ। রক্তটা দো-আঁশলা হলেও মা ভারতীয় রীতিনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। ডিজিএমের বউ বার্নপুরের সমাজে মিশে গেছিল।

ইচ্ছে থাকলেও, সাহস পাচ্ছিল না। কলকাতা কত বড় শহর। কত রকমের লোকজন। সেখানে হারিয়ে যাবে। গিয়ে কাজ নেই। তার ছোট্ট দুনিয়ায় ঠিকই আছে। রূপশ্রী কিন্তু ছাড়েনি "নামটা দিয়ে দে। তারপর দেখা যাবে"

মা-বাবাকে না জানিয়ে, ভালো স্টুডিও থেকে ছবি তুলিয়ে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ভরে দিয়েছিল। সেটাই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ছোট্ট শহরের সুন্দরী মেয়ে হারাতে এল অজানা অচেনা এই দুনিয়ায়। পড়াশোনা ছেড়ে বিউটি কন্টেস্ট নিয়ে মাতামাতি।

মা আপত্তি জানিয়েছিল "হোয়াই লুজ ইওরসেলফ ইন দ্যাট বিগ ওয়ার্ল্ড?"

"মম্, আই অ্যাম নট লিভিং স্টাডিস। ইটজ জাস্ট এ পাস্টটাইম। আফটার অল্, আই অ্যাম নট ব্যাড লুকিং"

গররাজি থাকলেও, শেষমেশ সায় দিয়েছিল বাবা-মা। বার্নপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডিজিএমের মেয়ে, ছোট সংসার ছেড়ে পাঁচতারা জগতে। বাকিটা ইতিহাস। সানন্দা মিস্ তিলোত্তমা প্রতিযোগিতায়। জয়ের মুকুট। পরে মিস্ ক্যালকাটা। সেই সুবাদে দু-একটা মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট। ভবিতব্য এদিকেই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তারার আলোতে, মফসসলের শান্ত মেয়ে নতুন জীবনে। বৈচিত্র্যহীন বার্নপুরের কোম্পানি-ক্লাব থেকে আলাদা।

এখানে রঙের ফুলঝুরি।

আলোর রোশনাই।

জীবনের ঝংকার।

সার্থক হওয়ার মন্ত্র।

সব মিলিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি।

কমবয়সি ট্যানিয়ার ক্ষমতা ছিল না অস্বীকার করার। আগে এসবের এত রমরামা ছিল না। ভবিষ্যৎ মানে ভালো পড়াশোনা, ভালো কলেজ, ইউনির্ভাসিটি। পরে প্রফেশন্যাল লাইনে। এখন টিভি, কাগজের সাপ্লিমেন্টের দৌলতে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। পড়াশোনা করে কী হবে? সেই মাস মাইনের চাকরি। রিটায়ারমেন্টের পর অজ্ঞাত কেউ হয়ে কেওড়াতলায়। তার থেকে মাধুরী দীক্ষিত বা বিপাশা বসু হওয়া অনেক ভালো। অর্থ-নাম-যশ-প্রতিপত্তি পায়ের তলায়। দুনিয়া চিনবে।

যদি প্রশ্ন ওঠে ‘তবে কী আইনস্টাইনকে কেউ চিনত না?’ উত্তর আসবে, ‘সবাই তো আর আইনস্টাইন নয়।’ তিলোত্তমার পর বুঝিয়েছিল মাকে। বাবা আধুনিক ভাবাপন্ন। গ্রামীণ সাংস্কৃতিতে বড় হওয়া আইরিশ মা নিমরাজি থাকলেও, শেষমেশ মেনে নিয়েছিল বাবার চাপে। ব্রিটিশ সভ্যতায় বড় হওয়া, যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির কৃতী ছাত্র, বার্নপুরের ছোট শহরের চৌহিদ্দিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। অখ্যাত অজ্ঞাত জীবন কাটানোর মধ্যে এক ধরনের ব্যর্থতা। তাই সুন্দরী সুশীলা কন্যাকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দিতে মন চায়নি। ট্যানিয়া এই মেট্রোপলিসে বুঝতে পারেনি পরিমাপ। মেয়েকে হাইল্যান্ড পার্কে ফ্ল্যাট কিনে দিলেও, তার গতিবিধি সংযত করার মতো সেখানে কেউ ছিল না। মফসসল শহরে চেনাজানা বড় সাহেবের মেয়ে যৌবনের আবেগ সামলানোর অবকাশই পায়নি। অজ্ঞতার মধ্যেই নিভে যেত, যদি না কলকাতার নিঃশব্দ ঘরে একাকি নিজেকে আবিষ্কার করত।

“ঠিক বুঝতে পারছি তোমার কথাগুলো” হলুদ শাড়িটা বুকে জড়িয়ে সায়ন্তনি বলল “ইউ ওয়েন্ট টু এ পার্টি। হাউ কাম, ইউ ল্যান্ডেড অ্যাট রাজেরহাট?”

“ডোন্ট নো। দ্যাটস হোয়াট আই অ্যাম টোল্ড। হ্যাড এ ফিউড্রিঙ্কস্। মনোময় ওয়াজ বিসাইড” ট্যানিয়া উদাসীন।

“বাবাকে খবর দিয়েছ?”

“বাবা বিকেলে আসবে। বিল মেটাতে। অনেক হয়ে গেছে”

অঙ্কটা মিলছিল না। পুলিস প্রশ্ন করবে। রনিত বা মনোময় উত্তর দিতে পারবে। ও জড়াতে চায় না। রনিত মনোলীনা বুঝুক। ‘উই আর ইন লাভ্’ মনে হতেই ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গের হাসি। পুলিসের গাদানি খেলে লাভ ঘুচে যাবে।

তবুও কৌতূহল “ডিড ইউ হ্যাভ এনি ড্রগস্?”

“নট দ্যাট আই নো অফ। ওনলি এ কাপল্ অফড্রিঙ্কস্। নো ক্লু হোয়েদার এনিথিং ওয়াজ মিক্সড”

“কেউ হয়ত মিশিয়েছিল”

“হতেও পারে। মাস্ট কনফেস, হ্যাড ইরটিক ডিজায়ার আফটার দ্য ড্রিঙ্কস। ওয়ারিং...”

ভয়ে ওকে কুঁকড়াতে দেখে বলল “চিয়ার আপ। ইউ আর স্টিল অ্যালাইভ। গেট ওয়েল সুন। আফটার দ্যাট, উই উইল এনজয় আওয়ারসেলভস”

উঠে পড়ল। ট্যানিয়া অলরেডি বিচলিত। বাবা-মাকে কী জবাব দেবে? আর পাঁচজনকে? এরপর যদি খবরের কাগজে বেরোয় তাহলে তো কথাই নেই। এর পরেও বাবা কী কলকাতায় থাকতে দেবে? ভবিষ্যৎটা ধোঁয়াশা।

লবিতে সায়ন্তনি ঠিক করল ট্যানিয়াকে আলাদা করে ফেলতে।নইলে পুলিস তাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে। ভরা থাক অভিসারের দিনগুলো স্মৃতির ডালি হয়ে। ভবিষ্যতে টানলে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। সি হ্যাস টু এনজয় লাইফ। দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই।

সুলগ্না বলছিল ট্রাই করতে আপত্তি নেই। সুলগ্না তো মডেল বা স্টার নয়। ওর সঙ্গে জড়ালে চিন্তা-ভাবনা অনেক কম। ঐত্রিলাই বা খারাপ কী?

ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ।

তাকে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? তার মধ্যেই তো পরিপূর্ণতার ছন্দ। নতুন করে নতুন রূপে পাওয়া, ভালোবাসার আনন্দ। বেঁচে থাকুক তার নারী মন, বেঁচে থাকুক নতুন করে আস্বাদন করা আরেক যৌবন।

এগারো

শনিবারের সন্ধেয় আইটিসি সোনারের ব্যাঙ্কোয়েট হলে চাঁদের হাট। মন্ত্রী, আমলা, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, চিত্রপরিচালক, চিত্রতারকা, মিডিয়া - কে নেই। মদের ফোয়ারায় রঙের বাহারে শহরের এলিট-জমায়েত। শব্দ দূষণ ব্যাঙ্কোয়েট হলে। দেবজিৎ হুইস্কি হাতে এক কোণে। নামীদামিদের রঙ্গ-তামাশা দেখছিল।

লেবার ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি সুখময় চক্রবর্তী বলল "একা বসে যে। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি কোথায়?"

উদাসীন। কবিতা লিখতে, হুইস্কি খেতে ভালোবাসে। একটু আধটু গানও। শুনেছিল সিডি বার করবে। এখনও বেরোয়নি "বহু চামচার ভিড়। হাল্কা হলে মুখ দেখিয়ে আসব"

দেবজিতের পাশে রুমাকে দেখে বলল "কেমন আছেন বৌদি?"

"চলছে। শাঁওলিকে আনলে না?" তাকাল সুখময়ের দিকে।

"সামনে বিশ্বজিতের পরীক্ষা। ওকে নিয়ে বসেছে। আসতে চাইল না"

"ভালো আছে তো?"

"ওই আর কী। মাঝে কিছুদিন পেটের গন্ডগোলে ভুগছিল। ডাক্তার নিগমানন্দ কোনারকে দেখাবার পর ঠিক আছে"

"জলটাই যত সমস্যার মূল"

স্বর্ণচুড়ি কালো শাড়িটাতে বেশ দেখাচ্ছে। শাঁওলি কদ্দিন থেকে বলছে, বিষ্ণুপুরে থেকে কয়েকটা শাড়ি আনতে। কয়েকবার গেছে। কাজের চাপে মনেই থাকে না। দেবজিৎ এত কাজের ভিড়ে ঠিক সময় খুঁজে বার করে রুমার জন্য শাড়ি কেনার। ওকে দেখে নেগ্লিজেন্সটা চারা দিল। সত্যিই শাঁওলির ইচ্ছের দিকে ধ্যান দেয়নি "ভোকেশনল ট্রেনিংয়ের স্ট্রাকচারটা প্ল্যান করেছি। মন্ত্রীকে দেখাবার আগে, একবার তোমাকেও দেখিয়ে নেব"

"সামনের উইকে দিল্লিতে। পরের উইকে..."

জানে ভুলভালোগুলো শুধরে দেবে। ও দেখেছে জানলে মন্ত্রী কোনও উচ্চবাচ্য করবে না।

এই সময়টা রুমার ভীষণ বোরিং লাগে। ধুধোরিয়াকে ঘিরে ধান্দাবাজির খেলায় থাকতে পারবে না। সেলিব্রিটিদের যৌবনের মেলায় থাকার কোনও কারণ নেই। মন্ত্রীদের চামচার ভিড়ে ভদ্রতা ছাড়া বিশেষ কিছু

করার নেই। অগত্যা কলিগের অফিসের কচকচানি। এই জন্যই শাঁওলি আসেনি। ছেলের পরীক্ষা উপলক্ষ মাত্র।

দেবজিৎ বলল “আরেকটা ফ্রুট জুস এনে দিই?”

“নাঃ, আর খাব না”

সব-সময় যে আসতে ভালো লাগে, তা নয়। দেবজিৎ আশা করে, সামাজিক অনুষ্ঠানে রুমা পাশে থাকুক। কলেজ ইলেকশনের দিন থেকে শুরু। মালাবদল, কালাঙ্গুট বিচে হনিমুন। উডল্যান্ডসে সিজারিয়ান। টিঙ্কুর জন্ম থেকে বড় হওয়া। ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ। সবেতেই বৃত্তাকার জীবনের গত। বাঁচার আনন্দ। এই পরিধিতে শুরু থেকে শেষ জানা, খালি মধ্যের বৈচিত্র্যে যা একটু তফাত। তাতেই পাওয়ার আনন্দ। পেটোবাজির মধ্যের পুরুষ এখন অন্য রূপে। জীবনের ঢাল। ভুল মানুষের সঙ্গে গাটছাড়া বাঁধেনি।

তবুও মানুষটা অধরা। জানে না কোথায়। আজও খুঁজছে।

সেদিন রুমাকে বিনিদ্র ছেড়ে বাড়ি পৌঁছে হারিয়ে গেছিল। তিন রাত্রি ওকে ব্যথাভরা সুখে রেখে। দেবজিৎ শুধু ভালো স্টুডেন্ট নয়, দূর থেকে দেখার। স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট আজ্ঞা পালন করার। কোনও দূরের মানুষ নয়। মন চেয়েছিল ওকে জড়াতে জীবনে। বন্ধু-বান্ধব, গুণমুগ্ধ ভক্ত পরিবেষ্টিত একলা পাওয়াই দায়।

প্রেসিডেন্সির গেট থেকে শিথিল পায়ে একদিন হাঁটছিল বীণা সিনেমার দিকে। ১৬ নম্বর বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ। গলার শব্দে ফিরে তাকাল “বাড়ি যাচ্ছেন?” স্বপ্ন-জাগরণের মূর্তিমান দাঁড়িয়ে।

আমতা করে বলেছিল “হ্যাঁ”

“কত নম্বর বাসে যাবেন?”

“১৬”

“আমিও। চলুন, আজ আপনার সঙ্গেই দু-পা চলে নিই”

ভাবেনি, সেদিনের দু-পা চলা সারাজীবনের জন্য বেঁধে ফেলবে। একটু থেমে বলেছিল “আমাকেও কাঁকুলিয়া যেতে হবে। হিন্দু হস্টেলের খাবারে জিভটা বিস্বাদ। সুব্রতর বাড়িতে একসঙ্গে পড়ব। ওর মা দারুণ রাঁধেন। ভালোমন্দ হয়ে যাবে”

১৬ নম্বরের লেডিস সিটে রুমা। দেবজিৎ হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। কোনও কথা হয়নি। কাছ থেকে দু-চোখ ভরে দেখেছিল ওকে।

৫’৮” গৌরবর্ণ। গাঢ় নীল প্যান্ট। নীল চেক সাদা হাফশার্ট। সরু গোঁফ। পকেট ফুলে, বোধহয় সিগারেটের প্যাকেট।

গড়িয়াহাট মোড়ে ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলির সামনে নেমে বলেছিল “তাড়া আছে?”

“কেন বলুন তো?”

“না থাকলে, এক কাপ চা খাওয়াতাম”

“বেশ তো। কোথায়?”

গড়িয়াহাটার মোড় থেকে ডোভার লেনের দিকে সাদার্ন কেবিন। ঘুপচি ছোট্ট রেস্তরাঁয় ওরা দুজন। চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া। লোকের ভিড়ে সেদিনই প্রথম ওকে ভালো করে দেখেছিল দেবজিৎ। সব ছেলেরাই যেমন আড় চোখে দেখে। মেয়েরাও। অদ্ভুত কেমিস্ট্রি। বাসনাটা জন্মগত। সেদিনের চাওনির অন্য ভাষা।

“কখন এসেছিস? আজকে কিন্তু জয়ন্তকে নিয়ে এসেছি। সকালে বললি না তো তুই আসবি”

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সীমা এগিয়ে আসছে। দারুণ সেজেছে। আজ সব-ই লালে লাল। লাল-সাদা মটকা শাড়িতে উজ্জ্বল। লিপস্টিক, চুলটাও ম্যাচিং লাল ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। যে কোনও মেয়ে ভালো করে সাজলে, জৌলুস বাড়ে। আড় চোখে দেখল দেবজিৎ সুখময়ের কথোপকথন “ভালোই হয়েছে তুই এসেছিস। একা একা বোর হচ্ছিলাম”

রুমা পাশে বসে বলল “একা কোথায় রে। তোর কর্তা তো পাশে”

“ওই পর্যন্ত। দেখ না, এখানেও অফিস। জয়ন্ত কোথায়?”

সীমা আঙুল তুলে দেখাল “ওই তো নির্ভীক রায়ের সঙ্গে”

কোনও নতুন ফিল্মের মিউজিকের ব্যাপারে হবে। এই পার্টিগুলোতে এরকম কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। পরে কোনও এগোর ব্যাপার থাকে না। কে কাকে আগে ফোন করবে, দ্বন্দ্বের অবকাশ কম। রুমা চুপচাপ গিয়ে পার্টিতে বসে থাকে। মিশুকে হতে পারল না। যদি না, দেবজিৎ আলাপ করিয়ে দেয়। দেবজিৎ আবার উল্টো। মিশুকে। হাসি-ঠাট্টায় আপন করে নেয়। ম্যাগনেটের মতো লোককে আকৃষ্ট করে। এগোর ব্যাপার নেই। ওর পাশে ভিড়লেই সন্ধে ভরাট।

কিছু সিনেমা সিরিয়ালের হিরোইন নামীদের পাশে ঘুরঘুর করছে। বাকিরা ধুধোরিয়ার পিআরওদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার চেষ্টায়। এরকম মিক্সড্ পার্টিতে কনট্যাক্টস্ তৈরি করে যদি ফায়দা লোটা যায়।

ওদিকে তাকিয়ে সীমা বলল “আমাদের কলেজের জীবন থেকে কত আলাদা”

“এটা কোনও জীবন নাকি। দু-দিনের খেলা। ব্যাঙ্কয়েট থেকে বেরবার পর মনেও থাকবে না”

“ব্যবসাদারের সোশাল স্ট্যটাস্” ফিসফিস করে বলল।

রুমা হেসে বলল “তুই এতে না হারালেই ভালো। তোরা তো সেলিব্রিটি। ভয়টা তোদের নিয়ে। আমি মাস্টারনিই থাকব”

দেবজিৎ উঠে এসে বলল “কেমন আছ? জয়ন্তকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি এস”

“আমি তো যেদিন খুশি চলে যেতে পারি। তুমি আর থাকো কোথায়? হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ। একা একা তীর্থেও যাও। তোমার সময় কোথায়?”

“তীর্থের বয়স হয়নি। পীঠস্থান ঘুরে ছবি তুলতে ভালোবাসি। নিজেকে খোঁজার চেষ্টায়। রুমার স্কুল, টিঙ্কুর কলেজ। সব সময় ওদের সম্ভব হয় না”

“জয়ন্ত যদি তোমার মতো হত। কাজের বাইরে ঘর ছেড়ে বেরোতেই চায় না। তোমার গত বছরের তোলা ছবিগুলো কম্পিউটারে ওয়াল পেপার করে রেখেছি। আরও কিছু দিও”

“নিশ্চয়ই। একদিন এস”

“ফ্লিকারে আপলোড করো না কেন? প্রাইজ পেয়ে যেতে পার”

“প্রাইজ পেয়ে কী হবে? ছবি তুলি আনন্দে। প্রাইজের জন্য নয়। এটা আমার নেশা। পেশা নয়”

ওকে নিয়ে মুশকিল। কত কিছু করতে পারে। কিছুতেই রেকগনিশনের আগ্রহ নেই। জিতেও কোনও আনন্দ নেই, হারের কথা ভাবে না। বুঝতে পারে না, লোকটা কোন্ পৃথিবীর। অন্য গ্রহের হবে। জেতা-হারার ব্যাপারে আগ্রহ নেই। সবকিছুই যেন জীবনের অঙ্গ। থেকেও নেই।

দেবজিতের কথা টেনে বলল “আমাদের জন্যেও তো উপহার দিতে পার”

“তার জন্য ইন্টারনেটে আপলোড করতে হবে না। একদিন একটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ নিয়ে বাড়ি চলে এস। কিছু বাছাই করা ছবি দিয়ে দেব”

দেবজিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাশের পিআরও তরুণী বলল “এক্সকিউজ মি স্যার, মিঃ ধুধোরিয়া আপনাকে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান। যদি কাইন্ডলি আসেন”

“নাও, তোমারা গ্যাঁজাও। ডাক পড়েছে। শ্রীমুখ দেখিয়ে আসি মন্ত্রী মহোদয়কে। নইলে উনি রাগ করবেন”

এবার পেরিফেরি থেকে মধ্যমণি। এ আরেক দেবজিৎ। ধুধোরিয়া ওকে চিফ সেক্রেটারির আসনে বসাবে। নীল-সাদা বাড়িকে পেছনে ফেলে, পোজিশন অটুট রেখে আসর মাতাবে বাকচাতুর্যে। এখানে সে একমেবাদ্বিতীয়ম।

ধুধোরিয়া এরকম প্রায়শই একটা পার্টি দেয়। সামাজিক অবস্থান এস্ট্যাবলিস করতে। উপলক্ষটা যাই হোক না কেন। আজকেরটা ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে সংবর্ধনা। তাই মন্ত্রী থেকে আমলা। নইলে মন্ত্রী-আমলারা সহজে আসে না। এলে দু-পাঁচটা বিজনেস ভেনচারের ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে ফেলা যায়।

"আসুন মিঃ ব্যানার্জি। অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

ধুধোরিয়ার বউয়ের সঙ্গে পার্টিতে আলাপ। হাত তুলে বলল "নমস্তে"

একে একে পরিচয় অন্যান্যদের সঙ্গে। দেঁতো হাসি, দু-একটা চুটকি, 'আপনার কথা আগে শুনেছি, 'না আমার বাংলা ছবি দেখা হয়ে ওঠে না।' 'আপনার গান খুব ভালো লাগে।' মন জোগানো কথার ফুলঝুরি। এই জাতের সামাজিক আচার দেবজিতের আয়ত্তে।

খবরের কাগজের এক ফোটোগ্রাফার ওর কয়েকটা ছবি ক্লিক করল। পেজ থ্রি ভরাতে। ফলাও করে লিখবে, সাধারণ মানুষকে স্বপ্ন দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের টু-পাইস। সাপ্লিমেন্ট খাবে। সব মাল-মশলা যেন এই পার্টিতেই। এ ছাড়া আর কিছু বলতে শেখেনি। মরুক-গে। ওর কী।

জয়ন্ত সরকার এগিয়ে এল "সীমা অনেকদিন ধরে আপনাদের বাড়ি যাবে বলছিল। আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দোষ আমারই। রেকর্ডিং নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বাড়ি ফিরে টায়ার্ড লাগে। বেরোতে ইচ্ছে করে না"

সৌজন্যমূলক হাসিজুড়ে জবাব "একদিন আসবেন। আগে ফোন করে নেবেন, কলকাতায় আছি কি না"

"টিঙ্কু তো বড় হয়ে গেল। এখন কী পড়ছে?"

"ইকনমিকস্। প্রেসিডেন্সিতে ফাইন্যাল ইয়ার" মোবাইলটা বেজে উঠল, "এক্সকিউজ মি"

জয়ন্ত সরকার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল, দেবজিৎ তখনও ফোনে। ইঙ্গিতে হাত নেড়ে পা বাড়াল গল্পে মত্ত দুই বান্ধবীর দিকে। ওরা কলেজ জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত।

নির্ভীক রায়ের পরের সিনেমায় কাজের অফার। আরেকটা কন্ট্র্যাক্ট। জয়ন্ত উৎসাহিত। বাজার খুলছে, তবুও কোথায় যেন খেদ। সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ বা বাবা অভিষেক সরকারের মতো সুর দিতে পারছে না। সলিল চৌধুরীর যুগান্তকারী সৃষ্টি তো স্বপ্নের অতীত। বাজারে চললেও অচল। জোর করে যেন টিকে থাকা। সলিল চৌধুরী থেকেই বাংলা গানের ধারা অনেক পাল্টেছে। বিদেশি সুরের রেশ আগের মতো নেই। সেখানেও বিশাল পরিবর্তন। বিশ্বব্যাপী আবর্তমান এই পরিবর্তন। স্থিতি আসেনি বলেই কিছুই বেশিদিন টিকছে না। যারা সৃষ্টিশীল, তারাও এই ঢেউয়ে নোঙর খুঁজে পাচ্ছে না। যুগ-সমাজ যদি নাই জানে কী চায়, ওদের খুশি করবে কী করে? শাশ্বত আর বর্তমান কনজিউমারিজমের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়। একদিকে মন, অন্যদিকে সমাজিক লোভ। টানাপোড়েনে দিশাহারা। পথ জানে না, তবু চলতে চায়। কী চলবে, না-চলবে, না-বুঝেই টু-পাইস ধান্দা। জানে টিকবে না, তবুও যদ্দিন লুটেপুটে নেওয়া যায়।

“মেয়ে বাংলায় বড্ড কাঁচা। আচ্ছা, বাংলাটা ইংরেজি করে পড়ানো যায় না”

যে মা মেয়ে সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করে, সে কী জানে কোথায় দাঁড়িয়ে? তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই বিবর্তমান অস্থায়ী সামাজে বিদেশি আধুনিকতার নকলনবিশ নিষ্পেষণে জানে না, কোনটা গ্রহণীয়। যেখানে গ্রাহক গ্রাহ্য বিষয়ে অজ্ঞ, কী দিয়ে তাদের খুশি করে কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভব? কালটাই তো ধোঁয়াশায়।

ওদের পাশে বসে বলল “দুই বন্ধুতে গল্প জুড়ে দিয়েছ?”

রুমা হাসল “এসব সোশাল পার্টিতে, কলেজের বন্ধু তো বড় একটা পাওয়া যায় না। পেলে ফিরতে ইচ্ছে হয় কলেজপাড়ায়”

কফি হাউস নন্দনের আড্ডা আর সোনার বাংলার ব্যাঙ্কয়েটের মধ্যে বিস্তর তফাত। এখন কফি হাউসে বসার সময় হয় না বটে, কিন্তু তাকে সোনার বাংলায় আনতে বাধা কোথায়?

“আপনার সুর ভীষণ ভালো লাগে” জয়ন্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। কথা বলতে গিয়ে মুখটা ফ্যাকাসে। ফোনটা কেটে বলল “বাবার বুকে পেন হচ্ছে। চল, বাড়ি যেতে হবে”

“আসি রে” সীমা জয়ন্তর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অভিষেক সরকারের বয়স হয়েছে। হার্ট প্রবলেম হতেই পারে। বাড়ি ফিরে খোঁজ নেবে। কালজয়ী সৃষ্টি করে গেছেন। তখন নামীদামি আর্টিস্টদের সুর ভাঁজতেন। পুজোর রেকর্ডের রমরমা। আজও তা টিভিতে, গানের কম্পিটিশনে ঝংকার তোলে। আজকালকার গান খুঁজে পাওয়াই যায় না। একমাত্র মার্কেটিং পাবলিসিটি।

তখন দেবজিতের সঙ্গে কত জলসায় রাত কাটিয়েছে। হেমন্ত, মান্না, মানবেন্দ্র। ও ক্লাসিক্যাল মিউসিকের ভক্ত। কত রাত কেটেছে ডোভার লেন মিউজিক সম্মেলনে। রবিশঙ্কর, আলি আকবরের যুগলবন্দির সঙ্গে আল্লারাখার তবলা।

দেবজিৎ বলত “নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মন ছুঁয়ে যায়”

“কী রাগ?” রুমার জেরা।

“সুরদাসি মালহার”

“কী করে বুঝলে?” রুমা অবাক। নিশ্চয়ই ঢপ মারছে। গান-বাজনার চর্চা করে না। রাগ সম্বন্ধে জানবে কোত্থেকে? পরে দেখেছে ও-ই ঠিক। হিমের কুয়াশায়, চাদরটা গায়ে লেপেটে বাবু আলাপ থেকে ঝালায়। না বুঝলেও সীমা রুমার ভালো লাগছে। ঘুম চোখে ওর গায়ে ঢলে পড়াও। সুর সাগরে ভাসার স্পন্দন। হৃদয়ের কম্পন।

রুমার মাঝেমাঝে মনে হয়, বয়সের সঙ্গে অনুভূতিটাও হারিয়ে গেছে। থাকলে, ওর মতো করে জীবনের ছন্দ টের পাওয়া যেত। রংটা যে ওর মনে। ফাগুন তাকে ছোটায়, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে মণিপুর। রং নতুন ফ্রেমে, ডিজিট্যাল ক্যানভাসে। পাতায় বসা প্রজাপতি, সূর্যমুখী ফুলে ওড়া মৌমাছি, কুয়াশার ফাঁক গলে পাতায় মাকড়শার জাল। ওর ফ্রেমে জীবন্ত। বয়স, সরকারি দায়-দায়িত্ব সামাজিক স্থায়িত্ব বন্দি করতে পারেনি মনটাকে। সে যেন ভেসে বেড়ায় আকাশের আনাচে-কানাচে।

রুমা দেবজিতের পাশে গাড়িতে। সীমাকে ফোন "কেমন আছেন?"

"বোধহয় হার্ট অ্যাটাক। নিয়ে যাচ্ছি লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালে"

"আমরাও আসছি" কেটে দেবজিৎকে বলল "বাড়ি যাওয়া হবে না। লেডি ফ্লোরেন্সে ভর্তি করছে। ওখানেই চলো"

মনে হল টিঙ্কুর খোঁজ নেয় "সীমা আন্টির শ্বশুর, লেডি ফ্লোরেন্সে ভর্তি হচ্ছে। ওখানে যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না। খাওয়া হয়ে গেছে? দরজা বন্ধ করে, শুয়ে পড়। বেশি রাত করবে না। কাল কলেজ আছে" টিঙ্কু ফোন রেখে দিতে দেবজিৎকে বলল "ওখানে কোনও কার্ডিওলজিস্ট চেনা?"

"অরবিন্দ চক্রবর্তী। আগে দেখি, কার অ্যাডমিশন ডে"

গাড়িটা ইমারজেন্সির সামনে পার্ক করে বলল "ভেতরে যাও। আসছি"

অভিষেক সরকারকে ড্রিপ চালিয়ে ইনজেকশন দিচ্ছে। জয়ন্ত হাসপাতালের ফর্মালিটিতে ব্যস্ত। রুমা সীমার হাত ধরে। দেবজিতের মনে হল, জীবনটা কত অনিশ্চিত। জানি না পরমুহূর্তে কী হবে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই মানুষ প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখছে! ও প্রাসাদের বাইরে। দেখতে পাচ্ছে ভেতরের লোকজনের অহেতুক ছোটাছুটি।

নিঃশব্দ, অন্য কিছু পাওয়ার পূর্ণতায় একাকী।

বারো

আইসিইউর ওয়েটিং রুমে একফালি সূর্য খুঁজছিল সীমা। কুয়াশা ঢাকা আকাশ। বেরিয়ে এল লেডি ফ্লোরেন্সের বাইরে। মাঠে ভোরের কুয়াশাভেজা ঘাসে পায়চারি করতে।

ডাঃ অরবিন্দ চক্রবর্তী একটু পরেই অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবেন। দরকার হলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। দেবজিৎ আর রুমা ভোর আবধি ছিল। দেবজিতের সকালের ফ্লাইটে দিল্লিতে মিটিং। রুমা বলল, টিঙ্কুকে কলেজে রওনা করিয়ে নটার মধ্যে ফেরত আসবে। স্কুলে যেতে পারবে না, তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। জয়ন্ত টাকার ব্যবস্থা করতে গেছে।

আগে ভোরের সূর্যের রশ্মি অনুভবের চেয়ে রেওয়াজে বিভোর থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুরের আমেজে শোনাই হয়নি ভৈরবীর গান। দেখা হয়নি ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দুকে। ঝংকার তোলেনি ঝরাপাতার মর্মর। অভিষেক সরকারের বুকের ব্যথা নিয়ে এসেছে বাস্তবে। হারজিতের বাইরে আরেকটা পৃথিবীতে। যে শ্বশুরমশাই একাকী আনন্দবাজারের পাতা উল্টে সারা সকাল কাটিয়ে দেয়, টিভি বন্ধ করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান শোনেন, মাঝে মাঝে বেরিয়ে যান আকাশবাণীর আর্কাইভ লাইব্রেরিতে, তাঁর খাওয়া-দাওয়া ঠিক হচ্ছে কি না, শরীর ঠিক আছে কি না, কতটাই বা খোঁজ নিয়েছে?

ওদের দুজনের প্রতিষ্ঠার পেছনে ওনার অদৃশ্য হাত যে কাজ করেনি, এমন তো নয়। তৈরি করতে চেয়েছেন উত্তরসূরি। নিজের চাওয়া শেষ হলেও প্রজন্মের মধ্যে তা বাঁচিয়ে রাখা।

"বৌমা, তোমরা নাম কর, আরও উন্নতি কর"

"আশীর্বাদ করুন যাতে আপনার মতো হতে পারি"

"আমার মতো হয়ে লাভ নেই। আমরা তো সেকালের। আজকের যুগের জন্য গান ভাঁজবে আজকের মতো করে" পরলোকগত স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে বলতেন "উনি ছিলেন আমার প্রেরণা। তুমি জয়ন্তর প্রেরণা হও"

"চেষ্টা তো করছি। যুগটা অনেক পালটে গেছে। এখন রেকর্ড কম্পানির মালিকের মর্জিমতো চলতে হয়"

"ফরমায়েশি সৃষ্টি কখনও ছকের বাইরে যেতে পারে না। কেন জান? যুগের বাইরে গিয়ে সৃষ্টি না করতে পারলে তা হারিয়ে যায়"

"রেকর্ড কম্পানি তো সেগুলো নিতে চায় না"

"ওরা কী নিল তার ওপর সৃষ্টি? সৃষ্টি মনের তাগিদে মানুষের জন্য। আমাদের যুগে মার্কেটিং বলে কিছু ছিল না। হেমন্তদা রেডিওতে সলিলদার সুরে গাইল 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' সবাই বলল 'পঙ্কজ মল্লিকের মতো গলা।' আইপিটিএর মধ্যে বাংলা পেল নতুন প্রতিভা। জাগরণের গান। তা-ই নিয়ে এল, তোমরা যাকে বল স্বর্ণযুগ। যে সুর মানুষকে স্পর্শ করে, তাই আগামী"

"যদি সে সুরে কম্পানি না নেয়?"

"কী আসে যায়? সৃষ্টি ফরমায়েশি হলে টেকে না। নাম, টাকা, স্বীকৃতি চাইলে যুগান্তকারী সৃষ্টি হতে পারে না। আমরা করতাম নিজের আনন্দে। 'কর্মণ্যেবাধিকরস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্মফলহেতুভূসাতে সঙ্গোহস্তবকর্মণি' ফলের আশা করো না। কাজ করে যাও"

সীমা চিরাচরিত দ্বন্দ্বে। পুরনো আর নতুনের দ্বন্দ্ব। সে যুগটা ছিল অন্য। তখন এত অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যম, প্রচার ছিল না। একমাত্র জলসা। না হলে রেডিও। কপাল থাকলে সিনেমায় প্লেব্যাক। আজকে কতরকম মাধ্যম। টিভি, হোর্ডিং, মার্কেটিং ম্যানেজার। মানুষের বিবেক, চিন্তাধারাও বিক্রি হচ্ছে, মার্কেটিংয়ের দাপট শেখাচ্ছে কোনটা খাবে। সুযোগ এগিয়ে দিচ্ছে, আসন পেতে দিচ্ছে। সেই বাজারে এদের সাহায্য ছাড়া ওরা কোথায়? দোরগোড়ায় দাঁড়াতে না পারলে, লোকে জানবে কী করে? শ্বশুরমশাইয়ের দৃষ্টি কি আজ চলে?

"টাকা কামাতে চাও তো আলুর ব্যবসা কর। আরও বেশি চাইলে প্রোমোটারি। সৃষ্টিকে রোজগারের পথে টানলে, দেখবে তা গৌণ। রোজগারই মুখ্য। নামটা সবাই করতে পারে না। আবার যে করল, সেই সেরা, এটাও নয়"

"নাম করেছেন বলেই একথা বলতে পারছেন"

"তোমরা সেভাবে দেখবে। নাম ঈশ্বরের দান। না করলেও কিছু করতে পারতাম, যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে করাতে চান। নাম না হলে আমার কী কিছু করার ছিল!"

ছিল না । কারুরই থাকে না । আমরা মনে করি আমাদের অনেক কিছু করার আছে । আদৌ কিসসু নেই । এই যে অভিষেক সরকারের এত নাম ছিল, তাতেই বা তার জীবনধারায় কী হেলদোল হয়েছে ? একদিন ঘরভর্তি লোক থাকত । আজ আইসিইউতে ক'জন বা দেখতে এসেছে ? ক'জন বা খবর নিয়েছে ? নামী লোকেদের এই পরিণতি হলে বেনামীরা হারিয়েই যাবে । মুষ্টিমেয় কয়েকজন মরতে পারে রাজার হালে ।

সামাজিক হারজিতের বাইরেও একটা খেলা আছে। কে তার খোঁজ রাখে? দেবজিৎদা সব জায়গায় জিতে যায়। তবু কোনও জিত ওকে স্পর্শ করে না। বারবার এটাই বুঝতে চেয়েছে। পারেনি। কী করে সবার

মধ্যেও এত নির্লিপ্ত, বোঝে না। ফ্লিকারে ছবি আপলোড করতে বলল। ভ্রুক্ষেপ নেই। ছবি তোলে নিজের আনন্দে। ও যদি দেবজিৎদার মতো হতে পারত।

অভিষেক সরকার বলেছিল “মা, তোমাদের আজকের যুগের দর্শন বুঝি না। এটুকু বুঝি, তোমাদের যুগে করার থেকে পাওয়ার নেশাটাই বেশি। যদ্দিন চাইবে, পাবে না। ছেড়ে দিলেই পাওয়া ধরা দেবে”

সকালের মিঠে আমেজে ভয় মেশানো ভালো লাগা। অভিষেক সরকারের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। ওর অদৃশ্য জাদুদণ্ড না থাকলে ওদের ভবিষ্যতের চিন্তা। স্বার্থে জড়ানো। ফিরে এল লাউঞ্জে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়ে গেছে। ডাঃ অরবিন্দ চক্রবর্তী বলল ট্রিপল্ ভেসেল ব্লক ছিল। মেডিকেটেড স্টেন্ট লাগাতে হয়ছে। খরচ বাড়ল। সে হোক। টাকা তো অভিষেক সরকারেরই। ওঁর চিকিৎসায় খরচ হবে না তো কার? জয়ন্ত আইসিইউর সাইড রুমে। সীমা নীচে লবিতে নেমে এল। ওখানে ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের আত্মীয়ের পাশে ভালো লাগছিল না।

“ক’টা বাজে?”

ফিরে তাকাল রোগাপটকা এক মাঝবয়সির দিকে “সাড়ে সাতটা”

“ধন্যবাদ”

অরণি আর কতক্ষণ বসে থাকবে বিদিশার জন্য? ডাক্তারদের টাইমের কোনও ঠিক নেই।

কিছুক্ষণ আগে, বিদিশাকে জিজ্ঞেস করেছিল “আর কতক্ষণ?”

“এই আসছি। আর একটু”

শাড়ির আঁচল ঠিক করে বেরিয়ে গেছে। সেই যে গেছে কোনও পাত্তাই নেই। আগে সাদা কোট পরত। রিসার্চে দেখা গেছে সাদা কোটে ইনফেকশন রেট বেশি। কোটের ফাঁকে জীবাণুর ঘোরাফেরা। বিদিশা তাই কোট বর্জন করেছে। এ যেন গাঁয়ের লোকেদের 'হোথা' বলার মতো। কত ক্রোশ, কে জানে? বা ব্রিটিশদের মতো 'ইউ কান্ট মিস ইট' মানে শিওরসট মিস। ডাক্তারদের আসছি মানেও তাই। সন্ধে কাবার করে বলবে 'পেশেণ্ট খারাপ ছিল’। সারা জীবনই শুধু অপেক্ষা। কলেজে পড়ার সময়, প্রেমের অপেক্ষা। যখন পাশ করল, চাকরির অপেক্ষা। চাকরি পাওয়ার পর, অর্থের অপেক্ষা। বিয়ের পর, সায়ন্তনির শোধরানোর অপেক্ষা। এখন বিদিশার জন্য। শেষ হয় না। পাওয়ার মাধুর্যও হারিয়ে যায়। যেদিন সেই পাওয়া আসে, সেদিন বলতে ইচ্ছে করে ‘চাই না’। প্রয়োজনটাই ফুরিয়ে গেছে। মাধুর্যটাও নেই। বাসি, তেতো পাওয়াকে ছুড়ে ফেলে মন হারাতে চায় না-পাওয়ার আনন্দে। পরিত্রাণ চাই। এই পাওয়ার অপেক্ষা থেকে। তবুও পারে না, না-পাওয়ার অনুভূতিতে ভাসতে।

যেমন সুদীপ্তা তাকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করে চলে গেল। ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিল।

কালো মুখচোরা সুদীপ্তাকে ভালো লেগেছিল, কলেজের প্রথম দিন থেকেই। পাট করা তাঁতের শাড়ি। প্রথম বেঞ্চে বসে মনোযোগ সহকারে টিচারের প্রতিটা কথা বেদবাক্যের মতো লিখত। কিছু বাদ দিলে দ্বিতীয়বার পাওয়া যাবে না। ভালো লাগত লাজুক মেয়েটাকে। নিরহঙ্কার আবরণকে। ব্যস, ওইটুকুই। কোনও দিনও বলতে পারেনি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' নিঃশব্দে মাছির মতো ভনভন করত ওর পাশে। যদি একবার ফিরে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে। কাজলকালো চোখ ফিরে তাকায়নি! মিষ্টি হেসে বলেনি "চল দুজনে বসে কফি খাই"

বলেনি বলেই আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অপেক্ষাটা গভীর থেকে গভীরতর। চাওয়াটাও।

বিদিশা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল "আজকে যাওয়া হবে না। ইমার্জেন্সি এসে গেছে"

"তুমি তো অন কল নও"

"না নই। তবে স্যার বলল কেসটা ম্যানেজ করে যেতে"

আবার অপেক্ষা। কী যে ভাগ্য নিয়ে এসেছিল, কে জানে? শেষ হতে চায় না। কিছু করার নেই। উঠে পড়ল। যদি একটা বাচ্চা থাকত। তাকে পড়িয়ে, সন্ধেটা কেটে যেত। সে গুড়ে বালি। সায়ন্তনির সে ব্যাপারে আগ্রহই নেই। বাচ্চা মানুষ ট্র্যাডিশনল লোকেদের ধর্ম। ওর অনেক কিছু করার আছে। বাচ্চা পয়দা করে ঝুলে যাওয়া দেহের অংশগুলোকে চাঙ্গা করার জন্য প্লাস্টিক সার্জারির পেছনে টাকা ঢালতে চায় না। এ সব সেকেলে। স্বামী-পুত্র-সংসারে জড়াতে চায় না। পৃথিবীটা অনেক বড়। সায়ন্তনি তার বিপুল স্বাদটুকু ভোগ করতে চায়।

"পরে কথা হবে" অরণি উঠে পড়ল।

সীমা আড়চোখে ওকে দেখে চেয়ে রইল বিদিশার যাওয়ার দিকে। বেরিয়ে এল অরণির পিছু পিছু লেডি ফ্লোরেন্সের খোলা মাঠে। যদিও দুজনের প্রতীক্ষা ভিন্ন, তবুও প্রাঙ্গণ এক। সীমা, অভিষেক সরকারের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায়। অরণি সান্ধ্য অবকাশ কাটাতে। জীবন থেকে প্রতীক্ষা যদি মুছে যেত? কালকের কথা না ভেবে মুহূর্তের জন্য বাঁচতে পারত... কত শান্তি থাকত জীবনে। আশা নিয়েই যত জ্বালা। অশান্তির কারণ।

সীমা উদগ্রীব অরণিকে বলল "আপনার এখানে কেউ ভর্তি?"

"না। আপনার?"

"শ্বশুরমশাইয়ের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে"

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। ভালো হয়ে উঠুন। সবাই ভালো থাকুক। সবাই" মঙ্গলকামনার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস।

অরণি মন্থর গতিতে বেরিয়ে এল। অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় সরে যাচ্ছে। সবারই আশা বাঁচার। কাউকে বাঁচিয়ে তোলার আশা। সম্পর্কের বুনিয়াদ গড়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা। দুঃখের মধ্যেও নতুন স্বপ্ন দেখার আশা। এরা প্রতীক্ষা করবে। নিশ্চয়ই একদিন ফল পাবে। ভালো বা মন্দ। জীবনটা ফলের মধ্যে বন্দি। হারজিতের মধ্যেই জীবনের পাওনা গুনছে। অরণি জানে, সে শুধু প্রতীক্ষাই করে যাবে। ফল যেদিন আসবে সেদিন প্রয়োজন ফুরবে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। এই জ্যোৎস্নায় কবিতা বেরিয়ে আসত। নতুন রঙে লেখা হতে পারত জীবনের পাণ্ডুলিপি। বয়স কম হলে স্বপ্ন দেখাও যেত প্রেমিকার হাত ধরে।

এখন চাঁদ আছে, প্রেম নেই।

জ্যোৎস্না আছে, আপনজন নেই।

প্রেমিকা থাকলেও, উপভোগের মুহূর্ত নেই।

ঘর থাকলেও, সোহাগ নেই।

জীবন থাকলেও, মৃত্যু নেই।

চাঁদের উষ্ণতার মধ্যে এক নিরলস শূন্যতা। তার পথ ধরে একাকী অপেক্ষা করতে করতে পৌঁছনো পূর্ণতার গহ্বরে। সেখানেই জীবনের আসল পাওয়া। কিংবা হারিয়ে যাওয়া। জানে না কোন দিকে? ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। অসহ্য অর্থহীন জীবন।

অনসূয়া আজ বলছিল “প্রদীপ সেনকে নন বেলেবল ওয়ারেন্টে ডিটেন করেছে। সিবিআই বলে কথা। অত সহজে ছাড়বে”

“কী করেছিল?”

“শুনেছি অফিসের নেট থেকে ফরেনে ওষুধের ভুয়ো ব্যবসা করত” মুচকি হেসে বলেছিল “ভায়েগ্রা”

“সেটা কী?” অরণি আকাশ থেকে।

“কোন জগতে বাস কর? জান না ওটা কী?”

“সত্যি জানি না”

“তোমার ওসব লাগবে না। জেনেও কাজ নেই। তুমি তোমার বই নিয়ে থাক” ব্যঙ্গ করে বেরিয়ে গেছিল।

অরণি ওদের পৃথিবীতেও ফিট করছে না। সায়ন্তনিকে জিজ্ঞেস করলে তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

এই ক্রমবর্ধমান সভ্যতার ব্যপ্তিতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সুদীপ্তাকে বলতে পারেনি ‘তোমায় ভালোবাসি’ রুচিরাকে ভালোবাসার কথা বলেও ধরে রাখতে পারেনি। সায়ন্তনিকে সাত পাকে বেঁধেও কাছে আনতে

পারেনি। এখন মনে হচ্ছে, বিদিশাও ক্রমশ দূরে। সে একা। সম্পূর্ণভাবে।

তেরো

শেখর মুখার্জি রনিতকে বলল “কতদিন থেকে ট্যানিয়াকে চিনতেন?”

“ছ'মাস হবে...”

“আপনার বাড়িতে কী প্রায়ই এরকম পার্টি হয়?”

“প্রায়ই নয়। মাঝে-মধ্যে”

“ট্যানিয়া আগে কখনও এখানে এসেছে?”

“না”

“হঠাৎ ট্যানিয়াকে নেমন্তন্ন?”

রনিত অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল। এর মধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে গেছে। ট্যানিয়াকে নিয়ে দু-চার কথা লেখাও হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াও গল্প তৈরির চেষ্টা করেছিল। বৈচিত্রের অভাবে অন্য চ্যানেলগুলোর সঙ্গে কম্পিটিশনে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি টেকেনি। বেঁচে গেছে ট্যানিয়া। বারবার সুন্দর মুখটা টিভির পর্দায় পুরুষঘটিত স্ক্যামে জড়িত হলে শোভা বর্ধন করে না। চেনামহলে রনিতের ব্যবচ্ছেদের কমতি নেই। ট্যানিয়ার কেচ্ছা কম হলেও রনিতের নয়। তার জীবনযাপন নিয়ে টানাপোড়ন।

সিগারেট ধরিয়ে রনিত বলল “পরিচিত। অনেকবার এখানে-ওখানে দেখা হয়েছে। তাই...”

“ট্যানিয়াকে ওই অবস্থায় রাজেরহাট কনেক্টরে না পাওয়া গেলে প্রশ্ন করতাম না। সেদিন আর কে ছিল?” ওসি শেখর মুখার্জি দুঁদে অফিসার। প্রচলিত, ওর পাল্লায় বাঘে-গরুতে জল খায়। সন্তর্পণে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-রাতের ব্যঞ্জনায়।

ট্যানিয়া বলেছে “দুটোড্রিঙ্ক। তারপর কিছু মনে নেই”

শেখর মুখার্জি আর কী প্রশ্ন করবে? যারা কনেক্টর থেকে তুলে এনেছিল তারাও বেপাত্তা। ট্যানিয়ার কাছ থেকেই ওর হদিস। একমাত্র ট্রেস। কথার মারপ্যাঁচে সব বার করবে। ঘুঘু শেখর ট্যানিয়ার সঙ্গে কথোপকথন উহ্য রেখে জেরা করছে। রনিত বেশ বুঝতে পারছে ও জড়িয়ে পড়েছে। অন্য যারা ছিল, পরিচিত নাম। তাদেরও জড়িয়ে ফেলতে হবে। মিথ্যে বললে বাঁশটা একাই খাবে “ট্যানিয়া, মনোলীনা, মনোময়, মৃদুল আর শর্বরী”

“এদের ফোন নম্বর?”

মোবাইল থেকে বলল “লিখে নিন”

চারজনের নম্বর লিখে বলল "ট্যানিয়ারটা আছে। কথা হয় গেছে। কী হয়েছিল সে রাতে?"

"খাওয়া-দাওয়া, ড্রিঙ্কস, মিউজিক। যা হয়ে থাকে"

"ট্যানিয়া বেহুঁশ হল কী করে?"

প্রশ্নটা অবশ্যম্ভাবী, জানত। তাই একটা গল্প ফেঁদে রেখেছিল "বেহুঁশ তো হয়নি। মাত্রাতিরক্ত ড্রিঙ্ক করেছিল"

"ডিনার খেয়েছিল?"

"না। সি ওয়াজ নট ইন এ পোজিশন টু হ্যাভ এনি ফুড। মনোময়ের সঙ্গে চলে গেল। ও নামিয়ে দেবে বলল। বলতে পারব না, হাউ সি ল্যান্ডেড ইন কানেক্টর"

গতে বাধা গপ্পো। বিশ্বাস করা কঠিন। ট্যানিয়া হাইল্যান্ড পার্কে থাকে। রাজেরহাট কনেক্টরে কী করে? অনেক প্রশ্ন। রনিতের স্টেটমেন্টে কংক্রিট ফ্যাক্টস্ মিসিং। মনোময়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। শেখর মুখার্জি উঠে পড়ল। ওর আজগুবি কথা চ্যালেঞ্জ করতে গেলে ফ্যাক্টস চাই।

"ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে আসব" ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর যাওয়াতে ক্ষণিকের স্বস্তি। শেষ পর্যন্ত গল্পটা ধোপে টিকবে?

আসল ঘটনা, এমনটা রনিতের দুনিয়ায় হরদম ঘটছে। নিছক খানা-পিনার পার্টি ছিল না। শর্বরী চিরকালই যুগের থেকে আলাদা, ডানপিটে। একঘেঁয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের জন্য প্রোপোজ করেছিল "লেটস্ হ্যাভ অ্যান অর্গি"

রনিতও এরকম কিছু চাইছিল। এর স্বাদ সায়ন্তনির মুখে শুনলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। সায়ন্তনি থাকলে এই খেলায় মাততে অসুবিধা হত না। সে গুড়ে বালি। তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ট্যানিয়ার সান্নিধ্যে। ইচ্ছে, ব্যথা, প্রতিশোধ নিতে পাল্টা জবাব সেদিনের আয়োজন। সায়ন্তনি থেকে ট্যানিয়াকে আলাদা করে অন্য নেশায় জড়াতে চেয়েছিল। তাই ওর নিমন্ত্রণ। ও আঁচ করতে পারেনি নাটকটা। বার্নপুরের সরল মেয়ে, কলকাতার মেকি পশ্চিমি-ঘেঁষা সংস্কারে মানাবার চেষ্টা করছিল। অন্যদের ছাঁচে নিজেকে ঢালতে গিয়ে আধুনিকতার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রগতির মানে বোঝার আগেই, জীবনের গতি আনতে চেয়েছিল কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করে। এগোতে ইচ্ছে ছিল, অজানা-অচেনা ছন্দে। বিদেশিয়ানাকে অস্বীকার করার দাপট ছিল না।

অদ্ভুত মেয়ে শর্বরী। সহবাসের শেষ মার্গে ছিটকে বলতে পারে "তাড়া কীসের?"

উত্তেজনাকে দ্বিগুণ বাড়ানোতেই জৈবিক সন্তোষ। বড়লোক বাপের হার-না-মানা মেয়ে। পাড়ার কেষ্টদা ওরফে কৃষ্ণকলি বসুর প্রেমে পড়ে বাড়ির অমতে বিয়ে। বাবাকে চাপ দিয়ে শুধু জামাইয়ের স্বীকৃতিতে

থামেনি, ওর ভবিষ্যৎও গড়ে দিয়েছিল। গাড়ি রিপেয়ারিং ব্যবসা। এখন সেটা নিছক কারখানা নয়। সুনামি চেন। অনেক আউটলেট। পাড়ার কেষ্টদা এখন রকবাজ নয়, পুরোদস্তুর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কৃষ্ণকলি বসুর ভাগ্য ফানুস হয়ে উড়লেও শর্বরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশ কিছুকাল। তাতে অবশ্য শর্বরীর আক্ষেপ নেই। কলকাতার মুক্ত পৃথিবীতে ভেসে বেড়ানো। কলকাতার নতুন রঙের ঝলকানি।

এহেন শর্বরী বসু যখন রনিতকে উস্কে বলেছিল 'লেটস্ হ্যাভ অ্যান অর্গি' সায়ন্তনির ওপর বদলার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

"নট এ ব্যাড আইডিয়া" সায় দিয়েছিল।

"হু উড বি দেয়ার?"

"মনোলীনা হ্যাজ টু বি। রেস্ট ইওর চয়েস। মেট নিউ চিক ট্যানিয়া। ওয়ান্ট টু ট্রাই হার? ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন হার ইন দ্য অ্যাডস"

"কান্ট রিমেমবার। গুড লুকিং?"

"ওয়ান্স মিস ক্যালকাটা"

খাবার, পানীয়, মনোলীনার চুমু। বাড়তি শর্বরীর স্ট্রিপটিজ। আগুন জ্বালাচ্ছিল নিম্নাঙ্গে। মদের নেশায় আরও রঙিন শর্বরী। পেছনে ইংরেজি বাজনাঃ

রিলিস মি, লেট মি গো

ফর আই ডোন্ট লাভ ইউ এনি মোর

কখনও এঙ্গেলবার্ট, কখনও জেমস লাস্ট, কখনও রিচার্ড ক্লেডারম্যান। ঢিমে আলোর রোশনাইয়ে মোহময় আবেশ। মনোলীনা দারুণ সেজেছিল। সাদা ঘাগরা-চোলির ওপর জরির কাজ, চন্দ্রাণী পার্লসের নেকলেস্, ফিকে গোলাপি লিপস্টিক। লিকপিকে মনোলীনা আরও পরিপূর্ণ। সিরিয়াল করে টাকা হয় কি না পরের কথা। গেরস্তদের সাজতে শেখায়। কথা, চলনে-বলনে না সই, গেরস্ত মনোলীনা সাজাগোজে সিরিয়াল স্টার। উঁচু গ্যাদারিংয়ে সোশালাইট হওয়ার লোগো লাগাতে বদ্ধপরিকর। রনিতের গালে চুমু খেয়ে বলেছিল "লাভ ইউ"

রনিত মনোলীনাকে জড়িয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল উষ্ণতার ছোঁয়া। লো-কাট চোলির খোলা পিঠে আঁকিবুকি কেটে বলেছিল "লুক অ্যাট শর্বরী"

"আই অ্যাম লুকিং অ্যাট মনোময়"

ইদানীং মনোময়ের সঙ্গে একটু বেশি জড়াচ্ছে। ফল যে হয়নি, তা নয়। খবরের কাগজে প্রায়শই ব্রেক। মনোলীনা এখন সেলেব। সেই সুবাদে দু-চারটে ফিতে কাটাও। সিরিয়ালের পর উপরি। কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে কাত করতে পারলে কিছু বেশি রোজগার। সুন্দর মুখ দিলেও ঈশ্বর দৈহিক প্রাচুর্য দেয়নি। সেলিব্রিটি হলে কার্পণ্য নেই। তবে মধ্যরাতের উন্মাদনা চাই।

ফার্ন রোডের কমলা গার্লস স্কুল। সাউথ সিটি মর্নিং থেকে খাপছাড়া গ্র্যাজুয়েশন ছাড়া মনোলীনার আর কী-ই বা জোর? কিছু ইংরেজি, মিষ্টি মুখ, প্রডিউসারদের সঙ্গে শুয়ে কয়েকটা সিরিয়াল হাতড়ে নেওয়া। তা দিয়ে সোশালাইট হওয়া যায় না।

পেনশনে সংসার চালানো রিটায়ারড বাবার মাথাব্যথা নেই ওর রোজাগারের উৎস নিয়ে। নতুন মারুতি, এসি। মাস গেলে দু-একটা ভালো হুইস্কির বোতল। মন্দ কী। মেহেঙ্গার বাজারে পেনশনের বাঁধা টাকায় গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে, দিনের বাজারটাও হত না। এখন ভাবতে হয় না। পাড়া-পড়শিরা সমীহ করে। হাজার হোক সেলেবের বাবা। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারাল অফিসের কেরানির সামাজিক কদর বেড়েছে। মেয়ে সরস্বতী হতে না পারুক, লক্ষ্মী তো বটেই। ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য আসছে মেয়ের দৌলতে।

রনিত দেখল মনোময়ড্রিঙ্কস হাতে ট্যানিয়াকে নিয়ে কোণের সোফায় গা ঘেঁষে ফিসফিস করছে। আজ মনোলীনা মনোময়ের দিকে তাকাবে না। যা খুশি করুক। এ পার্টির মূলমন্ত্র, এখানে কেউ কারও নয়। কিংবা সবাই সকলের। কোনও নিয়ম নেই, বাধা নেই। কাল কেউ মনে রাখবে না, আজ রাতের কথা। নিজের মতো করে পাওয়ার রাত। যদি শিখতে পারে, তার চিমসে দেহে এমন কিছু আছে যা অন্যদের নেই। তবেই তো, বশ করার মন্ত্র শেখা হয়ে গেল। শুধু একটা সুযোগ। দেখিয়ে দেবে সে কিছু কম নয়।

শর্বরী এত ভালো নাচতে পারে জানা ছিল না। কালো শাড়িতে চল্লিশ-ছোঁয়া শর্বরীর কাঁধ পর্যন্ত বব চুল। নিতম্বের ছন্দে রাতের মোহ। আঁচল খসছে। কালো ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে উদ্ধত বুকের ঝলক আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাঁধনহারা উষ্ণতায় ভাসতে। কালকের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই। শুধু এই মুহূর্ত।

মৃদুলই প্রথম জড়িয়ে ধরেছিল শর্বরীকে। মুখ থেকে বুকে চুমু। হাঁটু গেড়ে, ঠোটের ছোঁয়ায় নাভির ওপর আঁকিবুকি। আবেগের সুড়সুড়ি। আঁকড়ে ধরেছিল নিতম্ব। শর্বরীর কোমরের ছন্দ অন্য কিছু বোঝাচ্ছে। আজ অন্য খেলা। নৃত্যের ছন্দে, ঢুলুঢুলু চোখে অন্যদের মনে কামনার ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছে। এ অন্য শর্বরী। রনিতের অচেনা। ওর নাচের তালে তাল রাখতে পারেনি রনিত।

শর্বরী যখন পার্টির কেন্দ্রবিন্দু, পাশে বসা মনোলীনার ঘাগরার মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়েছিল। শিউরে উঠেছিল মনোলীনা। বাধা দেয়েনি। মন চাইছিল, হাত তাকে নিয়ে খেলা করুক, যে কোনও জায়গায়, যেমন খুশি। চোলির ভেতর তরল স্রোত। মনোলীনাও নাচের উন্মাদনায় ভাসছে।

রনিত শর্বরীর মোবাইলে “ট্যানিয়ার ব্যাপারে পুলিস এসেছিল”

“কী বললে?”

“বললাম কারা কারা ছিল। তোমাদের কাছেও যাবে। বললাম মনোময়ের সঙ্গে ট্যানিয়া বেরিয়ে গেছিল”

“ও ফাঁসবে। যা বলেছ, তা তো সত্যি”

“কী হয়েছিল একজ্যাক্টলি?”

“ঠিক জানি না। মনোময় বলেনি। তবে গেস করতে পারি”

“কী গেস করলে?”

“আগে বল, ডিড ইউ টক উইথ ট্যানিয়া?”

“চেষ্টা করেছিলাম। সি’জ নট পিকিং দ্য ফোন। পারপাসফুলি অ্যাভয়েডিং”

“ও পুলিসের কাছে একটা গল্প ফেঁদেছে”

“কী গল্প?” রনিত উদ্বিগ্ন।

“ডোন্ট নো। ইটজ ইম্পরট্যান্ট টু নো হোয়াট সি হ্যাস কমিটেড। সি ইজ দ্য ভিক্টিম। পুলিস ওর কথাই বিশ্বাস করবে। অ্যান্ড সি ইজ এ লেডি। অল মেন, ইনক্লুডিং পুলিস অফির্সাস হ্যাভ এ সফট কর্নার ফর লেডিস। ওকে পার্টিতে ডাকা ঠিক হয়নি। সি ইজ টু ইমম্যাচিওরড"

“বাট সি ইজ সেক্সি। ইউ কান্ট ডিনাই দ্যাট” রনিত প্রতিবাদ করল।

অস্বীকার করতে পারে না শর্বরী। মৃদুলের ঠোঁটের উষ্ণতা যখন ওর দেহে তরঙ্গ ছড়াচ্ছে, হাতটা নীচে নামতে শুরু করেছে, পেছন থেকে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। পিঠে স্তনের স্পর্শে বুঝতে অসুবিধা হয়নি নারী। সামনে পুরুষ, পেছনে নারী। যুগলের মিলিত স্পর্শে স্যান্ডউইচ, কেঁপে উঠেছিল। এই অনুভূতি কেষ্টদা দিতে পারেনি। কিংবা রনিত। নেশা জড়ানো চোখে দেখেছিল রনিতের পাশে মনোলীনা নেই। পেছন থেকেই সে জড়িয়ে ধরেছে। মৃদুলকে ছেড়ে, মনোলীনাকে টেনে নিয়েছিল।

সম্পূর্ণতা কী এক লিঙ্গে সীমাবদ্ধ? সম, না কী উভয় লিঙ্গে। ভাসা-ভাসা মনে আছে, ঢিমে আলোয় মনোময়ের কোলে ট্যানিয়া।

কিছু বলতে যাচ্ছিল। থেমে “সামওয়ান ইজ রিঙ্গিং দ্য ডোর বেল। টক টু ইউ লেটার” ফোন কেটে দিল।

রনিত শর্বরী-মনোলীনার খেলা দেখছিল। শর্বরী ধীরে ধীরে মনোলীনার ঘাগরা খুলে ফেলছে। শাড়িটা মাটিতে লুটিয়ে। সায়ার ওপর হাত বোলাচ্ছে। রাতটা মধুর হয়ে থাকত, যদি না ট্যানিয়া এই ঝামেলায়...

ঠিকই বলেছে শর্বরী। ট্যানিয়াকে ডাকা ঠিক হয়নি।

যতক্ষন না শেখর মুখার্জি আসল কারণ জানবে, রনিত বখরা। সন্দেহের তির ওর দিকেই। শালা মনোময়টা এ কী করল? মিডিয়ার লোক। জানিস না কোথায় কীভাবে খেলতে হয়। এখানেই বোধহয় সামাজিক পার্থক্য। মনোলীনা আর মনোময় ছাড়া ওখানে যারা ছিল, সবাই সামাজিকভাবে একই স্তরে। সিরিয়ালের মনোলীনা, চাকরিজীবী মনোময়ের সঙ্গে এ দুনিয়ার অনেক ফারাক। মিডিয়াতে গ্ল্যাম সেকশন

দেখভালেই যোগসূত্র। সুন্দরীদের ভিড়। মেক হে হোয়াইল দ্য সান সাইনস। যদ্দিন পারো লুটে নাও। চাকরি না থাকলে এরা পুঁছবেও না। যা আমার নয়, যেখানে আমি নেই, যেখানে আমি হয়ত কোনও দিন পৌঁছতে পারব না... মনোময়ের মধ্যে এই অধরার প্রতি তীব্র আসক্তি।

শেখর মুখার্জি ভাবল, এবার কাকে। বড়লোক বাপের ব্যাটা মৃদুল। সেলিব্রিটি নয়। মেপে কথা বলতেও শেখেনি।

"কী হয়েছিল?"

"পার্টিতে যা হয়। খাওয়া, নাচা-গানা। ট্যানিয়া বেশিড্রিঙ্ক করে। মনোময়ের সঙ্গে বেরিয়ে যায়"

সবাই যদি এক বলে, মনোময়ের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মিডিয়ার লোক। গল্প বানাতে কতক্ষণ। বেশি জানলে সেই গল্পে রসভঙ্গ করা যেত।

শর্বরী ঘুঘু। শেখর মুখার্জিকে দেখে বিরক্ত "জেনেই তো গেছেন ট্যানিয়া মনোময়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেছিল। প্রশ্ন করে কী হবে?"

শর্বরী চাইছিল প্রশ্নটা ট্যানিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। তার সঙ্গে মনোলীনা বা মৃদুলের দৈহিক লেনদেন যাতে ঘুণাক্ষরেও কথা প্রসঙ্গে না আসে।

"আপনি কোথায় ছিলেন?" শেখর মুখার্জি আরও কিছু জানতে চাইছে।

"অবভিয়াসলি রনিতের বাড়িতে।ড্রিঙ্ক করছিলাম"

"খেয়েছিলেন?"

"মনোময়-ট্যানিয়া চলে যাওয়ার পরে। ট্যানিয়া এতড্রিঙ্ক করেছিল খাওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না"

"আপনি?"

"আমিও। সে তো হরদম করি। কখনও বেসামাল হই না। ট্যানিয়ার তো অভ্যাস নেই"

রনিত আর শর্বরী ছাড়া আর কেউ জানে না। ওরা এডিনবরা ক্রিস্ট্যালের জারে ক্লনিডিন মিশিয়ে দিয়েছিল।

"ওটা কী মেশালে?" রনিতের প্রশ্ন।

"ক্লনিডিন"

"কী করে?"

"উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়" মিশিয়ে শর্বরী বলেছিল।

"ভায়েগ্রার চেয়েও স্ট্রং?"

"ভায়েগ্রা ইরেকশন বাড়ায়। এটা জেনারেলাইজড্ উত্তেজনা"

তার এফেক্টে মৃদুল-মনোলীনা-রনিত শর্বরীর উরুতে। সেকথা শেখর মুখার্জির না জানলেও চলবে। তখন মনোময় আর ট্যানিয়া চলে গেছে। সে রাতে আর কী ঘটেছিল, সেটা জানবার কোনও প্রয়োজন নেই।

"কখন খেলেন?" শেখর মুখার্জি নাছোড়বান্দা।

"অতশত মনে নেই। অনেক রাতে"

"কী খাবার হয়েছিল?" শেখর মুখার্জি বাজিয়ে দেখছে।

"বিরিয়ানি, চাঁপ, স্যালাড। এবার কি জিজ্ঞেস করবেন, কে করেছিল, তাই না? বলেই দিচ্ছি। রনিত রান্না করেনি। আরসেলান থেকে কিনে এনেছিলাম"

ওর থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। বেশি বলতে গেলে দু-পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবে। অতএব মনোময়। উঠে বলল "বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি"

"আপনার কর্তব্য করছেন। ওই পার্টিতে যারা ছিল, তাদের কাছে যাবেন - সেটাই স্বাভাবিক।

শেখর মুখার্জি মনোময়কে ডেকে পাঠালো লালবাজারে "সবাই বলল, আপনি ট্যানিয়ার সঙ্গে না খেয়ে বেরিয়ে গেছিলেন?"

"হ্যাঁ।ড্রিঙ্ক করেছিলাম। ভাবলাম, লেটস্ গো ফর এ লং ড্রাইভ। হাওয়া খেতে"

"ড্রাইভ করে কোথায়?"

"ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে হাইল্যান্ড পার্কের দিকেই যাচ্ছিলাম। ট্যানিয়া বলল লেটস্ ড্রাইভ। ফেরত এসে বাইপাস ধরে, সল্ট লেকের ফ্লাইওভার দিয়ে রাজেরহাট কানেক্টর। রাস্তাটা ভীষণ ভাঙাচোরা। বেশ ঝাঁকুনিও লাগছিল। নেশার ঘোরে খারাপ লাগছিল না। অ্যাকশন এরিয়া থ্রির কাছে টায়ার পাংচার। ট্যানিয়া গাড়িতেই। আমি স্টেপনি লাগাতে ব্যস্ত। কে রড দিয়ে মাথায় মারে। ট্যানিয়ার চিৎকার শুনতে পাই। তারপর কিছু মনে নেই"

"এটা আপনাদের মিডিয়ার গল্পের মতো শোনাচ্ছে না?"

"বিশ্বাস করুন এটাই সত্যি"

"ট্যানিয়া অজ্ঞান হল কী করে?"

"বলতে পারব না। তারপর কী হয়ছে জানি না"

"বিশ্বাস করতে পারছি না"

"ট্যানিয়াকে বিশ্বাস করছেন, বিকস সি ইজ দ্য ভিক্টিম। আমাকে নয়। আপনার থেকে এক্সপেক্ট করি না। আমি পুরুষমানুষ বলে?"

কথার দৃঢ়তাকে অস্বীকার করতে পারছিল না। পাঁচজনের মধ্যে বাকি দু-জন। কেউ তো অস্বীকার করছে না, ওরা দুজনে একসঙ্গে ছিল।ড্রিঙ্ক করলেও ট্যানিয়া বেহুঁশ ছিল না। মানে মনোময়কে যে মাথায় বাড়ি মেরেছে, সেটা না মনে থাকার কথা নয়। ট্যানিয়া তাহলে আরও কিছু জানে যা বলেনি। সেটা কী?

চোদ্দো

সীমা জিজ্ঞেস করল “রের্কডিংটা ক্যানসেল করে দিলে?”

“আমার দ্বারা এ সিডি সম্ভব নয়”

“কেন?”

“তোমার জেনে কী হবে?” জয়ন্তর কথায় বিরক্তি।

ভালোমানুষ মুখোশটা খসে পড়ছে। অসহিষ্ণু। বাজারে ভাটা বলে? না বাবার মৃত্যুর শোক? সীমা বুঝতে পারছে না। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই খামখেয়ালি। এত খরচা করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। শেষরক্ষা হল না। অভিষেক সরকার চলে গেলেন। মা অনেক আগেই গেছেন। বাবার হাত ধরেই বড় হওয়া। সংগীত শিক্ষা থেকে বহির্জগৎ। বাবাই ছত্রপতি। তাঁর অন্ত্যেষ্টি, না তার সংগীতের। টানাপোড়েন থেকেই খামখেয়ালিপনা। জয়ন্ত বরাবরই মুডি। ইচ্ছে হলে সুর ভাঁজবে। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে মুডি দেখেনি। পরিণতিতে ওদের জুটির বাজারে নাম-ডাক। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে সে অনেক বেশি দৃঢ়।

লেক প্লেসের বাড়ির পর্দা টানতেই সোনাঝরা সকাল। মনে পড়ে গেল, ফুলশয্যার পরের দিনের কথা। ঘুম থেকে উঠে পর্দা সরিয়ে যখন জীবনের নতুন সূর্যকে দেখছিল, হঠাৎ দরজায় টোকা। শাড়িটা ঠিক করে দরজা খুলতেই চায়ের কাপ হাতে অভিষেক সরকার।

“পরের বাড়ি। রাতে ঘুম হয়েছে তো মা?”

ঘোমটা টেনে প্রণাম করতে লজ্জায় লাল “এমা, আপনি কেন?”

“তুমি আমার মেয়ে তো। বাড়ির লক্ষ্মী। একটু সেবা করতে দাও। তোমার শাশুড়ি বেঁচে থাকলে উনিই করতেন”

চায়ের কাপটা নিয়ে সীমা বলেছিল “ভেতরে আসুন বাবা”

“না না, তুমি চা খাও। দেখি খবরের কাগজ এল কি না”

রেখে গেল মানবিকতার ছোঁয়া। সেদিনের মতো আজও সোনালি আভা জানলার ফাঁকে। সেদিনের মতো। খাটে জয়ন্ত। নেই শুধু অভিষেক সরকার।

ভেজা এলোচুল পাখার তলায় মেলে জয়ন্তকে বলল “এমন কী হল যে সিডি করবে না?”

বিনা উত্তরে তোয়ালে কাঁধে বাথরুমে “স্নান করে আসি”

হতভম্ব সীমা। স্বাভাবিক সৃষ্টিশীল মানুষ খ্যাপাটে। কিন্তু এখন দুনিয়ায় সেটাই সব নয়। জীবিকাও। কম বয়সে হুটহাট অনেক কিছু করে ফেলা গেলেও প্রফেশানাল লাইফে সম্ভব নয়। ভেবেচিন্তে সন্তর্পণে এগোতে হয়। জয়ন্ত এখন জবাব দেবে না। চাপ দিলে, চিৎকার-চেঁচামেচি করবে। এমনিতে শান্ত। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলে বেসামাল। একা থাকতে দেওয়াই ভালো। কালকের রান্না বার করে মাইক্রোওয়েভের সামনে রাখল। আজকাল রোজ রান্না করার সময়ও পায় না। যেদিন প্রোগ্রাম থাকে না, কয়েকদিনের রান্না করে ফ্রিজারে রাখে। সময় না পেলে ভজহরি মান্না বা ৬ বালিগঞ্জ প্লেস। সুইগি ডেলিভারি দেয়।

মা বলত "মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্, শুধু গান-বাজনা করলেই চলবে? ঘরের কাজকম্মও করতে হবে"

"বিয়ের পর দেখা যাবে। কটা মেয়ে বিয়ের আগে রান্না জানে?"

"আমাদের যুগে মেয়ে বড় হলেই ঘরের কাজের সঙ্গে রান্না শেখানো হত। তখন অবশ্য এত দোকানপাট ছিল না। চাইলেই রেডিমেড খাবার মিলত না"

"তোমাদের যুগটা অন্য ছিল মা। জীবনের বেশিরভাগটাই হেঁসেলে। আজ অত সময় কারও নেই"

"রান্না না জানলে ভালো পাত্র জুটবে না" মায়ের আক্ষেপ।

মায়ের কথার গুরুত্ব দেয়েনি। নিয়মের প্রথাগুলো জোলো, অর্থহীন। মা ধরেই নিয়েছিলেন, বিয়ে হবে না। মেয়ে কলেজে পড়ে। অথচ ছেলেবন্ধু নেই, ছেলেদের ব্যাপারে আগ্রহ নেই। অস্বাভাবিক।

যখনই সম্বন্ধ এনেছে উড়িয়ে দিত "এখন নয়"

চিরকালই কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে যাবে। ঘরের কাজ না করুক, গান নিয়ে থাক, বিয়েতে বাধা কোথায়? বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। সোমত্ত মেয়ে, সারাজীবন আইবুড়ো থাকবে। প্রেসিডেন্সি থেকে বটানি, পড়াশোনার পাটও শেষ। বাড়ি, অ্যাকাডেমি আর রেওয়াজ। এই নিয়েই চলছিল।

একদিন যখন বলল "জয়ন্তকে বিয়ে করতে চাই" জয়ন্ত কে, না জেনেই ধড়ে প্রাণ এল। ডানপিটে মেয়েটা যে কাউকে পছন্দ করতে পারে...

"জয়ন্ত কে? আনিসনি তো আগে"

"সুরকার। তেমন নামডাক হয়নি"

আবার সংশয়। সংসার চলবে কী করে? যেন পাড়ার রকের কাউকে দাঁড় করিয়ে বলছে "তোমার জামাই"

টিঙ্কুর কথা মনে হতেই রুমাকে ঠাট্টা করেছিল "আগেভাগে বিয়ে দিয়ে দে। নইলে দেখবি, কোনদিন এক মহাকালুয়াকে বিয়ে করে এনেছে"

"তাতে আপত্তি নেই। ভয় একটাই। কোনও মেয়েকে বিয়ে না করলেই হল। দিনকাল যা পড়েছে"

হাসি চাপতে পারেনি। যুগ যেদিকে ‘এগোচ্ছে’। ভাগ্যিস ছেলেপিলে নেই। তাহলে সাধনা ছেড়ে ওদের পেছনে পড়ে থাকতে হত।

মাকে বলেছিল “লেক প্লেসে ওদের নিজের বাড়ি। একমাত্র ছেলে। ওর বাবার নাম তো তুমি জান” মা উৎসুক “প্রখ্যাত সুরকার অভিষেক সরকার”

“হলেই বা প্রখ্যাত। ছেলে তো কিছু করে না”

প্রচ্ছন্ন আপত্তি। আশ্বস্ত করতে বলেছিল “করে না তো কী? একদিন করবে”

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আইএএস হলেও কথা ছিল। নিদেনপক্ষে ম্যানেজমেন্ট, উকিল, বা প্রফেসার। আজকাল অবশ্য শুধু মাস্টারি করে সংসার চলে না।

রাতে বাবাকে বলেছিল “মেয়ে বিয়ে করতে চায়”

“ভালোই তো”

“ভালো? গান-বাজনা ছাড়া ছেলে যে কিছু করে না। সিনেমায় সুর দেয় অভিষেক সরকার। ওরই ছেলে”

কস্টিং পাশ করে শিয়ালদহের অ্যাকাউন্টস অফিসে সারাজীবন কাটিয়ে দিল। শিক্ষিত মেয়ে যদি সুরকার, নেতা-মন্ত্রী বা বেকারকে বিয়ে করতে চায় কী বলবে? বাধাই বা দেবে কী করে?

“ঠিক করে ফেলেছে?”

“মোটামুটি” দেশে ধারাবাহিক উপন্যাসটা পড়তে লাগল। এসবে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যা হওয়ার তা হবে। নিয়তি কেন বাধ্যতে। বাক্যব্যয়ে লাভ নেই। মেয়ে যদি চোর-গুন্ডা-বদমাস বিয়ে করে কী-ই বা করার? “চুপ করে আছ যে?”

“কী বলব? বললেই কী কিছু পাল্টাবে? কাল সকালে ওর ছকটা বার কোর। আরেকবার দেখব। কথাও বলব”

এই লোকটাকে নিয়ে পারা গেল না। খালি ছক, ভাগ্য, ভবিতব্য। এই নিয়েই আছেন। কী কুক্ষণে যে মেয়ের জন্ম দিয়েছিল, কে জানে? বরাবরই দেখেছে, উনি কোনও ব্যাপারে জোর খাটান না। বিশ্বাস করেন না, সেভাবে কিছু হয়।

কে সারা সারা, হোয়াট উইল বি, উইল বি।

মেয়ের কপালে যা আছে, তাই হবে। বিয়ের জন্য তো কম সম্বন্ধ আনেনি। মেয়ে বিয়ে করল? ছোটাই সার। আজ যখন চাইছে, করবে। সে বিয়ে সুখের না দুঃখের, পরে সচ্ছলতা না দারিদ্র, কে বলতে পারে? দাপাদাপি ছাড়া, ভবিতব্যকে পাল্টানো না-মুমকিন।

পরের দিন সকালে, ছক নিয়ে। মেষ লগ্নের মেয়ের সপ্তমে তুলায় নিজের ঘরে শুক্র। দ্বিতীয়াধিপতি শুক্রের ঘর। প্রেম করেই বিয়ে। আর্থিক খারাপ নয়। মেয়েকে বলল “মা বলছিল, তুই বিয়ে করতে চাস?”

“হ্যাঁ, বাবা”

“ছেলেটিকে তোর পছন্দ?” নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

“ভালোভাবে ভেবে দেখেছিস তো?”

“গান ভালোবাসি। ও একই লাইনের। খুব ভালো সুর দেয়। দুজনে জুটি বাঁধলে কোথাও দাঁড়াতে পারব”

“না পারলে সংসার চলবে কী করে?”

“গান শিখিয়ে কোনও রকমে চলে যাবে”

“তুই খুশি হস, এটাই চাই। যদি মনে হয় ওকে নিয়েই হবি, আপত্তি নেই”

অভিষেক সরকারকে জয়ন্ত কী বুঝিয়েছিল, সীমা জানে না। একমাত্র মাতৃহীন ছেলেকে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিত। পারিবারিক অসংগতি থাকলেও বুঝতে দেয়েনি। আশীর্বাদ করে গেছিল সীমাকে।

এক গোধূলিতে জয়ন্তর পরিবারে। নিবিড় আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল অভিষেক সরকারের সঙ্গে। তাকে সব দিক দিয়ে বরণ করেছিল স্বনামধন্য সুরকার। শুধু গয়না দিয়ে আশীর্বাদই করেনি, প্রথম সিডির কন্ট্র্যাক্টটাও উপহার দিয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীত। বিশ্বভারতীর অনুমোদন, ট্রেইনার, রের্কডিং - স্বপ্ন বাস্তবে। পরে নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত থেকে জীবনমুখী-মরণমুখী। বাংলা থেকে হিন্দি। রিমেক থেকে রিমিক্স। টাকা রোজগারের সহজ পথেই হেঁটেছে। খ্যাতির শিখরে ওঠার সোজা সিড়ি।

জয়ন্ত বলেছিল “তুমি রোজগার কর। আমাকে সৃষ্টি করতে দাও”

বাধা দেয়নি। থাকুক ওর পৃথিবীতে।

অভিষেক সরকার ভাতে ডাল মেখে বলেছিল, “আজকালকার গান করছ। রেওয়াজটা কিন্তু চালিয়ে যেও। একদিন দেখবে এই গান হারিয়ে যাবে। রেওয়াজের রেশ তখনও বেঁচে থাকবে নতুন সৃষ্টিতে”

“আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। রেওয়াজ রোজই করি। আজকালকার সুরগুলো রেওয়াজি গলার সঙ্গে খাপ খায় না”

“যুগের হুজুগ। আমার জীবদ্দশায় পালটাবে না” দুঃখের আঁচ কথায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের গরমিলে সুরগুলো উদ্দেশ্যহীন ভেসে যাওয়া নৌকোর মতো। জানে না কোথায় নোঙর ফেলবে।

এটাই কালচক্র। বিথোভেন, চায়কভস্কি, মোজার্ট, স্ট্রস-এর পর পশ্চিমি সুরে ভাটা। পুবেও তার ঝড়। বিশ্রাম, না থেমে যাওয়া? একটা যুগ ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত। জিরিয়ে নিচ্ছে। সেই ডামাডোলে আগামী নিঃশব্দে বাড়ছে। আজান্তে, অলক্ষ্যে। বিশ্রামটাই ধোঁয়াশা। নোঙরছাড়া এক্সপেরিমেন্টের ফুলঝুরি। ধোপে টিকছে না।

সুর যে নেই, তা নয়। সুরটাই আছে, মানুষটা নেই। অথচ সুর মানুষের জন্য। যে সুর বুকে হিল্লোল তুলতে অপারগ, গভীরে প্রবেশ করতে পারে না, তার স্থায়িত্ব ক'দিন? মার্কেটিং দিয়ে কী সৃষ্টি অমর হয়? দু-দিনের নাম কামানো ছাড়া। পুশ-সেলে কিছু বিক্রি। দুনিয়াদারি কী অমরত্বের পথ? সৃষ্টি আর দুনিয়াদারির টানাপোড়নে সৃজন অতলে। হারাচ্ছে আগামীর আশা। তাই রবীন্দ্র, নজরুল, দ্বিজেন্দ্র, অতুল, স্বর্ণযুগের রিমেক রিমিক্স। জানে না কী করে হৃদয়ের গভীরে পৌঁছবে। সব ছাড়িয়ে মাটির কাছাকাছি। বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তনে। লন্ডন পাবের ডিজের বাইরে, অন্তরে।

জয়ন্ত সৃষ্টিরর নেশায় স্বতন্ত্র। ভেসে যায়নি গড্ডালিকা প্রবাহে। সৃষ্টির আনন্দে ধীরে পা রাখছিল সংগীত দুনিয়ায়। অভিষেক সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। ঝট করে কন্ট্র্যাক্ট নেয় না। তাই সিডির কন্ট্র্যাক্ট ক্যানসেলে সীমা আশ্চর্য।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে, চুল আঁচড়াতে গিয়ে বলল "এতটা নামিনি যে নিজেকে বিক্রি করতে হবে"

"বিক্রি করবে কেন? গানে সুর দিয়েছ। মৌমিতা গাইবে বললে"

"মৌমিতাই গাইবে। রেকর্ড কোম্পানি মলয়ের ভাষাটাকে প্রচারধর্মী করতে বলছে। নিশ্চয়ই নেতার চাপে। সাহিত্যের মধ্যে স্লোগান আমার জনরে নয়"

"নাম করতে গেলে একটু তোষামোদ করতেই হয়" জয়ন্তকে বোঝাবার চেষ্টা "একটু ভাষা পাল্টালে যদি কেউ একটু খুশি হয় আপত্তির কী আছে?"

"ভাষা পাল্টানোটা বড় নয়। সুরের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্যটাই প্রধান। আমি চাই না, সৃষ্টির স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করুক"

"তোমায় বুঝতে হবে, এ বাজারে কিছু করতে গেলে মানতেই হবে। নইলে পিছিয়ে পড়বে"

"শেখানো বুলি আওড়ালে। এমনিতেই পিছিয়ে পড়ব। লোকে বলবে, জয়ন্ত সরকার পুরানো কথা প্যানপেনিয়ে বলছে। এটা অন্যায়। তাকে মানতে বলছ?"

"না মানলে আমাদেরই ক্ষতি। দেবজিৎকে দিয়ে বলাতে পারি। ও বললে, চাপ সাময়িকভাবে সরিয়ে নেবে। পরে অবশ্য অন্যভাবে আসবে"

"দেবজিৎ, মানে রুমার হাসব্যান্ড?"

"হ্যাঁ। ওকে দিয়ে বলালে, কাজ হবে। তবে তা ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়"

"ভবিষ্যৎটা কী হিসেবের অংক? ছক ধরে এগোনো। হিসেব করে চলা। এই অঙ্কে আপাত সাকসেস হলেও টেকে না। যুগান্তকারী নয়। যা কিছু নতুন, সৃষ্টি হয়েছে, কখনও চেনা গতে হয়নি। অনেক দুঃখে গত ভেঙে বেরনোতেই আনন্দ"

মাঝেমধ্যে চলার পথে চৌরাস্তায় থমকে দাঁড়াতে হয়। এরপর কোনদিকে? কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, সেটা বড় নয়। হিসেবটাও আপেক্ষিক। প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাসকে পাথেয় করে জীবনের সার্থকতা খোঁজে। তাতে যদি আপাত পরাজয় আসে, মেনে নিতে হবে। পরাজয়ের মধ্যেই জয়ন্ত শুনতে পাচ্ছে বিজয়ের শঙ্খধ্বনি। সেখানেই তৃপ্তি।

সবাই লড়াইয়ে। কখনও জিত, কখনও হার। হয়ত বেশিটাই হার। কারুর দাক্ষিণ্যে জিত হলে পাওয়ার মাধুর্য ক্ষয়ে যায়। জয়ন্ত যদি এই হারজিতের পরিধিটা নিজের মতো তৈরি করতে চায়, ক্ষতি কী? নাই-বা ওর জীবনদর্শনকে অন্যজনের সার্থকতার পরিমাপের বিচার করল। ও বাঁচুক। নিজের মতো করে।

"যা ঠিক মনে হয়, তাই কর" সীমা রান্নাঘরে ঢুকল।

অস্বস্তিতে জয়ন্ত। ঠিক করছে, না ভুল - কে জানে? বাবা বেঁচে থাকলে পরামর্শ দিতে পারত। অনুপস্থিতিটা প্রবল।

তখনও নাম হয়নি। একদিন হরেনকাকা এসে বললেন "অভিষেকদা, তোমার ছেলেটাকে দাও না। আমার নতুন সিনেমায় সুর দেওয়ার জন্য"

"বেশ তো। তোর যদি যোগ্য মনে হয়, করবে না কেন?"

সুর দিতে গিয়েছিল। নতুন কিছু বাছাই করা সুর। কুমারমঙ্গলম ফিল্মসের প্রডিউসার অমরজিৎ সিং তামিল গানের সিডি ছুড়ে বলেছিল "সুর কিন্তু এরকম হতে হবে"

উঠে বেরিয়ে এসেছিল। পারবে না। কপি করতে পারবে না। সুর হয়ত বাজারে চলবে। কিন্তু সেখানে সে থাকবে না। থাকবে জয়ন্ত সরকারের নামে তামিল গানের রিমিক্স।

বাবা বলেছিলেন "বেশ করেছিস। যা মন সায় দেবে না, করবি না"

সেদিন বাবা ভরসা দিয়েছিলেন। আজ সীমা বলছে যুগের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ঠিক করছে, না ভুল?

"শোনো তো" সীমাকে ডাকল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলল "বল"

"তোমার কী মনে হয়, মেনে নেওয়া উচিত?"

"মানা না মানা, তোমার ব্যাপার। আমি কিছুই বলব না। আজকের যুগে টিকতে গেলে মানা ছাড়া উপায় নেই"

"তুমি কী মনে করো?" জয়ন্ত উৎসুক।

"আমি সাধারণ মেয়ে। হারজিতই বুঝি। অসাধারণ নই যে, গতের বাইরে গিয়ে অমর কিছু করে ফেলব। আমার যোগ্যতা, বিচার-বুদ্ধি আর পাঁচজনের মতো। জেতা-হারার মন্ত্রটুকুই বলতে পারব। তোমায় মানতে হবে, এমন নয়। যাতে শান্তি পাও, তাই কর" ফের রান্নাঘরে।

জয়ন্ত সংগীতের বালুতটে। কোনটা ঠিক? আজ পাশে বাবা নেই যে, পড়লেও টেনে তুলে দেবে। সে সম্পূর্ণ একা। ভবিষ্যতের গতি নিজেকেই ঠিক করতে হবে। একদিকে তালিমের সৃজনশীলতা। অন্যদিকে বাস্তবের সঙ্গে আপস। কোন পথে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, জানে না।

জেতা-হারার মারপ্যাঁচে, ঘূর্ণির আবর্তে। অস্তিত্বটা টালমাটাল। প্রখর আলোতেও খুঁজছে স্বপ্নের ধ্রুবতারা।

পনেরো

নিজের কাছ থেকে পালাতে পারছে না বলেই বিদিশার দোটানা। একদিকে হাসপাতালের ভবিষ্যৎহীন চাকরিতে কঠোর পরিশ্রম। অন্যদিকে অরণির অসহ্য প্যানপ্যানানি। মাঝে নিঃসঙ্গতার মোচড়।

আজ ডিএমএস কান্নান কড়া ভাষায় ধমকেছে "ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। ডোন্ট ট্রাই টু মেডল ইন হসপিট্যাল অ্যাফেয়ার্স। কিপ ইওর ইমোশনস টু ইওরসেলফ। দিস ইজ বিজনেস। উই হ্যাভ টু রান ফর প্রফিট। উই আর এ পার্ট অফ দ্য মেশিনারি"

সত্যিই তো। এ পার্ট অফ দ্য মেশিনারি। কতটুকু মানুষ এই যন্ত্রে? জানা নেই। মানুষের সেবার নামে আরেক খেলা। টেকার খেলা। সেবার নাটক। সার্থকতা, না পরিপূর্ণতা?

কো-রেসিডেন্ট জয়তী জিজ্ঞেস করল "আপসেট কেন?"

"চাকরির জন্য চাকরি বলে মানুষটাকে মেরে ফেলতে হবে" বিদিশা হতাশ।

"কী হল?" জয়তী লিপস্টিক ঘষল।

"বিবেক থাকা অন্যায়?" মেনে নিতে পারছে না।

"ওটাকে বেডরুমে বন্দি করে রাখ। বুঝলে, এ হচ্ছে দুনিয়াদারি"

"ক্লান্ত হয়ে পড়ছি"

"তাহলে চাকরি ছেড়ে দাও। আমি বাবা অতশত ভাবি না। কর্তার প্র্যাকটিসে সংসার চলে। আমারটা উপরি। শখ মেটাবার জন্য। ডাক্তারি পাস করে তো আর বসে থাকতে পারব না"

ওর কথায় বিদিশার বুকে আরও শূন্যতা। সার্থকতার মানে খুঁজছে? প্রেম, বিয়ে, বাচ্চা মানুষ করা, চাকরিতে উন্নতি - এগুলো ওর মধ্যে পড়ে না। অনুভূতি নিয়ে স্বপ্ন দেখা, তাকে রূপায়িত করার মধ্যেই কী সার্থকতা "আমার তো সংসার নেই। তাই মেনে নেওয়া সহজ নয়"

"পারনি বলেই সংসার হয়নি। নিলেই হত" জয়তী বেরিয়ে গেল।

কত নির্মম মানুষ। থাপ্পড় মেরে চলে যায়। ফিরেও দেখে না মনের অবস্থা। অত সময় কই? সব স্বার্থের অঙ্কে বাঁধা। সামাজিকতার ভূষণে পরিবেশন। জাস্টিফাই করতে গতের বুলি 'এর নাম দুনিয়াদারি'। জয়তীও তাই করেছে। সুবিমলও। সবাই করে। জীবনধর্ম।

বিদিশাকে ভোগ করে সুবিমল নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখন ইংল্যান্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। লিপিকার বিয়ের পরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শুনেছে সুবিমল স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে দিব্যি সুখে। ওর

ভালোলাগাকে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিষ্পেষণের কথাও বোধহয় ভুলে গেছে। মনে থাকলেও তা অপ্রাসঙ্গিক। বিদিশা ভুলতে পারেনি। তাই কান্না চেপে, হাসিমুখে ‘সভ্য’। দুনিয়াদারি বৈকি। জয়তী জানে না, দুনিয়াদারির ভাষা ও ভালোই জানে।

সুবিমল হাউজ-সার্জেনশিপ শেষ করে বিদেশে। বিদিশা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ওর উপস্থিতি গলায় মাছের কাঁটার মতো। সুবিমলের বিদায়, লিপিকার বিয়ে - ছোটবেলার ইতি। মনে হয়েছিল, অতীতকে ভুলে বর্তমান আঁকড়ে বাঁচবে। আপেক্ষিকভাবে মুছে গেলেও, গভীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। বাঁচতে হবে। নতুন জীবনে। সেই জীবনের প্রথমভাগে যৌবনের দূত অনুরূপ। মেডিক্যাল কলেজে তার থেকে বছর দুয়েকের বড়। ফ্রেসারস ওয়েলকামে প্রথম দেখা। পরে কলেজ ক্যানটিনে। পুটিরাম থেকে কুমারস ক্যান্টিনে ঘনিষ্ঠতা। ভালো ছাত্রী হওয়ার জন্য, না যৌবনের আকর্ষণ, বিদিশা জানে না। বিউটি অ্যান্ড ব্রেন।

অনুরূপদাকে বলত “চল না অনুরূপদা, হিন্দ সিনেমায়। নুন-শোতে ভালো সিনেমা চলছে”

“ক্লাস করবে না?” অনুরূপ আবাক।

“সেই তো প্যাঁচপ্যাচানি। শুনে কী হবে? সন্ধেবেলা ওয়ার্ডে কেসটা দেখিয়ে দিও”

নুন-শো থেকে ইডেনের প্যাগোডায়। দিনশেষে অনুরূপের বুকে মুখ, স্তন মেলে আঁকিবুকি। উষ্ণতা বুক থেকে ঠোঁটে। এখন আর সে সুবিমলদা-লাঞ্ছিত অসহায় নয়। পূর্ণযৌবনা, মেডিক্যালের কৃতী হার্টথ্রব বিদিশা মুখোপাধ্যায়। যার সান্নিধ্যের আশায় কত ছেলেই হাপিত্যেশ বসে। একটু ছোঁয়া, কাছে পাওয়া। যদি-বা একবার ফিরে তাকায়। মেডিক্যাল কলেজের রানি। ডাক্তারি ছাত্রীরা সাধারণত সুন্দরী নয়। সুন্দরীর খোঁজে তাই ডাক্তারির ছাত্রদের প্রেসিডেন্সি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ। একটা পদ্মফুল পেলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

সেই ছেলেদের ভিড় থেকেই ক্লাসের ছেলে প্লাবন। সরস্বতী পুজোয় ফল কাটার ফাঁকে কাচুমাচু হয়ে বলেছিল “একটা কথা বলার আছে”

“বল” সংক্ষিপ্ত জবাব।

“এখানে নয়। অন্য কথাও” লাজুক প্লাবন সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল।

“চল, কোথাও গিয়ে বসি” কলেজের মেন বিল্ডিং থেকে কেমিস্ট্রি ডির্পাটমেন্টের সিঁড়িতে। ক্লাসের ছেলে। আপত্তি করেনি বিদিশা। কোণার সিঁড়িতে বসে বলেছিল “এবার বল”

“তোর প্রেমে পড়ে গেছি” প্লাবন তোতলাচ্ছে।

“জানি” বিদিশা নির্লিপ্ত।

সব কথার যবনিকা টেনে দিয়েছে। ওর সোজাসাপটা জবাবে চুপ। বুঝতে পারছিল না কী বলবে। ওর মধ্যে আবেগ আশা করছিল। পায়েনি বলেই ঢোঁক গিলে কিছু বলতে গিয়েও চুপ। অপেক্ষায়। যদি ও কিছু বলে। বিদিশাও চুপ। ভাষাহারা প্লাবন মনের প্লাবনে শব্দ খুঁজছে।

"আর কিছু বলবি?" বিদিশা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

"তুই আমায় ভালোবাসিস না?"

"না" সংক্ষিপ্ত জবাব।

এরপর আর কোনও কথা হয় না। প্রশ্ন করা যায় না। ভালোবাসা তো কথার ভিত্তিতে হয় না। একান্ত ব্যক্তিগত। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না। একতরফা হলে দুর্ভাগ্য। কখনও একতরফা কেন আলোড়ন তোলে কেউ জানে না। জানলে জাগতিক গতে ফেলে দেওয়া যেত। বিদিশাও এর শিকার। সুবিমলকে ভালোবেসে, সতীত্ব বিসর্জন ছাড়া কিছুই হয়নি। একটা চেতনা পাথর হয়ে বুকে। পাওয়া বা হারানো। তা নিয়েই বাঁচা। প্লাবন ভালোবেসে কিছুই পাবে না। বিরহের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঁচবে। এক গোধূলি লগ্নে লাল টুকটুকে বেনারসি পরা বউকে জীবনসঙ্গিনী করে সাংসারিক খেলা খেলবে। দায়বদ্ধতা, সামাজিক আচারের মধ্যে বাঁচার সার্থকতা খুঁজবে। থাকবে না স্বপ্ন অপ্সরা। অন্তরের গভীর ব্যঞ্জনা। বিরহের মধ্যেই সৃষ্টি। বিরহের ব্যথা চোখে পড়লেও অন্য পরিপূর্ণতা চোখ এড়িয়ে যায়। এই বিরহ-পূর্ণতার মাঝেই তো সৃষ্টির বীজ। এগোবার পথ। বাঁচার মন্ত্র।

দাঁড়িয়ে বলেছিল "জানি, তুই আমায় ভালোবাসিস। আমি বাসি না। কী করব বল্?" উঠে এসেছিল।

পরে বাবা-মা বিয়ের পিড়াপিড়িতে উত্তর শুধু 'না'। ভালোবাসা নিভৃত গভীরে নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি। যা দুনিয়া পাল্টাতে পারে। চলার মোড়কে ঘুরিয়ে দিতে পারে। শুনতে হবে গভীরে ঢুকে। ক'জন শুনতে পায়। সবাই শোনে সামাজিক বলয়ের মধ্যে বাঁচার ঝংকার। নিঃশব্দেই তো বনলতা কাছাকাছি। আপন, একাকী, অলক্ষ্যে।

বিদিশা আজও জানে না, কী পেয়েছিল অনুরূপের মধ্যে। নইলে স্তাবক ভেড়ার দল থেকে কেনই বা প্রশ্রয় দিয়েছিল। উচ্চ-মাধ্যমিকে চতুর্থ, মেডিক্যালের কৃতী ছাত্র, ফিল্ম ক্রিটিসিজমে পারদর্শী বলে? যে কারণেই হোক তুলে নিয়েছিল ঢাকুরিয়ার ঝিল রোডের অনুরূপকে। কলেজের ইউনিয়ানের পান্ডা। যার অঙ্গুলি হেলন কলেজের সর্বত্র। কৃতী যখন নেতা সবাইকে চড়িয়ে খাওয়া সংস্কারে। বিদিশা কী সেরাকে বশ মানাতে বদ্ধপরিকর?

বিদিশাকে বলেছিল "ইলেকশনে আমাদের পার্টির হয়ে দাঁড়াবে?"

যেন হুকুম করছে। এ তো আর প্লাবন নয়। ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম।

থতমত বিদিশা “পলিটিক্সের কিছুই বুঝি না”

“বোঝার দরকার নেই। তোমার পপুলারিটি আছে। দাঁড়ালেই হবে। বাকিটা সামলে নেব” ক্যান্টিনেই আদেশ।

বলতেই পারত ‘না। পলিটিক্স নিয়ে মাথাব্যথা নেই' সুবিমলদার মুখটা ভাসতেই বলল “ভেবে দেখি। পরে বলব”

বেরিয়ে যেতে লক্ষ করেছিল অনুরূপদার চোখ ওকে গোগ্রাসে গিলছে। একবার তার মুখ, একবার বুক, একবার পাছায় ঘোরাফেরা করছে। মানে মজেছে। জাল ফেললে খেলিয়ে দেখা যেতে পারে। এমন মওকা আসবে না। যখন অনুরূপদা নিজে যেচে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। যেতে যেতে বলল “কাল বিকেলে স্বর্ণময়ী হস্টেলে এস। বলে দেব”

সময় নষ্ট করেনি। বেশিক্ষণ থাকলে, অনুরূপদার চোখ দুটো তাকে উলঙ্গ করে ছাড়বে। ঘরে এসে ভেবেছে, অনুরূপদা ভালো স্টুডেন্ট। কালচারালিও নামডাক আছে। পলিটিক্সে কেন?

সুবিমলদাও ভালো ছেলে ছিল। একা ঘরে অনিচ্ছায় সঁপে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। এখন সুবিমলদা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিছু করতেও পারবে না। অনুরূপদা এখন নাগালে। তার মধ্যেই আক্রোশের পূর্ণতা। ছোটবেলায় কবিতা লেখার শখ ছিল। আবেগে অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছিল। দু-একটা শুনিয়ে দিলে গণতন্ত্র মাথায় তুলে লটকে যেতে পারে।

পরের দিন বিকেলে অনুরূপদা স্বর্ণময়ী হস্টেলের রেলিং ধরে ইডেন হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে বলেছিল “কী ঠিক করলে?”

“ওসব আমার দ্বারা হবে না অনুরূপদা। নেতাগিরি আমার রক্তে নেই। ওসব তুমি কর। আমায় বরং কুমারস্ ক্যান্টিনে খাওয়াও” হাল্কা নীল চুড়িদারে ভুবনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে বলেছিল “কী, খাওয়াবে না?”

“নিশ্চয়ই। এখন যাবে?”

“বেশ তো, চল না। এখন ফ্রি। অরুন্ধতী সোমেনের সঙ্গে প্রেমে ব্যস্ত। গ্যাঁজাবার লোকও নেই”

কুমারস্ ক্যান্টিনে চিকেন কবিরাজিতে কামড় দিয়ে বলেছিল “এসব গণতন্ত্র করে কী হবে? পড়াশোনা। বাকিটা ফুর্তি”

ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয়নি। রাতে শুয়ে ভেবেছিল কী হবে বিদিশাকে ইলেকশনে জড়িয়ে। তার থেকে দিনে অন্যদের নিয়ে উন্নতির বুলি আওড়ে বিকেলে গঙ্গার পাড়ে ওর সঙ্গে হাওয়া খেলেই চলবে। যখন ইঙ্গিত দিয়েইছে। বিদিশার মতো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বিদুষীকে নিয়ে ঘোরা কম ভাগ্যের! নিজে যখন এসেছে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

অনুরূপদার সান্নিধ্য ছাড়াও ওর প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার টেকনিকও বিনা পরিশ্রমে রপ্ত করে ফেলতে পারবে। যদি নোটগুলো ম্যানেজ করতে পারে, কথাই নেই। কম খেটে বাজিমাত। পরিবর্তে একটু সান্নিধ্য। কলেজে ঢোকার পর জানতে দেরি হয়নি মেডিক্যাল কলেজের ট্র্যাডিশন। সিনিয়াররা সব সময় জুনিয়ারদের খাওয়ায়। অনুরূপদা ওর হাত ধরে কোথায় পৌঁছতে চেয়েছিল? জানে না। কিন্তু বিদিশার তরতাজা দেহের নিবিড় স্পর্শে ওর উষ্ণ ঠোঁটের গভীর নিষ্পেষণে গণতন্ত্রের রং ভুলে গেছিল। জিন্দাবাদের রং কখন উত্তপ্ত দেহের নরম ছোঁয়ায় গলে জল, বুঝতেও পারেনি। শুধু বিদিশাকে চাওয়া, দেওয়া। অখণ্ড নোটসের সমারোহ। বিদিশা কী শিখেছিল জানে না। অনুরূপদার লেখনভঙ্গি নতুন আলোর দিশা দেখিয়েছিল। যার প্রতিফলন পরীক্ষার পাতার অনুষ্টুপ ছন্দে। বিদিশার দীক্ষা পৌরুষকে জয়ের নতুন কৌশল। এখন আর সুবিমলদার হাতের পুতুল নয়। সে বড় হয়ে শিখেছে পুরুষকে নিয়ে তিনপাত্তির খেল। তার শিক্ষাগুরু। যার হাত ধরে মানুষ জয়ের খেলা।

বিবেকানন্দ পার্কের নিভৃত অন্ধকারে, বিদিশা যখন আবেগে অনুরূপদার বুকে, সে প্রশ্ন করেছিল "আমায় ভালোবাসো?"

জবাব দিতে পারেনি। ভালোবাসা কী? কারুর জন্য মন কেমন করা, না বুকের বোতাম খুলে বিবস্ত্র উন্মাদনা? বিদিশাও তো সুবিমলদাকে ভালোবেসেছিল। পরিণামে দেহের টানে ভালোবাসার নৈরাজ্যে। দেহ বাদ দিয়ে ভালোবাসা নয়। মনের ইচ্ছে যেখানে গৌণ, খিদেটাই মুখ্য, তাকে কী বলবে।

অনুরূপদার প্রশ্ন "জবাব দিলে না তো?"

ব্যঙ্গ করেই বিদিশা বলেছিল "কেন আমার সঙ্গ ভালো লাগছে না?"

"কেন লাগবে না?"

অনুরূপদার ঠোঁটে বিদিশার ভেজা ঠোঁট। সব প্রশ্নের জবাব দিতে নেই। যেখানে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, নারীর তো দুটি অস্ত্র। অহং দেখিয়ে সিন থেকে সরে যাওয়া। নইলে দেহের প্লাবনে কথার আবেগকে রুদ্ধ করা।

বিদিশার উষ্ণ স্পর্শের খেলা পৌরুষকে জাগিয়ে দিয়েছিল। কম বয়সে অন্ধকার মাঠে লুকোচুরি খেলা। পেয়েও, অসম্পূর্ণ। রবিবারের দুপুর। কিছু নোটস সংগ্রহের জন্য অনুরূপদার ঝিল রোডের বাড়িতে। ও একা, জানা ছিল। নীল লেভিস জিনস, সাদা টপস, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। পাজামা-পাঞ্জাবিতে অনুরূপদা দরজায়।

"চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?

"ঢাকুরিয়ায় নেমে শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড ধরে রিক্সায়"

বিদিশা অনুরূপদার পড়ার ঘরে "নোটস খুঁজছো? তোমার জন্য ওগুলো আলাদা করে রেখেছি"

সেগুলো সন্তর্পণে ঢুকিয়েছিল শান্তিনিকেতিনি ঝোলায়। অনুরূপদা চেয়েছিল ওর ভরা নিতম্বে। চাপা জিনসের তলায় প্রকট। বেডরুমের দিকে এগিয়ে বলেছিল "এসি নেই? ভীষণ গরম" রুমাল দিয়ে ঘাম মুছেছিল। অনুরূপদা ফ্যানটা বাড়িয়ে দিল। টপসটা ঘামে ভিজে। পরে থাকলে সর্দি লাগবে। বোতাম খুলে বলেছিল "ওসব ফ্যান-ট্যানে কিছু হবে না। যা গরম পড়েছে"

টপসের তলায় পিঙ্ক ব্রা। উত্তেজনার পারদ বাইরের তাপমাত্রা অতিক্রম করছে। জিভটা ঠোঁটে বুলিয়ে পা ফাঁক করে পাখার নীচে খাটে। হাঁটু দুটো কাছে আনছে, আবার সরিয়ে ফেলছে। ফাঁক দিয়ে ভরাট পিউবিস দেখে অনুরূপের পাজামার নীচে আন্দোলন।

বিদিশা সিলিং ফ্যানে চেয়ে "লেভিসের জিনসগুলো বড্ড মোটা। বিদেশেই চলে। দেশের গরমে হাঁসফাঁস নাভিশ্বাস"

জিনসের বাকলটা নামিয়ে দিয়েছিল। সুতির প্যান্টির নীচের বলিষ্ঠ উচ্চতা দেখে ঠিক থাকতে পারেনি অনুরূপ।

ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিদিশার ভুবনমোহিনী হাসি "জামাকাপড় পরেই?"

দেরি করেনি। পাঞ্জাবি-পাজামা খুলতেই কালো আন্ডারওয়ারের তলায় পৌরুষ আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ফুঁসছে। এবার বলি হতে হবে ওর পৌরুষের কাছে। সুবিমলদার মুখ, ওর রক্তাক্ত নিষ্পেষণ ভেসে উঠল। কিশোরী ভালোবাসার দুর্বলতায়, অনভিজ্ঞতায়, দেহশক্তির অক্ষমতায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারেনি। আজ কোনও ভালোবাসা নেই। অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সেদিনের মতো অক্ষম নয়।

আন্ডারোয়ার নামিয়ে ওর দিকে এগোতেই খাট থেকে উঠে পড়েছিল। নিশ্চয়ই বাকি সুতি বিসর্জনের প্রস্তুতি। ওকে যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভাসাতে আগ্রহী। কাম যতক্ষণ পর্যন্ত ওর উরুদ্বয়ের ফাঁকে ঢালতে পারবে পরিত্রাণ নেই।

বিদিশা ট্রাউজার-টপস পরে ফেলল।

"একি! আসবে না?"

"কী পেয়েছ আমাকে? রাস্তার মাল। জাঙ্গিয়া খুললেই পা ফাঁক করে শুয়ে পড়ব?"

"তুমিই বললে খুলে ফেলতে"

"বেশ করেছ। তা বলেই কী শুয়ে পড়তে হবে? যাও, যাও, বউবাজারের হারকাটা গলিতে অনেক পাবে। কলেজের মেয়ে নিয়ে লটঘটের চেষ্টা কর না"

"আমার যে তোমাকেই চাই"

“চাইলেই পাওয়া যায় না। যদি ভেবে থাক তোমার প্রেমে ডগমগ হয়ে প্যান্টি খুলে শুয়ে পড়ব, ভুল করেছ। সস্তার মেয়ে নেই”

রাগে, অপমানে, উত্তেজনায়, কাঁপছে অনুরূপ। পারলে ওকে থাপ্পড় মারে। মেয়েটা খেলতে এসছে। এই স্টেজে অরগ্যাজম ছাড়া পরিত্রাণ নেই। মেয়েটা কি না বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টা-টা বাই-বাই করছে। উলঙ্গ ওর দিকে এগোতেই ক্ষিপ্ত বিদিশা “না, অনুরূপদা, না। কাছে আসবে না। এলে চেঁচাব। পাড়ার লোক জমে যাবে। তোমার জামাকাপড় পরা নেই, আমার আছে। আমাকেই বিশ্বাস করবে। রেপ কেসে ফঁসিয়ে দেওয়া বড় ব্যাপার নয়”

এ কী মেয়ে রে বাবা! উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ, মেডিক্যাল কলেজের ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট অসহায় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। শান্তিনিকেতনি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল “চলি অনুরূপদা। নোটসের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ”

বাইরে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ বিদিশাকে ছুঁচ্ছে না। ঘামে ভিজে গেলেও, অত গরম লাগছে না। ভেতরটা তুষারের মতো হিম। কে যেন ভেতরে এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে দিয়েছে। অনুরূপদা, সুবিমলদা নয়। আরেক কৃতী। সেদিন ডুকরে কেঁদেছিল। আজ ও উত্তেজনায় অসহায় কাঁপুক। পাশের পানের দোকানে রবীন্দ্রসংগীত।

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়াল

ষোলো

গঙ্গোত্রীর মন্দিরটা দূর থেকে সাদা ঝকঝকে। চারপাশের পাহাড়গুলো ঠিক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মন্দিরটাকে কোলে টেনে নেবে বলে। দুরন্ত গতিতে বয়ে চলা কিশোরী গঙ্গা গান গেয়ে লাফিয়ে দৌড়চ্ছে পাহাড়গুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে। দেবজিৎ আকাশের দিকে চেয়ে। অদ্ভুত নীল। মাঝেমাঝে এক চিলতে মেঘ। ঝকঝকে, জ্বলছে সুদর্শনের চূড়ায় বরফের মুকুট। সামনের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ফাঁকে লুকিয়েছে। ওই রাস্তা ধরেই যেতে হবে গোমুখ। যেখানে সুরধুনী গঙ্গার শুরু।

পুলওভারের হাতা সরিয়ে সময় দেখল। ছ'টা এখনও বাজেনি। হাড় জমানো ঠান্ডা। মাংকি টুপিটা ভালোভাবে এঁটে নিল। মাফলারটা গুছিয়ে গলায় জড়াল। ঠান্ডাটা আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরেছে। রুমাকে স্কুল কামাই করে ওকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। মন্ত্রীরা হাপিত্যেশ করবে। ঘনঘন ফোন, খবর নেওয়ার আজুহাত। অষ্টপ্রহর লোকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মানুষের ধর্ম। দেবজিতের মধ্যে মানুষটাকে কেউ দেখছে না। শুধু আবরণটাকে। মুখ্য আমলা দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ক্ষমতাবান। মন্ত্রীমণ্ডলে বিচরণ। এ হেন লোক দিনকে রাত করতে পারে। ওকে সেলাম করবে না তো কাকে? মানুষ দেবজিৎকে দেখার সময় কোথায়? তাকে সেলাম করেই বা কী হবে? তাদের উদ্দেশ্য 'মানুষ'টাকে দিয়ে সফল হবে না। বরং মুখ্য আমলাকে দিয়েই হবে। কেউ কুশলের আশায়, কেউ বা হামদর্দি দেখানোর অভিপ্রায়ে। ভদ্রতার খাতিরে কয়েক মিনিট হলেও কথা বলতে হবে। অর্থহীন হলেও এটাই সামাজিকতা। ধান্দার দুনিয়াতে হিসেব বুঝে নাও। তাই মুখ্য আমলা এই লৌকিকতা থেকে বেরিয়ে পড়ে অক্সিজেন খুঁজতে।

"চলিয়ে সাব, রাস্তা খতরনাক হ্যায়" গাইড সুরবীর সিংয়ের ডাক।

"চল" কাঁধে র‍্যাক্স্যাক তুলে পা বাড়াল।

খতরনাক রাস্তায় চলায় আলাদা মাদকতা। সামনে কী জানে না। দরকারও নেই। শুধু হেঁটে চলা। মাঝে চড়াই-উতরাই তো থাকবেই। গন্তব্য একটাই। ফাইন্যালি টু গ্রেভ। যদি সকলে বুঝত। তবে হানাহানি অসূয়া অহং ফেলে ধ্রুবতারা ধরে এগোতে পারত। চলার মধ্যে যতটা সার্থকতা আছে, গন্তব্যে পৌঁছনোর মধ্যে অতটা নেই। ধ্রুবতারা শেষ দেখায়। মাঝে ধোঁয়াশা। কেউই জানে না, তারপর কী? দেবজিৎও নয়।

রুমা, টিঙ্কু যেমন বর্তমান। চলার ছন্দটাও। তাকে অনুভবেই মাধুর্য। ভেবেছিল কী, অভয় সরকার দুম করে চলে যাবে? সে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সেই সঙ্গেই সব শেষ। প্রবাহমান পৃথিবীর নিয়মেই চলে যেতে

হয়। কিন্তু যাওয়ার পর তার রেশটুকু অবলুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কে রেখে গেল, কে বিলীন হয়ে গেল, কী আসে যায়? জীবিতকে নিয়ে মাতামাতি তো পৌঁছবে না মৃতের কাছে। হাততালি বা কর্ম অর্থহীন। যদি না জন্মান্তরবাদ সত্যি হয়।

রুমা একদিন ঠাট্টা করেছিল "তোমাকে দেখে মনে হয়, তোমার ডেফিনিট উদ্দেশ্য নেই"

"উদ্দেশ্যবান কাউকে বিয়ে করলেই পারতে"

"সবারই একটা মকসদ থাকে"

"মানে জেতা, সফল হওয়া, লোকের বাহবা কুড়ানো। নয় কি? না পারলে হেরে যাওয়া। এটুকুর মধ্যেই জীবনকে বাঁধতে চাইছ"

"আমার কাছে তাই। জেতার মধ্যে অন্য আনন্দ"

"হারার মধ্যে দুঃখ আছে। দুটোকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পার না?"

এর বাইরে রুমার ভাবা অসম্ভব। হারা-জেতাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। জিতেওছে। ছোট বোন উমা বারবার হেরেও কাবু হয়নি। বহাল তবিয়তে সেও তো বেঁচে। কোনও আক্ষেপ নেই। দেবজিতের কথায় গভীর চেতনা কাজ করছে বুঝলেও সেটা অস্পষ্ট। সামাজিক সংজ্ঞার বাইরে। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি।

"আর কী?"

"সব বলে বোঝানো যায় না। উপলব্ধি করতে হয়"

ওর হয়েছে কি না, জানে না, জানতে চায়ও না। থাকুক শান্তিতে। বিঘ্নিত করার মানে হয় না। নিজের দুনিয়ায় সে মুক্ত।

গঙ্গার পাড় দিয়ে রাস্তা। প্রথমটা ভালোই। সাধারণ পাহাড়ি রাস্তার মতো। বাঁ দিকে বিশাল পাহাড় সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘন জঙ্গল। নাম না জানা গাছের দল পাহাড়টাকে সবুজ আস্তরণে ঢেকে রেখেছে। ঝিঁঝিঁরা কনসার্টে সরব। প্রকৃতির গান। রয়্যাল ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রাও এদের ছন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনত। সিমফনির জন্য মিউজিক্যাল স্কোর লেখার প্রয়োজন নেই। সুর না থাকলেও সুর। গান না থাকলেও গান। স্বরলিপি থেকে একটুও কম নয়। আপনভোলা ঝংকারে গাইছে হৃদয়ের গান।

ডানদিকে গভীর খাদ। অন্তত হাজার দেড়েক ফুট। অনেক নীচে বড় বড় বোল্ডার। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে গঙ্গার নীলচে সাদা জল। সামনে তাকালে সবুজ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝে ঝকঝকে সাদা বরফের মুকুট পরা পিকগুলো। যেন প্রকৃতি সাদা আস্তিন ছড়িয়ে শান্তির বন্দনা গাইছে।

কবে তুমি আসবে? কবে নিশ্চিন্ত আলস্যে ঠাই নেবে আমার কোলে? তোমার প্রতীক্ষায় আছি। শোনাতে তোমাকে ছেলেবেলার ঘুম-পাড়ানি গানঃ

খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ল বর্গী এল দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে

সুরবীর সিংকে গাইড নেওয়ায় প্রথমে একটু কিন্তু ছিল। অনেকেই বলছিল গাইড লাগে না। দেবজিৎ অন্য মনের লোক। হিমালয়ের এই সহজ সরল লোকগুলোকে ভালোই চেনে। পার্থিব ধনের বাইরে এরা মনের দিক দিয়ে পরম ধনী। লাগুক চাই না-লাগুক, গাইডের নাম করে যদি এদের কিছু সাহায্য করা যায় নিজের-ই ভালো লাগবে।

নামেই রাস্তা। আসলে একটা ঘোড়া চলার মতো ট্র্যাক। কখনও ভালো, কখনও খারাপ। মাঝে মাঝে তাও হারিয়ে যাচ্ছে। কোথাও অজস্র নুড়ি-পাথর রাস্তার ওপর। পা হড়কে যায়। অন্তবিহীন চড়াই-উতরাই।

এক জায়গায় এসে সুরবীর বলল, “ঠহরিয়ে সাব। আগে ঝোরা হ্যায়”

দেবজিৎ সামনে তাকিয়ে দেখল একটা পাহাড়ি ঝরনা। বাঁ দিক থেকে নেমে নাচতে নাচতে রাস্তার ওপর দিয়ে ডানদিকের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওপরে একটা গাছের গুঁড়ি আড়াআড়ি ফেলা। তার ওপর দিয়েই পেরতে হবে। জলের তোড়। গুঁড়িটাও ভীষণ পেছল। সাবধানে পা ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে ঝপাস্। একদম জলের মধ্যে। লাফিয়ে এসে সুরবীর না ধরলে সোজা নীচে।

“সাবধানিসে সাব। দেখতা নেহি কিতনা তাকত হ্যায় পানিকা”

প্যান্টটা পুরো ভিজে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল। ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। চেঞ্জ করতে গেলে র‍্যাক্স্যাক খুলতে হবে। ভাবতেই কান্না পেল। জুতোজোড়াও ভিজে চপচপ। মোজাটা চেঞ্জ না করলেই নয়। ঠান্ডা লেগে জ্বর বাঁধিয়ে ফেলতে পারে।

ইতস্তত দেখে সুরবীর এগিয়ে এল “থোড়া আগে চলিয়ে সাব। কুছ দের মে-ই চিরবাসা। উহাঁ দুকান হ্যায়। চায় ভি মিলেগা। চেঞ্জ করনেকা মওকা ভি”

এবার আর নিজের উপর ভরসা না রেখে সুরবীরের হাত ধরেই ঝোরাটা পেরল। চিরবাসা মানে প্রায় অর্ধেক পথ। কয়েকটা ছোট দোকান। কয়েকজন দোকানদার, দু-চারটে ভৃগুপন্থ ঘোড়া। এই নিয়ে চিরবাসা। বেসিনের মতো। চারধারে আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গ। ভৃগুপন্থ, সুমেরু, শিবলিঙ্গ - কত নাম। জানা-অজানা অখ্যাত বিখ্যাত শিখর যুগযুগান্ত ধরে দাঁড়িয়ে। শুধুমাত্র গঙ্গার গর্জন ছাড়া, জায়গাটা নিস্তব্ধ। সেই নৈঃশব্দ্যের অতন্দ্র প্রহরী পাহাড়গুলো।

“কী ভাই, ভিজলেন কী করে?”

হঠাৎ বাংলায় চমকে গেল। চারজনের বাঙালি দল। গোমুখ দেখে রাতে ভুজবাসায় ছিল। আজ নামছে।

"আশ্চর্য। বাঙালি বুঝলেন কী করে?" প্রশ্ন না করে পারল না।

"শারলক হোমস, ভাই, শারলক হোমস" একটু থেমে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল "নদী তুমি কোথা হতে আসিয়াছ? খেয়াল করেননি আমরা শুনতে পাচ্ছি"

তাই তো। লজ্জা পেল। সত্যিই তো জগদীশচন্দ্রের কথা আওড়াচ্ছিল।

"আর বলবেন না, একটা ঝোরার মধ্যে পড়ে গেলাম"

"সাবধানে চলবেন ভাই। সামনে খুব খারাপ রাস্তা"

বালি থেকে আসা দলটি একটু বসে এগিয়ে গেল।

দেবজিৎ র‍্যাক্স্যাক থেকে প্যান্ট মোজা চেঞ্জ করল। নিজের থেকেও বেশি অন্যদের জন্য চিন্তা। যদি জ্বর হয় সে শুধু ভুগবে না, অন্যদেরও ভোগাবে। সুরবীর ততক্ষণে দু-গ্লাস চা নিয়ে এসেছে। হিমালয়ে, গরম চায়ের চেয়ে কাম্য বস্তু আর কিছু নেই। চা খেয়ে আবার চলা। দু-পাশের সিন-সিনারি ঠিক এ পৃথিবীর মনে হচ্ছে না। এ যেন মায়াপুরীতে এসে পড়েছে। এই অখণ্ডবিস্তারের মধ্যেই জীবনের স্বাদ। যা তাকে জাগিয়ে রাখবে তাসের দুনিয়ায়। বাঁচিয়ে রাখবে ভেতরের মানুষটাকে। হারজিতের বাইরে প্রতি মুহূর্তে খুঁজে পাবে নিজেকে। কিচ্ছু আসে যায় না। জিতুক অথবা হারুক, সে তো সেই দেবজিৎই। তাই হয়ে থাকতে চায় চিরকাল।

হারজিতের খেলার একটা লক্ষ্মণরেখা আছে। সেখানে ধ্রুবতারার মতো পথটা একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ঘ্রাণ, তার প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবে চিরকাল। সীমার মধ্যে থেকেও পেয়ে যাবে অসীমের স্বাদ। কম কী?

"সাব, আগে গিলা পাহাড়। হর ওয়াক্ত পথথর গিরতা। বহত সাবধানিসে জানা হোগা" সুরবীরের দিকে তাকাল।

সুরবীর যেন ওর মনের প্রশ্ন ধরেই উত্তর দিল, "গিলা পাহাড় একদম গিলা ইয়ানি লুজ হোতা। হর ওয়াক্ত পথথর গিরতা উহাঁ সে। উধর দেখিয়ে সাব। ওহি গিলা পাহাড়"

ওর চোখ সুরবীরের হাতের দিকে ঘুরে গেল।

এক বিচিত্র দৃশ্য। অনেকদিন আগে দেখা ম্যাকেনাজ গোল্ড ছবির কথা মনে পড়ল। অগুনতি বিশাল থামের মতো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন মাটির থামের গায় বড়বড় পাথর আটকে দিয়েছে কেউ। একটু হাওয়া দিলেই মনে হচ্ছে থামগুলো দুলছে। মাঝেমাঝেই ছোট বড় পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে। দেখলেই ভয় লাগে।

“চলিয়ে সাব। ডরনে সে কেয়া ফয়দা”

সুরবীর ওর কাছ থেকে র‍্যাক্স্যাকটা নিজের কাঁধে নিল। গিলা পাহাড়ের নীচে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে গেল। মাঝেমাঝেই ছোট ছোট নুড়ি পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে। যদি কারও গায়ে বড় একটা পড়ে, নির্ঘাত মৃত্যু। এক কিলোমিটার পথ কী ভাবে যে পেরল পরে ভাবতে গেলেই ভয় লাগত। কিন্তু তখন ওসব মাথায় নেই।

“ভুজবাসা আ গিয়া সাব”

সুরবীরের কথায় সামনে তাকিয়ে দেখে দূরে ছোট ছোট কতগুলো ঘর। নীচে ভ্যালির মধ্যে। ডানদিকে অনেকগুলো পিকের মধ্যে চোখে পড়ছে শিবলিঙ্গ। খাড়া উঠে গেছে। মাথাটা দেখলে মনে হয় যেন আলাদা টুপি পরা। সামনে দিয়ে একটা গিরিশিরা নেমে এসেছে ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। অনেকে একে গণেশজিও বলে। সোজা সামনে সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে ভাগীরথী পর্বত। সকালের রোদে তিনটি পিক-ই ঝকঝক করছে। যেন মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে শৃঙ্গে। রঙের হোলি খেলছে সূর্যিমামা। যেন শ্বেতবসনা বিধবাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে রঙিন আবরণে। সিঁদুরের মুঠো দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে তার প্রশস্ত ললাট। ভাতিয়ারে ছেয়ে ঘুমভাঙানিয়া গান। আজকে দোল পূর্ণিমা নয়, দোল মহাজয়ন্তী।

“ওহি গোমুখ সাব, ভাগীরথীকে নীচে”

প্রায় চার কিলোমিটার দূর থেকে ছোট্ট কালো একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। ইম্প্রেসিভ লাগল না।

“ওটাই গোমুখ” দেবজিতের গলায় হতাশা।

এত শুনেছে এর সম্বন্ধে। আসলে এই। সুরবীর অবাক। ওর দিকে তাকাল। ঠিক বুঝতে পারছে না সাবকে। কলকাতা থেকে কাতারে কাতারে বাবুরা বৌ-বাচ্চাও নিয়ে আসে। এখানে এসে আনন্দে নাচানাচি। আর এই সাব যেন কেমন।

“সাব, আপকা পসন্দ নেহি হুয়া?”

দেবজিৎ অপ্রস্তুত “নেহি জি। এইসে কোই বাত নেহি। ম্যায় নে সোচা থা...” কী বলবে ভেবে পেল না।

“ঠিক হ্যায় সাব। নজদিক চলিয়ে। উধার সে বেহতর দিখাই যাতা” সুরবীরের গলায় অনিশ্চয়তা।

দুজনে ভুজবাসার লালবাবা আশ্রমের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল গোমুখের দিকে। কিছুটা যেতেই রাস্তাটা বেপাত্তা। শুধু বড়বড় পাথর। ছোটবড় বোল্ডার। পা ফেলতে গেলেই পাথর নড়ে উঠছে। দেবজিতের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। অল্টিচুড ১৩০০০ ফুটেরও বেশি। হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“কেয়া হুয়া সাব? শ্বাসকা তকলিফ?” সুরবীরের গলায় আশঙ্কা “ধিরেস চলিয়ে। পহচ গয়া”

“পহচ গয়া?” ঠিক বিশ্বাস হল না “কাহাঁ?”

“আগে দেখিয়ে সাব, ওহি গোমুখ”

একটা বোল্ডার পেরোতেই দেবজিতের চোখের সামনে হঠাৎ স্বর্গ যেন দরজা খুলে ধরল। মনে হল স্বপ্ন দেখছে। ঝকঝকে ভাগীরথীর শৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে একটি নদী। জলের নয়, বরফের। নীলচে বরফ। সেই নদীতে বড় বড় বরফের চাঙড় ভাসছে। নদীটা নীচে এসে হঠাৎ ভেঙে পড়েছে এক বিশাল গুহায়। আলো সেই বিশাল গুহার ভেতরে বেশি দূর ঢুকতে পারেনি। অন্ধকারের ভেতর থেকে কলকল করে বেরিয়ে আসছে আলোর ধারা। না, আলো নয়, ঝলমলে জল।

এই গোমুখ!

জানেও না, কখন তার দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে আরেক নোনতা নদী। ভাসিয়ে দিচ্ছে তার সমস্ত শরীরকে। সব কষ্টের সার্থক গন্তব্য। কিছুক্ষণ আগেই ভাবছিল গন্তব্যে পৌঁছনোর সার্থকতা। এখন বুঝতে পারছে, হয়ত ঠিক বোঝেনি। হারা-জেতার গন্তব্যের একটা সীমা আছে। কিন্তু এর বাইরের গন্তব্যটা আসীম। এই অসীমকে পাওয়ার সার্থকতা অপূর্ণ থেকে যেত, যদি না এই মুহূর্তে সে গোমুখে দাঁড়িয়ে থাকত। গলার মধ্যে এক অসহ্য ব্যথার দলা। বুকের মধ্যে এক অসহ্য আনন্দের সাগর আছড়ে পড়ছে -

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

এই গোমুখ!!!

দেবজিতের মুখ দিয়ে অস্ফুট আবেগে বেরিয়ে এল, বহু শোনা, বহু ব্যবহারে ক্লিসে এক প্রাচীন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর অন্তরের কান্না মেশানো ভক্তির অর্ঘ্যঃ

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে

ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে।

শঙ্কর-মৌলি বিহারিণী বিমলে

মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে

এই চেতনার মধ্যে সে আবিষ্কার করল আরেক অজানা, অচেনা পৃথিবীকে। মনের বাইরে সুপ্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। কোথায় যেন সেই ব্রহ্মাণ্ড তাকে বারবার হাতছানি দেয়। এই ব্রহ্মাণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ম। জাগতিক হানাহানি কলুষের বাইরে এখানেইপূর্ণতা। কে বুঝল, না বুঝল, কী আসে যায়? এই না-বোঝা, না-চেনা পৃথিবীটাকে নিজের করে পাওয়ার মধ্যেই সার্থকতা।

সতেরো

সপ্তপর্ণীর ফ্ল্যাটে সোফায় সায়ন্তনি গা এলিয়ে, "বাড়ির কাউকে দেখছি না?"

"অনির্বাণ অফিসের কাজে জুরিক গেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি-মেয়ে ননদের বাড়ি মুম্বাইতে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কাজের লোকটাকেও এই ফাঁকে দেশ ঘুরে আসাতে ছুটি দিয়েছি" সুলগ্নার উত্তর।

"রান্না করছে কে?"

"আমি। এখানে খেয়ে যা"

"বলছিস যখন খেয়েই যাই। ডোন্ট ফিল লাইক গোয়িং হোম টুডে। উড ইউ মাইন্ড, যদি এখানে থেকে যাই?" সায়ন্তনি নিস্পৃহ।

"ইট'ল বি মাই প্লেসার। অরণি মনে করবে না-তো?"

"কী আসে যায়? কথাই বলে না। খোঁজ-খবর নেওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়াও ইর‍্যাটিক"

"কেন?"

"কি জানি কী হয়েছে। হি হ্যাস রিট্রিটেড উইদিন হিমসেলফ। নিজের মনে থাকে। কী সব ছাইপাঁশ পড়ে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে"

"পাগল হয়ে যাচ্ছে না-তো?"

"কে জানে?"

"ভেবেছিলাম উঠতি ঘরের বিদ্বানকে বিয়ে করেছি। পরে বুঝলাম এটা বিয়ে নয়। লিগালাইজড প্রস্টিটিউশন। তাও নয়। সামাজিক বন্ধন"

"সব বিয়েই তাই" কচি-কলাপাতা তাঁতের শাড়ি পরা সুলগ্নার দিকে তাকাল।

সুলগ্না দেখতে খারাপ নয়। কম বয়সে আরও সুন্দর ছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। হাসিতে মন কেড়ে নেওয়া মিষ্টতা। শিশুসুলভ সারল্য। গালের টোল মনে করিয়ে দেয়, এ বয়সেও পুরুষকে আকৃষ্ট করার মশলা কাজলকালো চোখে। মাদকতায় অপরূপ স্নিগ্ধতা। মনে হয় কাছে টেনে নিই। শিশুর সারল্যে আদর করি। ভালোবাসি। আগলে রাখি সভ্যতার দূষণ থেকে। ৫' ৫" চেহারার মধ্যে লাবণ্যই প্রকট। সাদা ব্লাউজে ঢাকা একটা স্তন আঁচলের ফাঁক দিয়ে আংশিক উঁকি মারছে। বেহিসেবি কার্ভস্ নেই। বয়সের সঙ্গে কোমরে মেদ জমলেও পুষ্ট নিতম্বে তার পরিমাপ বোঝা ভার। মেদ আগে ছিল না। মুনমুন হওয়ার পরই প্রকট। সেটা নিজেও বুঝতে পারে। মুখ যখন ইউএসপি মেদের দিকে নজরই দেয়েনি।

অনির্বাণ কেন, সে বয়সে যে কোনও ছেলেরই পছন্দ হত। অনির্বাণও পছন্দ থেকে বিয়ের পিঁড়ি হয়ে ফুলশয্যায়। ভালোবাসার ফসল মুনমুন। আত্মিক বন্ধনের ইঙ্গিত ছিল কি না, জানে না। সামাজিক বন্ধনের সম্পর্ক। আকাঙ্ক্ষাকে সদ্য-বিবাহিতা যুবতীর স্তনে ভাসাবার অদম্য কামনা। সিঁদুরের মানে বোঝার আগেই, বধূবরণ সপ্তপর্ণীর বিলাসিতায়। বন্ধন গড়ে উঠতে পারত মুনমুনকে কেন্দ্র করে। ভাগ্যদেবী অন্য তুবড়ি জ্বালালেন ওর জীবনে। এক সুইস কম্পানি থেকে মোটা মাইনের অফার। ডিসিপিএল ছাড়ল অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়। বাসেলে ছ'মাসের ট্রেনিং। মুনমুনকে সুলগ্নার কোলে সঁপে পাড়ি দিল।

আরেক অধ্যায়। আরেক জীবন।

শীতে ডেভসের বরফ ঢাকা কুয়াশায় উষ্ণতার খোঁজে। সিঙ্গল মল্টও জোলো। আরও উষ্ণতা চাই। রক্তমাংসের মাদকতা। সুলগ্না যখন বিনিদ্র রাত যাপন করছে মুনমুনের কান্না সামালাতে অনির্বাণ স্কি শেষে পেল অচিনপুরের রাজকন্যেকে। লুসি জেদগ্রোভা। স্কির স্লোপে হোঁচট খেয়ে আলাপ।

“ইউ সুড নো হাউ টু কনট্রোল দ্য স্টিক বিফোর ইউ ফ্লাই অফ” ঘাড়ের থেকে অনির্বাণকে ঠেলে সরিয়ে তিরস্কার।

সেন্ট লরেন্স স্কুলের কৃতী ছাত্রকে কী অত সহজে দমানো যায়?

“টিচ মি হাউ টু”

ডেভসের পাহাড়ে লুসি নতুন করে হাঁটতে শিখিয়েছিল। এ পথে তো আগে হাটেনি। এ পথ, অন্য পথ। হারিয়ে যায় অ্যাল্পসের পর্বতশৃঙ্গ থেকে সুদূরের নীলিমায় অনির্বাণের স্বপ্নপুরী কল্পনার প্রাসাদে।

আধো ইংরেজিতে বলেছিল “নাউ নাউ স্ট্যান্ড স্টিল” হাত ধরে ভাসতে শিখিয়েছিল বরফের শৃঙ্গমালায়।

“আই অ্যাম ফ্রম সেন্ট পিটার্সবার্গ। ইউ?”

“ক্যালকাটা। বাট অ্যাট দ্য মোমেন্ট স্টেশনড ইন বাসেল”

“এভার বিন টু সেন্ট পিটার্সবার্গ?”

“নো”

“দ্য মোস্ট বিউটিফুল সিটি ইন রাশিয়া”

“এভার বিন টু ক্যালকাটা?”

“নো”

“দ্য ডার্টিয়েস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া”

দুশো বছর কলোনিয়াল গোলামি শ্বেতাঙ্গিনী পুজো শিখিয়েছে। হোক না সে আমাদের থেকেও দরিদ্র দেশের বাসিন্দা। সাদা চামড়া বলে কথা। তার নরম স্পর্শের জন্য নিজেকে বিকোতেও প্রস্তুত। নিজের দেশ

ছোট। সুলগ্না হারিয়ে গেছে। ওর উষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য মন কেঁদে উঠছিল। বরফ ঢাকা শীতের রাত। তরতাজা উষ্ণ শরীর। দৃষ্টির নাগপাশ নেই। লুসির বাহুডোরে উজাড় হয়ে গিয়েছিল অনির্বাণ। ফর্সা মেদহীন নাভি। সাদা লেসের প্যান্টি। ধবধবে উর্ধ্বমুখী স্তন। সেই মুহূর্তে, সুলগ্নার কাজলকালো চোখ মুছে গেছিল শ্বেতাঙ্গিনীর আমন্ত্রণে। মুছে গেছিল সুলগ্না, মুনমুন।

বাসেল থেকে ফেরার পর তেমন করে আর কখনও কাছে পায়নি অনির্বাণকে। সুলগ্না হারিয়েছে অবস্থান। সে কবে যেন সপ্তপর্ণীর বিলাসবহুল সামগ্রীর মতোই এক জীবন্ত শো-পিসে পরিণত হয়েছে।

সুলগ্নার দেখে ট্যানিয়ার সঙ্গে অবশম্ভাবী বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নাড়া দিয়ে উঠল। ট্যানিয়াকে জয়ের মধ্যে আনন্দ ছিল। অস্তিত্বের জীবন্ত মানে। বিসর্জনে শূন্যতার ঢেউ। চাহিদাকে অবদমন করলেই অস্তিত্ব সংকট। ট্যানিয়ার উগ্র চমক। তার মধ্যেও নমনীয়তা আকর্ষণীয়। বয়সে বেশ ছোট ট্যানিয়া প্যান্টি খুললেও আপত্তি করেনি খাঁজে হাত ঢোকানোর সময়। সায়ন্তনির নির্দেশ অমান্য করেনি। ট্যানিয়ার ব্যক্তিগত চাওয়ায় সায়ন্তনিই সম্রাজ্ঞী। ওর নগ্নতার অধিকারী বলিষ্ঠ পুরুষ। যার কামে সম্মতি ছাড়া গতি নেই। তার বেষ্টনে খুঁজে নিতে হবে ছোটবেলায় মিস করা আকাঙ্ক্ষা। সেদিন যখন সায়ন্তনি আঁকড়ে ধরে চুমু খেয়েছিল, দেহের উত্তাপের রোমহর্ষক স্পর্শে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করছিল। কত পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গনে, আবেগে কেঁপেছে শরীর। কিন্তু নারীদেহের উত্তাপ, আগে অনুভব করেনি। সায়ন্তনির বলিষ্ঠ দেহের আধিপত্য মন ভরিয়ে দিয়েছিল। সায়ন্তনি কতটা বন্ধন অনুভব করেছিল, জানে না। ট্যানিয়ার ওপর কর্তৃত্বের অনুভূতিকে অস্বীকার করতে পারেনি। সার্বভৌমত্বর আনন্দ। কর্তৃত্বের অহং।

ট্যানিয়ার অভাব অনুভব করতেই মনে হল বিবস্ত্র সুলগ্না দেখতে কেমন? আপাদমস্তক দেখল সুলগ্নাকে। যেন নিরাবরণ দেখছে। অনুভব করছে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায়।

সুলগ্না বাঙালি রক্ষণশীলতায় বলল "না রে, সব বিয়ে তাই নয়। তোর স্বামী নয় অন্য পৃথিবীতে। তোকে তো বাধা দেয় না"

"দেবে কোন সাহসে? ও আবার মানুষ নাকি?" ঝাঁঝিয়ে উঠল সায়ন্তনি।

"অনির্বাণের মতো হলে কী করতিস? মুনমুন হওয়ার পর বাসেলে মেম নিয়ে ফষ্টিনষ্টি। একবারও তো নিয়ে যাওয়ার কথা বলেনি। এক টাকা পাঠানো ছাড়া ওর কোনও দায়িত্বই নেয়নি"

"নেবে কী করে? ট্রেনিং পিরিয়ডে তো কোনও ফ্যামিলি অ্যাকোমোডেশন দেয় না"

"না দিক। এখন তো আর সে প্রবলেম নেই। এখন উন্নতির নেশায় পেয়েছে। যে করেই হোক, জিততে হবে। তা সে, নিজের ক্ষমতা দিয়ে হোক। না হলে, বউকে লেলিয়ে। নপুংসকের চেয়েও অধম। নিজের প্রতি

বিশ্বাস নেই। নিজের পোজিশন করার জন্য সুন্দরী বউকে এগিয়ে যদি হাসিল করা যায়” সুলগ্নার হতাশার সুর। না পাওয়ার দুঃখ।

বিয়ের রং হারিয়ে অতৃপ্ত সাংসারিক বন্ধনের চোরাবালিতে।

ঘর আছে, রাতের সম্ভোগ নেই।

সাজানো ফ্ল্যাট আছে, বাসনা নেই।

কামনা নেই, স্বপ্ন নেই, বেঁচে থাকার স্ফুলিঙ্গও নেই।

পূর্ণতা কী বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে? না, মনে? যদি তাই হয়, বাবা-মায়েরা কীসের মোহে মেয়েকে অনিশ্চয়তায় বলি দেয়? স্বচ্ছলতার মিথ্যে স্বপ্ন। পরিপূর্ণতার মিথ্যে মোহ। মোহ আঁকড়ে স্বপ্ন গড়াই জাগতিক জীবন।

সুলগ্না উঠে পড়ল “ভডকা না বাকার্ডি?

“বাকার্ডি”

ড্রয়িং রুমের সাজানো বার ক্যাবিনেট খুলতেই ভেতরের আয়নার রিফ্লেকশনে আলোর ঝলসানি। বোতল, ঠান্ডা কোক টেবলে রাখল “নিজের মতো করে মিশিয়ে নে। রান্নার বন্দোবস্ত করে আসছি”

“অত করার কী আছে? যা আছে তাই খাব”

“কিছু করতেই হবে। বোস, আসছি”

সায়ন্তনি চেয়ে রইল ওর দোদুল্যমান নিতম্বে। এই মেয়েকে যে কোনও ছেলে বুকে আগলে শুতে চাইবে। অনির্বাণ কি না নিজের ধান্দায় লেলিয়ে দিচ্ছে! মেয়েটা মধ্যবিত্ত সংস্কারে বন্দি, অসহায় ছটফট করছে। ওরও তো বাঁচার রসদ চাই। ওর অসহায়তা আকৃষ্ট করছে। তার মধ্যে শূন্যতাও। ট্যানিয়াকে মুছে ফেলতে হবে। সুলগ্না ট্যানিয়ার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। এখন ট্যানিয়ার চেয়ে ওকে বেশি আকর্ষণীয় লাগছে। ট্যানিয়ার ছিপছিপে শরীরের চেয়ে সুলগ্নার ভরাট পূর্ণতা বেশি কাম্য।

সেদিন ট্যানিয়ার সঙ্গে সম্ভোগের অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেনি। ফিরে গেছিল ওর হাইল্যান্ড পার্কের ফ্ল্যাটে। একবার... বারবার। ওর অবসরের একাংশ ভরে দিয়েছিল নতুন পাওয়ার উচ্ছ্বাসে। বিবস্ত্র। বাথরুম, বিছানা বা সোফার নরম গদিতে। আবিস্কার করেছিল ভেতরের লুকনো পুরুষকে। উন্মাদনা খুঁজেছিল, আরণি, রনিতের প্রাণহীন স্পর্শ থেকে।

সুলগ্নার সঙ্গে প্রথম আলাপ এক কলেজ ফেস্টে। দল বেঁধে খেতে গেছিল চাঙোয়াতে। সুলগ্না সায়ন্তনির পাশে “আমার নাম সুলগ্না ভট্টাচার্য। সল্ট লেকে থাকি”

“সায়ন্তনি গাঙ্গুলি। আরেকটু চিলি চিকেন...”

“আপনি করে বলছ কেন? আমরা তো একবয়সী। তুমি বলতে পার”

“তাহলে তুমি নয়, তুই”

আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা এখন ভালোবাসার দরজায়। সায়ন্তনি বাকার্ডিতে চুমুক দিয়ে তাকাল সাজানো ঘরটায়। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা কিউরিও। দেওয়ালে কাকু ক্লক। ক্যাবিনেটের ওপর বড় নাগরদোলা। সুলগ্না বলেছিল অনির্বাণ ভিয়েনার প্রাটার থেকে এনেছে। স্ট্যানলিসের চামড়ার সোফা। কাশ্মীরি সেন্টার টেবলের পাশের থ্রি-পিস কর্নার টেবল। শুনেছে ওর বাবা অ্যান্ড্রু ইউলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। আশ্চর্য, এত কিউরিওর মধ্যে মানুষের ছবি নেই। এখানে বোধহয়, মানুষ গৌণ। জীবনের সার্থকতা মানুষের থেকে বেশি। সুলগ্নাকে লেলিয়ে দেওয়া অস্বাভাবিক নয় যারা এগোতে চায়। ট্যানিয়াও তো চেয়েছিল বার্নপুরের বাইরে নতুন দুনিয়ায় এগোতে।

সে রাতে ঠিক কী হয়েছিল, জানে না। শুনেছে, মনোময়ের সঙ্গে উন্মাদ আনন্দে রাজেরহাট কানেক্টরে জীবনের গতি খুঁজতে গেছিল। মনোময়ের গাড়ি পাঙ্কচার। মাথায় বাড়ি লেগে অজ্ঞান। মনোময় যা বলেছে ঠিক কিংবা ভুল। তারপরে যা ঘটেছিল ট্যানিয়া কাউকে বলেনি। বেশিড্রিঙ্ক করেছিল। এতটা নয় যে কিছুই মনে থাকবে না। সায়ন্তনি শুনেছে একদল ছেলে ওকে বার করে নিয়ে যায় পাশের খোলা মাঠে। বিবস্ত্র করে রেপ করে তিন মত্ত যুবক। লোকলজ্জার ভয়ে ট্যানিয়া চেপে গেছে।

বাকার্ডি মেশানো কোকে চুমুক। সায়ন্তনি হাতটা ঢুকিয়ে দিল ব্লাউজের ভেতর। নিপলে দু-আঙুলের সুড়সুড়ি। ভেসে যেতে চাইছে কামনার দুনিয়ায় তৃপ্ত হতে। কল্পনায় কোনও পুরুষ নেই, নারীর অবয়ব ভাসছে। যার কাছে সমর্পণ, আলিঙ্গন, চুম্বন। উত্তেজনা ভেঙে দিচ্ছে সংস্কারকে। চাওয়ার অন্য মার্গ।

“আমার জন্য ঢাল তো” কিচেন থেকে সুলগ্না। হাতটা নিপল থেকে সরিয়ে নিল সায়ন্তনি। কেউ হঠাৎ তার অন্দরমহলে।

হাতটা মুছে, পাখার স্পিড বাড়িয়ে সুলগ্না সায়ন্তনির পাশে “মাইক্রোওয়েভে জগাখিচুড়ি মাংসের তরকারি। রুমালি রুটি অর্ডার দিই। চলবে?”

“খুব চলবে। তাড়া কীসের? এখন-ই তো খাচ্ছি না”

“এ মা, ভুলেই গেছি। পাঁপড়গুলো কিচেনে। নিয়ে আসি” চাটটা ভালোই হয়েছে। পাঁপড়, চানাচুর, কাবাব। বাকার্ডিতে কোক মিশিয়ে চুমুক “গেরস্থ এখন তোর সঙ্গে বাকার্ডি খাচ্ছে” গলায় দীর্ঘশ্বাস।

“ওসব ভাবিস না। যেটুকু পড়ে, তার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে নিতে হবে”

সায়ন্তনির শাড়িটা সরে গেছে। জন্মসূত্রে পাওয়া পুষ্ট স্তনদুটি বিদ্রোহ করছে প্রথার বিরুদ্ধে। কেলেকুষ্টি মায়ের যে স্তনের আকর্ষণে মজেছিল বাবা। যার আকর্ষণে একসময় কালীশেখর। এখন ডানা মেলতে চাইছে

আরেক মায়াবী আকাঙ্ক্ষায়। সাময়িকভাবে দমন করলেও, উত্তেজনাটা ভেতরে জ্বালাচ্ছিল। অরণির সঙ্গে সম্ভোগের পাট শেষ। বাইরের দুনিয়ায় সাবধানতা আবশ্যক। তুষের আগুনের মতো, ধিকধিক বাসনা প্রতি রাতেই ওর উরুদ্বয়ে। পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা আজ সমগ্র শরীরে। ইচ্ছে পরিতৃপ্তির খোঁজে।

"আয়নায় নিজেকে দেখেছিস?"

"রোজই দেখি, চুল আঁচড়ানোর সময়"

"ওভাবে নয়। সম্পূর্ণভাবে"

"কাপড় না পরে?" সুলগ্না মুচকি হাসল "কেন দেখব না? ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। পেটটা কেমন বেরিয়ে থাকে। মুনমুন হওয়ার পর থেকেই ফিগারটা ঠিক থাকছে না। কী আসে যায়? কেউ তো আর দেখছে না"

"দেখার লোকের কী অভাব? আমি তো আছি" সায়ন্তনির উত্তরে ফিরে তাকাল। সেদিনের কথা মনে পড়ল 'বিলিভ মি, ইট ওয়াজ অ্যান এক্সকুইজিট এক্সপিরিয়েন্স উইথ ট্যানিয়া' সে দিকেই কী ইঙ্গিত? মুহূর্তের জন্য চোখটা সায়ন্তনির স্তনে। ঘুরিয়ে নিল। চাওয়ার সঙ্গে রক্ষণশীলতার টানাপোড়েন। বুঝেও না বোঝার ভান "কী দেখলি?"

"বিউটিফুল। পাছাটাও"

এক ঢোঁকে বার্কাডিটা গিলে নিল। ভয় মেশানো আনন্দে কেঁপে উঠল বুক। মধ্যবিত্ত সংস্কারে সায়ন্তনি অন্য এক পসরা নিয়ে হাজির। যা ভেবেছিল ব্যাপারটা তাই। একদিকে যান্ত্রিক প্রাণহীন সাংসারিক জীবন। বিদেশি সভ্যতার সমুদ্রে প্রগতির নাগপাশে নীলকণ্ঠ হতে চাইছে অনির্বাণ। সেখানে দাবিহীন অভিনেত্রীর রোল ঠেলতে হচ্ছে ওকে। সমাজের ভ্রূকুটির উর্ধ্বে এই নিভৃতে নতুন অনুভূতির হাতছানি। মন্দ কী। চাপা বাসনা মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেও তো রক্তমাংসের মানুষ। সাধ-আহ্লাদ থাকবেই।

"তোর বুকটাও ভীষণ ভালো লাগে"

শাড়ির আঁচল ফেলে সুলগ্নার পাশে নিবিড় "সত্যি?"

পাঁপড়টা গলায় আটকে গেল তাই দেখে। নিজেরটা কতবার দেখেছে। কম বয়সে নিভৃতে খেলাও করেছে। কিন্তু অন্য নারীর স্তনযুগল এভাবে দেখেনি। নেশাটা জমছে। বাকর্ডি থেকে কামনায়। লো-কাট ব্লাউজের ওপরে খোলা অংশটা দিয়ে গভীর ক্লিভেজ। ওর কালো চামড়া স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পের মৃদু আলোয় মোহ ছড়াচ্ছে।

ছোঁয়ার মোহ।

ভালোলাগার মোহ।

ভালোবাসার অদম্য আকর্ষণ।

সুলগ্নার বুকে সায়ন্তনির হাত “বিউটিফুল”

সন্তর্পণে চলতে লাগল ব্লাউজের ওপর। বোতাম খুলে হাত ঢুকিয়ে দিল ব্রায়ের ভেতর। সুলগ্নার শ্যামলা গাল বেগুনি। ভালো লাগছে ওই স্পর্শ। মন চাইছে, জড়িয়ে ভালোবাসতে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি সায়ন্তনির। চোখ বুজে স্পর্শ অনুভব করছে সুলগ্না। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সায়ন্তনি ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। কতক্ষণ এভাবে ছিল খেয়াল নেই। এখন সায়ন্তনি সুলগ্না নারী নয়। দুই চাতক-আত্মা, মিলন পিয়াসী। আজ বুঝি সেই শুভক্ষণ। মনের মিলন। আলিঙ্গন। স্পর্শ অনুভবে না-পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে পাওয়ায়। সরিয়ে দিয়েছিল বুকের আঁচল। নিরাবরণ করেছিল ঊর্ধ্বাঙ্গ। সুলগ্নার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে তৃপ্তি।

এ অন্য খেলা। ট্যানিয়ার থেকে ভিন্ন। বালিকায় নয়। কমবয়সিকে কর্তৃত্বে বেঁধে ফেলা নয়। সমবয়সিকে তার পথে চালানো। নিজের করে ভালোবাসা।

সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সুলগ্নার। সায়ন্তনির বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ মনে করিয়ে দিচ্ছে ফুলশয্যার রাত। সেদিন ছিল অনির্বাণের স্পর্শের কামনায় প্রতীক্ষা। সেদিনের সঙ্গে আজকের ভীষণ মিল।

ব্লাউজ ব্রা সোফায়। বলিষ্ঠ দৃঢ় হাতে তুলে নিয়েছিল সুলগ্নার স্তন। সায়ন্তনির ঠোঁটের স্পর্শে আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিল। দেহে নতুন রাগ। হারিয়ে যাওয়া উষ্ণ স্পর্শের ঝংকার। ওকে আরও নিবিড় করে কাছে পেতে চাইছে মন।

“আগে করেছিস?” সায়ন্তনির প্রশ্নে লজ্জায় সুলগ্না।

ফিসফিস করে বলল “নাঃ”

“ভালো লাগছে?”

“ভীষণ ভালো লাগছে”

সায়ন্তনি অনুভব করল সুলগ্না কাঁপছে। শুধু দৈহিক কামে নয়, পরিতৃপ্তিতেও। যা অনির্বাণ দিতে অপারগ। যার জন্য কাঙালের মতো হাপিত্যেশে সাজানো সংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দি। আজ লোকচক্ষুর আড়ালে নারীর দৈহিক পূর্ণতা সায়ন্তনির মধ্যে। এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে বেশ কিছুটা বাকার্ডি গিলে ফেলল। বাকার্ডি সংকোচ ঢেকে প্রাকাশের প্রেরণা। সায়ন্তনি শাড়িটা আলগা করতে যাচ্ছিল। বেলের শব্দে চমকে উঠল। রুমালি রুটি নিয়ে মোড়ের দোকানের ছেলেটা দরজায়। ডাইনিং টেবলে রেখে সায়ন্তনির পাশে। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে ফলস্-সিলিংয়ে। খেয়াল নেই সায়ন্তনি ধীরেধীরে সুলগ্নার শাড়ি আলগা করে সায়ার ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে খেলে যাচ্ছে।

এ খেলা আগে জানা ছিল না। কেন নয় নিজের জন্য? সামাজিক বন্ধনে লোকচক্ষুর আড়ালে এটাই তো সংরক্ষণশীল গেরস্থের সেফ দৈহিক বিনোদন। এর মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে এখনকার বাঁচার রসদ।

আঠারো

"একবার দেখা করতে চাই। কথা আছে" অরণি ফোনে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদিশা বলল "এর মধ্যে সময় হবে না। রবিবার বিকেলে। ফোন করে নিও"

ক্রমশ অসহ্য লাগছে ওকে। আকারে-ইঙ্গিতে ফোটাবার চেষ্টা করেছে। অরণি কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। ওর একঘেয়ে কাঁদুনে প্যানপ্যানানি আর ভালো লাগছে না। বউ ঘরে না-থেকে অন্য ছেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। পুরনো গল্প। মরদকা বাচ্চা হলে ঢুকিয়ে জয় করো। অন্যের কাছে ব্যর্থতার কাঁদুনি গেও না। মেয়েছেলে মার্কা এসব ছেলেদের পোষায় না।

কম বয়সে বসন্ত উৎসবে দল বেঁধে যেত। ফাগুয়ার হাওয়ায়, আবিরের সঙ্গে লাল মাটির ঘ্রাণ। মনটা উড়ু উড়ু। সাদা-লাল শাড়ি পরা মেয়েদের নাচ গানে অনেক পৌরুষ। ছেলেরা ততখানি মেয়েলি। ধুতি-পাঞ্জাবিতে মিনমিনে। তখন এত শহুরে উৎপাত ছিল না। খোলামেলা ঘোরা যেত। কলকাতার ছেলেরা তখনও মাল খেয়ে বোলপুরকে বোতলপুর করেনি। কলকাতার উঠতি বড়লোকদের শান্তিনিকেতনে বাড়ি কেনাটাই কাল হল। রবীন্দ্রনাথ আঁকড়ে যদি স্ট্যাটাস বাড়ানো যায়, ক্ষতি কী? বাড়ল সাংস্কৃতিক তালকানাদের আধুনিকতার উচ্ছ্বাস। বো-ত-লপুর হয়ে গেল এলিটদের কাল-চাঁড়াল পীঠস্থান। নাই বা পড়া হল রবিঠাকুর। নাই বা বোঝা হল আন্তর্জাতিক-তাকে। রাবীন্দ্রিক উত্তরীয় চড়িয়ে স্কচে চুমুক দিলে স্ট্যাটাস বাস্তবিক বাড়ে, তবে পুরুষানুক্রমিক হিসেবেই খেয়াল রাখবে, রবি-টবি যেন শখের হোমিওপ্যাথি আর জ্যোতিষের থেকে বেশি নম্বর না পায়। নিজেদের শূন্যতাকে রাব-ইন্ডিক মোড়কে ঢেকে এলিটের স্ট্যাটাস। ক্যামেলিয়া ক্লাবের জনগণ তাই বিশাল শান্তিনিকেতনি বাংলোতে স্কচে চুমুক দিয়ে সংস্কৃতির কাছাকাছি। পরিবেশ ভিন্ন।

এলিট-বাবুরা মিস্ট্রেস নিয়ে শান্তিনিকেতনে মাল খাবে। তো মফসসলের ছেলেরা বসন্ত উৎসবে মাল খেয়ে সুন্দরীদের মেহফিলে আবিরের দোহাই দিয়ে শরীরে হাত বোলাবে না, আশা করাও পাপ। মনে যখন বসন্ত, দেহ-ই বা বাদ কেন। মেয়েগুলোর মধ্যে দম ছিল। চটি খুলে পিঠে চড়-চাপড় দিতে পিছুপা হয়নি। ছেলেগুলো অসহায়, ম্যানম্যানে। তাকিয়ে দেখত সহপাঠিনীর ইজ্জত নিয়ে খেলছে বাইরের দামাল-মাতালরা। অরণি একেবারে ওদের মতো।

সহকর্মী জয়তী অন্যমনস্ক দেখে বলল "ব্যাপার কী? খোয়া-খোয়া চাঁদের মতো উদাস বসে কেন? প্রেমে পড়েছ?"

বিরক্তিকর। পটের বিবি ডাক্তার। স্বর্ণচুরি পরে ডিউটিতে। পেশেন্টদের মিষ্টি হাসি ছোড়া ছাড়া ডাক্তারি কতখানি করে, জানা। বাড়িতে পিএনপিসির চেয়ে লেডি ফ্লোরেন্সের মাস-মাইনের ঠিকেদারি অনেক ভালো। কটকি-বালুচরির জন্য এক্সট্রা ইনকাম "প্রেম করব কেন? হাসব্যান্ড কী লাগাচ্ছে না, তাই আমার পেছনে? না লাগালে গাজর দিয়ে সাধ মেটাও" বেরিয়ে গেল। রাগটা জয়তীর প্রতি, না, অরণিকে ঘাড় থেকে না নামানোর ব্যর্থতা, জানে না।

রবিবার আবার অরণির ফোন "কথা দিয়েছিলে আজ দেখা করবে"

জোঁকের মতো লেগে। হম ছোড়ে তো কমলা নেহি ছোড়ে। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। ছোটবেলার বিলাসপুরের স্মৃতি।

"বিটিয়া, ঘুরতে যাবি?" বৃন্দার মিঠে হিন্দি।

আধো-আধো গলায় বিদিশা বলত "কোথায়?"

"নদীকে পাস"

"ওখানে কী আছে?"

"উধর বহত বড়া চাঁদ দীখাই দেতা"

হাত নেড়ে বিদিশা দেখাত "কিতনা বড়া, ইতনা?"

"বহত বড়া। নদীকে উসপার মেঁ জঙ্গল। উধর ইধরকা মাফিক ঘর নেহি। চাঁদ সাফ দিখাই দেতা। আজ তো হোলি। আউর ভি বড়া"

বসন্তের মাহাত্ম্য বোঝার আগেই ছোঁয়া পেয়েছিল। পরে ওকথা মনে হতেই সুর ভাঁজতঃ

এতদিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে

দেখা পেলেম ফাল্গুনে

দেখেছিল প্রকৃতিকে। সাঁঝের আলোয় চিকচিকে জলে ফ্রেমিংয়ের ঠিকানা। তাকে ক্যামেরা-বন্দি করতে ছুটে গেছে ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। বিলাসপুরের স্মৃতিকে ছড়িয়ে দেবে সবার মধ্যে। এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো মানুষ ভুলে যায় দৈনন্দিন হারজিতে। এর সৌন্দর্য বিলির মধ্যে আরেক আনন্দ।

"বিকেল পাঁচটায়"

"আজ তোমায় এক নতুন জায়গায় খাওয়াব"

"নাঃ, নাঃ। স্ট্যাডেলেই বসব"

অরণি সেজেগুজে এসেছে। খুশি খুশি লাগছে ওকে। রেস্টুরেন্টে বসে বলল "আজ সাজোনি?"

"দুপুরে ঘুমোচ্ছিলাম। উঠে আর ইচ্ছে হয়নি"

নীল জিনস, সাদা টপস্ পরে চলে এসেছে। লিপস্টিক নেই। চুল আলগা। পায়ে স্যান্ডেল "কী বলবে?"

“কিছু খাবে না?”

“যা খুশি কিছু বলে দাও”

“তোমার প্রিয় গার্লিক টোস্ট বলি। রেশমি কাবাব খাবে?”

মাথা নাড়ল বিদিশা। অরণি কথা বাড়াবার জন্য বলল “তোমার আজকাল সময় নেই”

“টাকা দিচ্ছে। খাটিয়ে তো নেবেই। বল, কী বলার?” অরণিকে ইতস্তত করতে দেখে বলল “কিছু বলছ না যে। ছুটির দিনে এদ্দুর ড্রাইভ করিয়ে আনলে”

থমকে বলল “সায়ন্তনিকে নিয়ে পেরে উঠছি না। ভাবছি, ডিভোর্স করব”

নির্বিকার বিদিশা “তো কর। তোমার ব্যাপার। আমাকে বলে কী হবে?”

“ওকে ডিভোর্স করে তোমায় বিয়ে করতে চাই। এরকম অর্থহীন জীবন ভালো লাগছে না। তোমায় বিয়ে করলে সুখে থাকব”

“বিয়ে!” বিদিশা অবাক “কী করে ভাবলে বিয়ে করব?”

“কেন? এতদিন একসঙ্গে। তুমিও বিয়ে করনি। আপত্তি কোথায়?”

“ঘুরলেই বিয়ে করতে হবে, এ ধারণা হল কোত্থেকে? এর আগে কী কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘোরোনি?”

“কলেজ জীবনে। বন্ধুর মতো” সন্তর্পণে রুচিরার কথা এড়িয়ে গেল।

“এখন অন্য কেন?”

“অন্য নয়। তোমায় ভালোবাসি বলে”

সেরেছে! ভালোবাসা, বিয়ে। স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে। মেয়ের সঙ্গে ঘুরলেই ভালোবাসা। ভালোবাসলেই বিয়ে। সব কেমন ছকের অঙ্ক। ওতেই আটকে।

বিদিশাও তো সুবিমলদাকে ভালোবেসেছিল। দেহ বিনিময় ছাড়া কিছু জোটেনি। অরণির মতো একটা নপুংসকের সঙ্গে বিয়ে! নিজেরই দেখভাল করতে পারে না। আর সে কি না ওকে দেখবে। এরা ভাবেটা কী? একটা মেয়ের সঙ্গে দুদিন ঘুরলেই ভালোবাসা। বউকে বিদায় দিয়ে নতুন বধূবরণ। যেন খেলা। পোষাল, ঘর কর। নইলে ফুটিয়ে অন্য কেউ।

পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণে বিয়ে-ডিভোর্স জলভাত। সিঁদুর দিলেই সর্ম্পক। খোরপোশের নিয়মটা পশ্চিমি দেশের মতো কঠোর হলে প্রগতিশীল সমাজ দুবার ভাবত। এছাড়াও আরেকটা সম্পর্ক র‍্যাম্পেন্ট। বউ-বাচ্চা, সংসার ইন্ট্যাক্ট রেখে সম্পর্কের বেড়াজালে না জড়িয়ে, অফ টাইমে মস্তি। সিরিয়ালগুলো একে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ।

"আমি তোমায় ভালোবাসি না। বইয়ের প্রশ্নই ওঠে না"

"কেন?"

"একবার নিজের চেহারাটা দেখেছ আয়নায়? কর তো একটা ছাপোষা চাকরি। ওই মুরদে ভাবলেই বা কী করে প্লাস্টিক সার্জেনকে বিয়ে করবে?" গার্লিক টোস্টে কামড়। পারলে টোস্টের মতো চিবিয়ে খায়। ভদ্রভাবে কাটাতে পারলেই ভালো। এই উত্তর আশা করেনি। তবুও, অনেক সাহস সঞ্চয় করে যখন বলেই ফেলেছে এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়তে নারাজ। তাড়াতাড়ি জবাব দিতে হবে না। প্রোপোজাল দিলাম। ভেবে দেখ। তাড়া নেই। পরে জবাব দিও"

"ভাবার কিছু নেই। সোজাসুজি বলে দিলাম। তোমায় ভালোবাসি না। বিয়ে করব না। পরেও একই ডিসিশন"

রুচিরা চলে যাওয়ার পর স্বপ্ন দেখেনি। সায়ন্তনি যে ধরনের মেয়ে, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না। স্বপ্ন ছাড়াই বাঁচছিল। স্বপ্নকে বলি দিয়ে চাওয়াকেও মুছে ফেলেছিল। হঠাৎ বিদিশার মতো সুন্দরীর সঙ্গে আলাপে মোড় ঘুরে গেল। ওর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বিদিশার মধ্যেই হারানো রুচিরাকে খুঁজছিল। বিদিশা অনেক বেশি বর্ণময়। অবচেতনে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ছিল। হাওয়ায় ভাসায় অনেক আনন্দ। স্বপ্নেতেই শান্তি। তাকেই খুঁজছে বাস্তবে। আজ সে স্বপ্ন চলে গেলে বাঁচবে কী নিয়ে? স্বপ্নটাকে হারাতে চায় না। আগলে রাখতে বদ্ধপরিকর "আর একবার ভেবে দেখ"

ছিঁচকাঁদুনে আর ভালো লাগছে না। কী ভাবে? ঘ্যানঘ্যান করলেই বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে। রুক্ষভাবে বলল "ভাবার কিছু নেই। তোমাকে বিয়ের কথা ভাবতেও পারি না"

অরণির মুখে কী ব্যাথার ছাপ? বিদিশা তাহলে সার্থক "মরোগে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়। নইলে লুম্বিনি পার্কে"

ঝাঁকুনিতে মন কেঁদে উঠছে। বুকের ভেতর অসহ্য ব্যথার দামামা। কে যেন সংরক্ষিত পবিত্র মনটাকে কসাইখানায় দলে পিষে কেটে টুকরো করে দিচ্ছে। মাপছে যন্ত্রণা কতটা। কলেজে পড়ার সময় একটা ইংরেজি ছবি দেখেছিল। একজন পুরুষ একটার পর একটা মেয়েকে পটিয়ে নিয়ে আসে খুন করবে বলে। খুনও করে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে মেয়েগুলোর মুখের ভিডিও রেকর্ডিং করে। আজ বিদিশা মনের ভিডিওতে ধরে রাখতে চায় অরণির ব্যথা। ওর মুখটা আরেকবার দেখে উঠে পড়ল।

আর নয়। অনেক হয়েছে। অনেক সময় দিয়েছে।

চাবিটা আঙুলে নাচিয়ে স্ট্যাডেলের বাইরে গাড়ির দিকে। মুহূর্তের জন্য সুবিমলদার মুখটা ভেসে মিলিয়ে গেল। স্টার্ট দিতেই, স্টিরিওটা চালিয়ে দিল। রবীন্দ্রসংগীতের সুর আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো

হৃদয় জুড়ালো।

ভলুম বাড়িয়ে দিল। কোয়াড্রিফনিক স্পিকারে রেসনেট করছে সুর। হারিয়ে যাচ্ছে অরণির মুখ। অরণিও। ক্ষতি নেই। অরণিকে হারানোতেই তৃপ্তি। শুধু একটু প্রার্থনা। আর যেন সুবিমলদার মুখটা দেখতে না হয়। প্রার্থনা শুনে কী ঈশ্বর ধ্রুবতারা দেখাবে?

উনিশ

অরণিকে সায়ন্তনি ডাকল “খেতে যাবে না?”

“নাঃ। ইচ্ছে করছে না”

আগে বলত ‘তুমি খেয়ে নাও’। আজ কিছু বলল না।

“সারাদিন কী যে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাক? কিছু করলেও তো পার”

ব্রায়ের উন্মুক্ত অংশ নাইটি দিয়ে ঢেকে দিল। ওর যৌবন নিয়ে অরণির মাথাব্যথা নেই। সে-ও আগ্রহী নয়। সম্পর্কটা দৈহিক-মানসিকের বাইরে। কোথায়, জানে না। বিয়ে শব্দটাই তামাসা। রেজিস্ট্রি সই, মালাবদল, লৌকিক আচার। স্বীকৃত দৈহিক মিলন। বাচ্চা, তার লেখাপড়া, বিয়ে। নিত্যনৈমিত্তিক, প্রাতঃকৃত্যের মতো। সম্পর্কের বুনিয়াদটা ঠিক কীসের ওপর, সায়ন্তনি জানে না। সায়ন্তনির মনে হয়, সামাজিক চক্ষুলজ্জা, আর্থিক নির্ভরতার বুনিয়াদ। মন সেখানে গৌণ। জানে না ওর মনে কী চলছে। অরণিরও সায়ন্তনির ব্যাপারে আগ্রহ নেই। অথচ বৈবাহিক বন্ধন।

অরণি মৌন, নিস্পৃহ ফ্যালফ্যাল জানলার বাইরে তাকিয়ে। তার নিজের দুনিয়া সায়ন্তনির উষ্ণতার এক্সপেরিমেন্ট। সমঝোতা টালমাটাল। ছন্দপতন। খটকা লাগল সায়ন্তনির।

বুঝতে পারছে না, কোথায় গরমিল “আগে বই পড়তে, টিভি দেখতে। এখন তাও দেখ না”

“ভালো লাগে না”

ছিপছিপে রোগা কালো তো ছিলই, এখন আরও শুকিয়ে গেছে। তাকানো যায় না। একা ঘরে লাইট নিভিয়ে শুয়ে থাকে। নাইটির ফিতে বেঁধে কিচেনে রান্নাটা সেরে ফেলতে হবে। নইলে অনাহার। তেমন সময় লাগে না। বিনোদিনী দাসী সকালে ঘর মুছে, বাসন ধুয়ে, কাপড় কেচে যায়। অরণি অফিসে বেরলেই সায়ন্তনি বেরিয়ে পড়ে বৈচিত্র্যের খোঁজে। রাতে ভাত খায়নি “কাল খাওনি?”

উত্তর নেই। বেরিয়ে, উঁকি মারল ওর ঘরে। অগোছালো। আগে এমন ছিল না? যখন বৈঠকখানা লেনে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকত শিয়ালদহের জনস্রোতে। একটু তফাত। তখন স্বপ্নের বুনিয়াদ ছিল। আজ সব হারিয়ে গোলমেলে। তার চারপাশে যা ঘটছে তা একা বহন করাতে অপারগ।

বালিটিকুরির প্রদীপ সেন এগোবার স্বপ্ন দেখত। সেই ফাঁদে পা দিয়ে সিবিআই হেফাজতে। ইন্টারনেটে ড্রাগ ফার্মেসি খুলে বিদেশে ভায়েগ্রা বিক্রির প্রবঞ্চনায় নন বেলেবেল ওয়ারেন্টে হাজতে। স্বপ্নের মিনার থেকে বহুদূর। একদিন ছাড়া পেল। জেল ফেরত আসামি। স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। অরণি আহামরি স্বপ্ন দেখত না।

ঘরের স্বপ্ন সায়ন্তনির দৌলতে বহুদিন আগে চুরমার। আশাও নেই। বিদিশার সাংস্কৃতিক ছোঁয়াও আর নেই। ইচ্ছে ছিল ওকে বিয়ে করবে। বলতে সাহস পায়নি। সায়ন্তনি ডিভোর্স দেবে না। এমন নিশ্চিন্ত আস্তানা ছাড়লে লীলাভূমি হারিয়ে যাবে। বিদিশা যাওয়ার পর সব শূন্য। ক্রমশ যেন, তার থেকে দূরে সরে গিয়ে, একেবারে খেলা শেষ করে দিতে চাইছে... অরণির পৃথিবীতে, তবে রইলটা কী? তাই এখন কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই।

ডিম-পাউরুটি টেবলে রেখে ডাকল "এস, খেয়ে নাও। ব্রেকফাস্ট রেডি করছি"

উত্তর নেই। আবার ঘরে দেখে "আদিখ্যেতা করতে হবে না। খেয়ে নাও"

"তুমি খেয়ে নাও"

সায়ন্তনি রূঢ় "নাও এস" সায়ন্তনির মেজাজ জানে। অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। উঠে টেবলে। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। এমন আগে হয়নি। ভয় করছে। সুলগ্না ঠাট্টা করেছিল 'পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো?' মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পাগল হলে সংসার চলবে কী করে? ও তো চাকরি-বাকরি করে না। রক্ষণাবেক্ষণটাও ঘাড়ে পড়বে। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবে? বাবাকে জানাতে হয়। মাকে বলা অর্থহীন। এই বয়সে সৌন্দর্যচর্চায় এত ব্যস্ত, সময় কই? কিটি পার্টিতে কে কী বলল, কে গুরুত্ব দিল - মার পৃথিবী এতেই সীমাবদ্ধ। ন'মাস পেটে ধরার ধৈর্য ছিল কী করে? বাবার চাপে বা প্রেমে বাচ্চা পয়দা করে খালাস। বাকিটা বাবাই। স্কুল, কলেজ, বিয়ে। এবারও বাবাকে জড়াতে হবে। তবে ওখানে আর ফিরতে চায় না। এখনকার জীবনযাত্রায় অসুবিধে।

পাশের ঘরে রনিতের ফোন। এতদিন পর! ট্যানিয়ার ঝামেলা থেকে কী বেরিয়েছে? "কেমন আছ? অনেকদিন কথা হয় না। আমাকে তো ভুলেই গেছ"

রনিতের আবার সুড়সুড়ি। নাকি আজ কেউ জোটেনি? মনোলীনার কেটে পড়াই স্বাভাবিক। কেউ বেশিদিন একজনকে নিয়ে পড়ে থাকে না। নিত্যনতুন বৈচিত্র্যের খোঁজে। ধান্দায় সীমাবদ্ধ। গতিময় জীবনে থামলেই মুশকিল। পিছিয়ে পড়তে হবে। ছোটার মধ্যেই বাঁচার আনন্দ।

"ভুলব কেন? এতদিন পর!"

"শর্বরী বসু আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। যাবে?"

"আমায় নেমন্তন্ন করেনি"

"আমায় করেছে, উইথ মাই গার্লফ্রেন্ড। ইউ আর মাই অল-টাইম গার্লফ্রেন্ড। কেয়ার টু অ্যাকম্প্যানি মি?"

"আর কেউ জোটেনি?"

“আই মিস ইউ”

“অল অফ এ সাডেন?”

“অনেকদিন ধরেই ভাবছি। সি ইজ ভেরি ইনফ্লুয়েনশিয়াল। এক্সিলেন্ট কম্প্যানি টু”

“ট্যানিয়ার মতো কোনও স্ক্যামে জড়িয়ে পড়ব না তো?”

“নো ওয়ে। মনোময় ইজ নট ইন দ্য পিকচার”

মেয়েলি কৌতূহল চাপতে না পেরে বলল “মনোলীনা?”

সায়ন্তনির মনে পড়ল, সে রাতে পার্টিতে রনিত বলেছিল “উই আর ইন লাভ”

ভালোবাসা কী? মধ্যরাতের উন্মাদনা? গালে গাল ঠেকিয়ে চুমু? পিত্তি জ্বলে গেছিল। ভাটের সিরিয়াল হিরোইন। নাঙ্গা অবস্থায় কেউ দেখবে না। সিরিয়ালের স্টারলেট হলেই সেক্স অ্যাপিল? লিপস্টিক মেখে ফ্লার্ট করছে। টিভির পর্দায় মুখ দেখাতে পারলেই সেলেব। তাতে কি উন্মাদনা বাড়ে? উন্মাদনা কি দেহে, না সেলেব স্ট্যাটাসে? সায়ন্তনি বোঝে না।

“নো। সি ইজন্ট দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। নাউ লিভিং টুগেদার উইথ এ ওল্ড ম্যান”

“হু ইজ ইট?”

“ওন্ট সে। ফাইন্ড আউট”

শর্বরী বসুর নাম শুনেছে। ইনফ্লুয়েনশিয়াল অ্যান্ড হেল্পফুল। আলাপ হলে মন্দ হবে না। অরণির যা অবস্থা, তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় দানা বাঁধছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার সোপান শর্বরী বসু “ওয়েল দেন, উইল প্লে ইওর গার্লফ্রেন্ড টুনাইট”

“মাই প্লেজার। শর্বরী বসু আলিপুরে থাকে। পিক ইউ ফ্রম ইন ফ্রন্ট অফ বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম অ্যাট সেভেন থার্টি"

“ডোন্ট। আই উইল টেক মাই ওন কার” সায়ন্তনির মাথায় অন্য চিন্তা “সি ইউ অ্যাট...”

“তাজ বেঙ্গল”

“বেশ। ওখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব। সাড়ে সাতটা। ডোন্ট বি লেট”

ফোনটা কেটে ডাইনিং রুমে এসে দেখল অরণি নেই। টেবলে কিছু ডিম-পাউরুটির টুকরো। খেয়েছে, অগোছালো। মাঝখান থেকে খাবলা করে। পরিষ্কার করতে লাগল। এত অগোছালো আগে ছিল না। রান্না, ঘরের কাজ, ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো কাচা সকালের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। অরণির দিকে তাকাবার সময় নেই।

ঠিক সাড়ে সাতটায় সায়ন্তনি গাড়ি নিয়ে তাজে। রনিত এগিয়ে এল "রেডি ফর দ্য পার্টি"

"মুভ অন। ফলো ইউ"

আলিপুরে শর্বরী বসুর বিরাট বাড়ি। ড্রাইভ-ইনের বাঁ দিকে লন। চেয়ার সাজানো। একধারে লম্বা টেবলে কেটারার খাদ্য, পানীয় সাজিয়ে রেখেছে। বিয়ার, হুইস্কি, ভডকা, বাকার্ডি, জিন। বেয়ারা কাবাব স্ন্যাক্স সার্ভ করছে। পেছনে পুরনো দোতলা বাড়ি। বর্ষার জলে দেওয়ালে শ্যাওলা। বোঝাই যাচ্ছে অনেকদিন রং হয়নি। দোতালায় ওপরের ঘরে আধুনিক সরঞ্জাম। লন থেকে কয়েকটা সিঁড়ি পেরলেই ড্রয়িং রুম। দুখানা ঝাড়। প্লাস্টার অফ প্যারিসের গোলাপি দেওয়াল। চামড়ার সোফা কাচের সেন্টর টেবল ঘিরে। ক্যাবিনেটে নানান কিউরিও। দু-পাশে বেশ কয়েকটা দরজা, লাগোয়া ঘরগুলোর জন্য। চারকোণে লম্বা ট্যানয় লাউডস্পিকার। তার থেকে উদ্দাম আওয়াজ ছেয়ে ফেলেছে গোটা চত্বর। হিয়ার ইজ দ্য পার্টি টুনাইট।

রনিতের সঙ্গে এগোতে এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ জরির কাজের কালো শাড়ি-ব্লাউজ। ব্লাউজটা ব্রায়ের চেয়ে স্বল্প। ফর্সা নাভি উন্মুক্ত। মেদ থাকলেও ভুঁড়ি নেই। কোমরের দড়ি কষে বাঁধার জন্য প্রকট। বেলি ডান্সের জন্য আদর্শ।

রনিত হেসে এগিয়ে বলল "মিট মাই গার্লফ্রেন্ড সায়ন্তনি। সায়ন্তনি নাগ"

বুঝতে পারছে এই শর্বরী বসু। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, হাতে হুইস্কি "মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম" বেয়ারাকে ডাকল "হোয়াটড্রিঙ্ক উড ইউ প্রেফার?"

"ভডকা উইথ কোক" সায়ন্তনি বেয়ারাকে অর্ডার দিল।

"কী হুইস্কি আছে?" রনিত প্রশ্ন করল।

"রয়েল চ্যালেঞ্জ, অ্যান্টিকুইটি, টিচার্স"

"টিচার্স। জল মিশিয়ে"

বেয়ারা চলে যেতে শর্বরী বসু আপাদমস্তক দেখল সায়ন্তনিকে। মুখটা কোনও কালেই চলনসই নয়। শর্বরীর চোখ ওর পর্বতপ্রমাণ বুকে। হলুদ লো-কাট ব্লাউজের ওপর দিয়ে তিন-চতুর্থাংশ বেরিয়ে। হাল্কা সিফনের হলুদ শাড়িতে ঢাকা। তোমার হাসি, আমার বুক। চোখে চোখে খেলা।

"কোথায় থাকেন?"

"রুবির পাশে"

"ইসিটিপি টাউনশিপে?"

"না। ওর পাশে"

রনিতকে বলল “দেখো ওনার কোনও অসুবিধা না হয়। সায়ন্তনির দিকে ফিরে “নিজের মতো করে নেবেন। আসছি”

অন্যান্যদের দেখাশোনা করতে পার্টির ভিড়ে হারিয়ে গেল। সায়ন্তনি চেয়ে ওর দৌদুল্যমান নিতম্বের ছন্দে। পঁয়ত্রিশ বছরেও দেহের বাঁধুনি আটুট। এই জন্যেই কী নামী সোশালাইট? আর্থিক প্রাচুর্য, জনদরদি মনোভাব? মনে হয় তৃতীয়টাই। কেউ নিজের জন্য অন্যের কাছে প্রাধান্য পায় না। শর্বরী বসু বিত্তবানই নয় অতিথি আপ্যায়নে পারফেক্ট। তাই তার কদর। সবাই আমিকে গোছাতেই ব্যস্ত। সেখানে যে অস্তিত্ব নেই ক'জন বোঝে? আমি যখন তুমিতে, তাতেই পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ। বোঝে না বলেই মিথ্যে স্বীকৃতির লোভে বিছানায় শুচ্ছে, ছবি ছাপাবার ধান্দায়। নিজের ব্যাপ্তিতেই তার প্রকাশ। সোশালাইট শর্বরী বসু নিশ্চয়ই এই সত্যটা বুঝে ফেলেছে। তাই আনন্দে ভাটা নেই। নেই বিলীন হওয়ার সংশয়।

রনিতের ইঙ্গিতে লনে বসল। বেয়ারাড্রিঙ্কস রেখে গেল।

“চিয়ার্স”

সায়ন্তনি ঘুরে ঘুরে দেখছে। উচ্ছল পরিবেশ। নিজেদের মধ্যে সবাই গল্প করছে। বেশিরভাগই অচেনা। বেশভূষায় কলকাতার উচ্চ সম্প্রদায়ের। টিভি, সিরিয়াল, মিডিয়ার জগৎ থেকে এদেরটা আলাদা। এই দুনিয়ায় আগে আসেনি। জলসাঘরের জমিদার ক্লাস। বনেদি আর উঠতি কেউকেটার মধ্যে বিস্তর তফাত। এরাই রাজা। সে যে দুনিয়ায় ঘুরেছে, ইংরেজি ফুটানি আধুনিকতায়ও তারা প্রজা। উচ্ছল ইংরেজিয়ানার ঔদ্ধত্য এদের কাছে নগণ্য। অসহায়ের মতো মনে হল, সে শেখেইনি এই দুনিয়ায় মিশতে। অথচ এরাই তার ভবিষ্যৎ চাবিকাঠি। সিন্দুকের সামনে ঠিকই। চাবিটা কোথায় জানে না। যে দুনিয়া ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য অন্যের মুখ চেয়ে, সে ভবিষ্যতের কোন নিশানা দেবে? অর্থের টিকিটা যাদের বাঁধা তারা কী করে অন্যের সহায়ক হবে? ভাগ্যিস, রনিত ডেকেছে।

রনিতই ভরসা “হাউ কাম ইউ নো শর্বরী বসু?”

“সি ইজ এ জেম। ডিভোর্সের পর সি ইজ অলোয়েজ অন দ্য লুক-আউট ফর নিউ ওয়েজ অফ এন্টারটেনমেন্ট। আই টু অ্যাম লুকিং ফর ফান। ন্যাচারালি উই মিট সামহোয়ার”

“হোয়ার?”

“ইন বেড অবভিয়াসলি। সি ইজ এ জেম অফ এ এন্টারটেনার। এক্সিলেন্ট হোসটেস অ্যাজ ওয়েল। ট্যানিয়াকে নিয়ে পার্টির মেন আর্কিটেক্ট”

“সেদিন কী হয়েছিল?”

“হোস্টেড দ্য পার্টি। ওয়েল, শর্ট অফ অর্গি”

"শর্বরী বসুর ডিরেকশনে?"

"প্রেসাইজলি। উই ওয়ার গেটিং টায়ার্ড অফ আওয়ার সেক্সুয়াল রাঁদেভুস। শর্বরী বলল লেটস হ্যাভ অ্যান অর্গি। আমিও ভাবলাম, হোয়াই নট? ট্যানিয়াকে ডেকেছিলাম, বিকস শর্বরী ওয়ান্টেড এ নিউ চিক। ডিডন্ট রিয়েলাইজ সি উড স্ক্রু ইট আপ"

"কী হয়েছিল?"

"নাথিং মাচ। উই ওয়ার এনজয়িং টুগেদার, হোয়েন ট্যানিয়া অ্যান্ড মনোময় ডিসাইডেড টু গো হোম। থট দে ওয়ান্ট টু ফাক অ্যালোন। লেট দেম। মে বি অ্যাট ট্যানিয়াস। ইট উড হ্যাভ বিন বেটার। পুলিসি ঝামেলায় জড়াতে হত না। লেটার আই হার্ড দে ডিসাইডেড টু গো ফর এ লং ড্রাইভ। বাকিটা শোনা। মনোময়ের গাড়ি পাংচার হয়েছিল। টায়ার রিপ্লেস করতে যাওয়ার সময় কে পেছন থেকে বাড়ি মারে। হি বিকেম আনকসাস"

"ট্যানিয়া?"

"মনোময় বলছে, ও কিছু জানে না। আই বিলিভ হিম। শুনেছি ফিউ রাফিয়ান্স টুক দেয়ার টার্ন টু রেপ ট্যানিয়া"

তাহলে যেটা শুনেছে, সত্যি। খবরটা মিথ্যে নয়। তাই ঘটেছে বলেই ট্যানিয়ার ভুলে যাওয়ার ভান। ইয়ং মেয়ে। সারা জীবন পড়ে। যেখানে কালপ্রিটকে আইডেন্টিফাই করা যাবে না, সত্যি বলে কী লাভ? বদনাম বাড়ানো ছাড়া। বাজনা জোরে চললেও কেউ নাচছে না। ছোট ছোট জটলায় গল্প করছে। বেয়ারাকে ইশারায় ড্রিঙ্কস রিপিট করতে বলল। শর্বরী এক গ্রুপ থেকে আরেকটায়। বকে চলেছে। কার হাতে ড্রিঙ্কস নেই, কে স্ন্যাক্স পাচ্ছে না লক্ষ করে তদারকি করছে। নো ডাউট, অ্যান এক্সিলেন্ট হোস্ট। রনিত তৃতীয় পেগে। ওর চোখ পার্টির অন্যান্য মেয়েদের দিকে। কাকে তোলা যায় আঁচ করছে। সায়ন্তনি যে রনিতের অভিসার নয়, জানে। হতেও চায় না। ওর লক্ষ্য শর্বরী। মহিলাকে দিয়ে যদি কিছু কাজ হয়। রনিত উঠে পড়ল। বোধহয় কাউকে পেয়েছে "বসো। আসছি"

চোখ ঘুরিয়ে শর্বরীকে দেখছে। পাশের টেবলে কথা বলছিল, ওর চোখে চোখ পড়েতেই "এক্সকিউজ মি" বলে উঠে এল।

"এ মা, আপনি একা?"

"আই অ্যাম ফাইন। এনজয়িং মাই ড্রিঙ্ক"

"স্ন্যাক্স নিয়ে এস" বেয়ারাকে ইঙ্গিত "ইউ লুক লাভলি ইন দ্য ইয়েলো ড্রেস"

কী আছে এই মহিলার, যা পুরুষকে আকৃষ্ট করে? হাসিটাই কাফি। নজর টানার পক্ষে যথেষ্ট। গোলাকার মুখে হাসিটাই মাখানো। প্লাক করা ভ্রু, চোখের নীচে পাতলা কাজলের রেখা। কালো শাড়ির সঙ্গে মানানসই। পাতলা ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক। অ্যারিস্টক্র্যাসি আছে। উগ্রতা নেই, আকর্ষণীয়। যৌনতা নেই, মাদকতা। স্বচ্ছন্দ সাবলীল।

"থ্যংকস। পার্টিটা ভালো অর্গানাইজড্"

"আই লাইক এভরিথিং মেটিকুলাসলি ডান। আপনার শাড়িটা দারুণ। কোত্থেকে কিনেছেন?"

"প্রিয় গোপাল বিষয়ী। আপনার শাড়িটাও সুন্দর। আপনার নাম অনেক শুনেছি। আলাপের ইচ্ছে ছিল। রবাহূত হয়েই চলে এলাম"

"রবাহূত কেন বলছেন? পরিচয় থাকলে, নিজেই নেমন্তন্ন করতাম। গুড টু নো ভেরিয়াস টাইপস অফ পিপল"

ড্রিঙ্কসে চুমুক। ব্যাগ থেকে ইন্ডিয়া কিংস বার করে অফার করল। একটা তুলে বলল "থ্যংকস্"

সিগারেটটা ধরাতে চোখ পড়ল সায়ন্তনির ক্লিভেজে। ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা। আরেক ঢোক হুইস্কি। চোখ সায়ন্তনির বুকের খাঁজে। লক্ষ্য এড়ায়নি সায়ন্তনির। এটাই ওর সম্পদ। কালো চেহারায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কালীশেখর, রনিত, ট্যানিয়া, সুলগ্না - সবাইকে আকর্ষণ করে ওটাই। সব মেয়েরই আকর্ষণ আছে। খুঁজে নিতে হয়। শর্বরীর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝল, আসা সফল।

শর্বরী উঠে পড়ল "না বলে বাড়ি যাবেন না"

স্ন্যাক্সে কামড় দিল "সিওর। প্লিজ ক্যারি অন উইথ দ্য আদার গেস্টস"

রনিত দূরে একজন অল্পবয়স্কা সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে গ্যাঁজাচ্ছে। মানে রাতে ফিট হয়ে গেছে। সায়ন্তনিকে কাটাতে হবে না। ওর সান্নিধ্য আকৃষ্ট করে না। ভালোই হয়েছে। ও নতুন মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করুক। সেই ফাঁকে ঝাড়া হাত-পা ভবিষ্যতের আখের গোছাতে পারবে।

রনিতের বাবার অঢেল টাকা। এক সময় স্টিভেডরিং বিজনেস ছিল। এখন আর নেই। তবে অন্যান্য যা আছে, ওর চার পুরুষ কিছু না করেও খেতে পারবে। থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটটা জন্মদিনে দিয়েছে। ওর সান্ধ্যবাসর। রাতের হারেম। এই মেয়েটিকে ওখানেই তুলবে। কত রাত ওই ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে, সাক্ষী দেওয়ালগুলো। যদি এরকম একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারত। শর্বরীর মতো আলিপুরের প্রাসাদ প্রয়োজন নেই। নিজের সাজানো ফ্ল্যাট। যেখানে নিজের মতো থাকতে পারে। .অরণিকে দিয়ে হবে না, বুঝে গেছে। এমন চেহারাও নেই, অন্য কাউকে সারা-জীবনের জন্য ফাঁসাতে পারবে। সময় হয়েছে দু-পায়ে দাঁড়াবার। এবার জিতবে। আর্থিক, মানসিক দিক দিয়ে। নতুন ছন্দে। শর্বরীই দিতে পারে সেই চাবিকাঠি।

আজকের মতো খাওয়া শেষ। সবাই বিদায় নিচ্ছে। এটা শর্বরীর ওয়াইল্ড পার্টি নয়। ড্রিঙ্কস খাওয়া-দাওয়ার পার্টি। আগে শুনছিল 'হাই', এখন শুনছে 'বাই'। উঠে পড়তেই দেখল রনিত মেয়েটির হাত ধরে এদিকে "ইউ হ্যাভ ইওর কার, হ্যাভেন্ট ইউ?"

"আই উইল মেক মাই ওন ওয়ে হোম। ক্যারি অন"

মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে গলার শব্দে ফিরে তাকাল "আর ইউ গোইং হোম?" মাথা নাড়ল "হোয়াটস দ্য রাস? এতক্ষণ ভিড়ে তো কথা বলাই হয়নি" শর্বরী বসু চেয়ার টেনে বসে পড়ল। সায়ন্তনিও।

"অ্যানাদার ড্রিঙ্ক?" সায়ন্তনির সম্মতিতে ইঙ্গিত করল বেয়ারাকে "রনিত চলে গেল?"

"হ্যাঁ। হি ফাউন্ড এ নিউ চিক্"

শর্বরী হেসে বলল "হি উইল নেভার চেঞ্জ। সেম ওল্ড রনিত। বাই দ্য ওয়ে, ডু ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইওর ড্রিঙ্ক হিয়ার অর ইনসাইড?"

"হোয়ারএভার"

শর্বরী উঠে পড়ল "কম অন দেন। লেটস গো ইনসাইড। গেটিং কোল্ড আউট হিয়ার"

শর্বরীর পেছনে একতলার ড্রয়িংরুমে। পুরনো হলেও আভিজাত্যের ছোঁয়া। হাতির দাঁতের আর্চওয়ে। ক'লাখ কে জানে? দেওয়ালে সাবেকিয়ানা। আসবাব পুরনো হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না মেহগনি বা বার্মা টিকের। পুরনো কাপড়ের সোফা। সাবেকি সেন্টার টেবল। এক কোণে কারুকার্য করা চাইনিজ ভাস। পাশের দেওয়ালজুড়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে। আয়নার সামনে বসে এক নারী "কার ছবি?"

"মকবুল ফিদা হুসেন। নাম শুনেছেন?"

"নিশ্চয়ই"

"একবার সানি টাওয়ার্সে আর্ট এক্সিবিশন করেছিলেন। ওখান থেকেই কিনেছি"

"আর্ট ভালোবাসেন?"

"ভীষণ। ইন ফ্যাক্ট আমার বাড়িতে প্রায়শই আর্ট এক্সিবিশন হয়। আই অ্যাম অ্যান আরডেন্ট কলেক্টর অফ আর্ট। বসুন"

বেয়ারা সাইড টেবলে ড্রিঙ্কস রেখে গেল। শর্ব্বরী গ্লাস তুলে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে দিল "প্লিজ"

"নো থ্যাংকস"

"জানি জীবনটা কোনও দিন বাষ্পের মতো মিলিয়ে যাবে। সো আই লিভ ফর টুডে অ্যান্ড মেক আদার্স লিভ সো। লাইফ ইস অল টু ডু উইথ আর্ট, মিউজিক, বিউটি অ্যান্ড সেক্স। জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে অনুভব করার আরেক নাম-ই জীবন। কবিগুরু বলেছিলেন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কলকাতার সোশালাইট রবীন্দ্রনাথ খুঁড়ছে। আশ্চর্য সায়ন্তনি। শর্বরী ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল "কবিতা গান সেক্স। ইনট্রিগাল পার্ট অফ লাইফ। ইফ ইউ ইগনোর ইউ আর মিসিং আউট অন লাইফ। ইফ আই ফ্যান্সি সেক্স উইথ ইউ, ইটস ফুলিশ টু সাপ্রেস ফিলিংস অ্যান্ড ডিসিভ মাইসেলফ"

সায়ন্তনি ঢকঢক করে ভডকা গিলল। কিছুর ইঙ্গিত? না নিছক মদের ঘোরে? এত সোজাসুজি কথা এর আগে শোনেনি। এই মহিলাকে তার প্রয়োজন। তা যদি সেক্সের বিনিময়ে হয়, ঠিক আছে। ওর প্রতি কোনও আসক্তি নেই। সামনে সোপান। একটা সিঁড়ি - নিলে নাও, ইচ্ছে না হলে ঠাকরাও।

ট্যানিয়াকে নিয়ে শুয়েছে। সুলগ্নাকে নিয়ে খেলা করেছে। সবটাই তার ইচ্ছেতে। নিছকই আনন্দের জন্য। এই প্রথম সে প্রশ্নের সম্মুখীন, যার উত্তর কখনও ভেবে দেখেনি। উত্তরের প্রতিদানে ভবিষ্যৎ হতে পারে। শুধু খেলতে হবে নিজের মতো করে। জেতো চাই হারো, এই তার সুযোগ।

"ইফ ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু সাবডিউ ইওর ফিলিংস্, আই শুডন্ট বি হিয়ার। লেটস্ গো টু মেক দিস এ মেমোরেবল নাইট"

ড্রিঙ্কস নিয়ে উঠে পড়ল "দেন কাম অন। লেটস্ ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য কোর" পাশের দরজা খুলল "কম ইন। ইউ মে হ্যাভ কাম অ্যাজ রনিতস্ গার্লফ্রেন্ড। উই উইল বি ফ্রেন্ডস টুনাইট"

তারপর ঠিক মনে নেই, কখন শর্বরী চুমু খেয়েছিল। স্তন নিয়ে খেলা করেছিল। নিপলে জিভ লাগিয়ে উষ্ণতায় ভরে দিয়েছিল। উরুর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে উত্তপ্ত করেছিল। গভীর অরণ্যে আঙুল বুলিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজেছে।

বিবস্ত্র অভিসারে শুধু একটাই প্রশ্ন "আই হ্যাভ গিভেন ইউ মাই অল। হোয়াট ইন রির্টান?"

প্রশ্নটা সায়ন্তনির নয়, নব-সভ্যতার। প্রতিদিনের হিসেব-নিকেশ। চাওয়া-পাওয়া, জেতা-হারা তো এতেই বন্দি। দুনিয়াদারির একটাই ভাষা - কী দিলাম আর কী পেলাম। এই অঙ্ক মেলাতে জীবনটা পার হয়ে যায়। ছোটা শেষ। তারপর? জানা নেই। কখনও ভাবার সময় হয় না, লেনদেনে আহামরি কী।

পাওয়া না পাওয়ার বাইরেও তো একটা জগৎ আছে। ফিরেও তাকাই না। জীবনের সংকীর্ণতা এই পাওয়া, না-পাওয়ার পরিসীমায় বন্দি। এর বাইরে ভাবার সময় মানসিকতা কোথায়? আছে কী বোঝবার এর বাইরে অন্য ব্রহ্মাণ্ডকে, যেখানে শান্তির বীজ লুকিয়ে। জেতা-হারার মোহে জীবন শেষ। জিতলে নিজেকে

বাহাবা, হারলে ঈশ্বরকে ধিক্কার। অথচ এর বাইরেও তো একটা বিশাল পৃথিবী আছে। আমাদের নিজস্ব। একান্ত আপনার।

সায়ন্তনি জানে না। অবকাশ হয়নি। সে তো হারের মাঝে জেতার চেষ্টা করছে। পারিবারিক জীবন হারের একটা স্তর। ট্যানিয়াকে পেয়েও হারানো আরেকটা। এবার শর্বরীর হাত ধরে জেতার পালা। উন্মুক্ত স্তনযুগল শর্বরীর হাতে সঁপে, আঙুলটা শর্বরীর ক্লাইটরিস নিয়ে খেলা করছে "ওয়ান্ট টু ডু সাম বিজনেস। সামথিং ফর কুইক সেকিওরড মানি"

"আর্ট। হোয়াট সেলস্ টুডে। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট?"

"ক্যান ইউ হেলপ মি?"

"শিওর। আই উইল। ডোন্ট টিকল্ মি ইন দ্যাট ম্যানার। ড্রাইভস্ মি ক্রেজি। ওহ মাই গড... গড হেল্প মি... ইউ আর এ জিনিয়াস"

জিনিয়াস হতে সায়ন্তনি চায় না। মানবী হতে চায়। আর পাঁচজনের মতো গড়তে চায় ভবিষ্যৎ। শর্বরীর ভালো লাগছে। ওর ভালো লাগা মানে, সে সোনার চাবির ঠিকানায়।

এখন শুধু অরগ্যাজমটাই বাকি।

বিশ

দু-ধারের অখণ্ড বিস্তৃত সবুজের সমারোহে, প্রশস্ত পথে ছুটে চলেছে গাড়িটা। মারুতি অল্টোর ড্রাইভিং সিটে বিদিশা। যার সঙ্গে সময় কাটাতে যাচ্ছে - সেটাও ধোঁয়াশা। হারজিতের খেলার বাইরে অনির্দিষ্টের পথে। এই ছোটাতেই আনন্দ। প্রাণের স্পন্দন প্রকৃতির মধ্যে। বাঁচার মন্ত্র। দৈনন্দিন কলুষে হারজিতের বাইরে বাধাবন্ধহীন গা ভাসানো। সমাজের সংকীর্ণতা থেকে দূরে, এখানে আছে, তার প্রতি মুহূর্তকে বরণ করে নেওয়ার এক অনাবিল ছন্দের প্লাবন। ইট-কংক্রিট এ ভাষা বোঝে না। সবুজের মেলার মাঝে সোজা রাস্তা। স্টিরিওতে বেজে চলেছে আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। মিষ্টি রোদ গায়ে উদ্দেশ্যহীন ড্রাইভ করার মধ্যে অন্য চার্ম। নিজেকে দেখা। ভালোলাগার মধ্যে জীবনের ঝংকার।

কবিতার ছন্দ আনে। ছোটবেলায় কবিতা নিয়ে বসলেই বাবা রাগ করত “পড়াশোনা না করে এসব কী করছিস? কবিতা লিখে পেট চলে না”

মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় লেখা কবিতার লাইনঃ

আজ যখন নিস্তেজ শ্মশানে দাঁড়িয়ে
ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের মতো
হারিয়েছি বিধ্বংসী লাভার স্রোতে
শ্মশান চুল্লির দ্বারে
আবার নতুন করে
তোমার উষ্ণ নিবিড় বুকে
বাঁচতে দাও
ছোট্ট একটা ধ্রুবতারা হয়ে।

শক্তিগড়ের ল্যাংচা মহলে থামল। ল্যাংচা ভীষণ ভালোবাসে। এ পথে এলেই পুরনো দোকানটায় ঢুকে পড়ে। শুধু খাওয়া নয় বুটে হাঁড়িও নিয়ে যায়। নাইবা হতে পারল ধ্রুবতারা। তবুও ছোট ছোট এই আনন্দ একান্তই আপনার। কবিতা লিখে পেট চালে না ছোটবেলায় জানত। জীবনটা কী শুধু টাকার পেছনে ছোটা? মন, আবেগও তো আছে। তবুও ফেলনা সুবিমলদার কাছে। নইলে ভালোবাসার পরিণতি বিছানায় হত না। রেপ? জানে না। অ্যালিগেশন করে নাটক ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ভার্জিনিটি লস্ট কান্ট বি রিগেইন্ড।

বিয়েতে ঘোর আপত্তি। পুরুষ জাতটার প্রতি ঘৃণা। থাকলে এভাবে ল্যাংচা গিলত না। দাদা মিষ্টি পছন্দ করত না। বাড়িতে মিষ্টি এলে তার জন্য বরাদ্দ। অভ্যাসটা এখনও থেকে গেছে।

ছোটবেলার বন্ধু রূপা ঠাট্টা করত "এত মিষ্টি খাস না। মোটা হয়ে যাবি। দাঁত খারাপ হয়ে যাবে" ঝকঝকে দাঁত দেখলে কেউ বলবে না দাঁত খারাপ। মোটা হয়নি বলেই বয়স বাড়লেও চেহারার জৌলুস আটুট।

হেসে উত্তর দিত "কিচ্ছু হবে না। দশ বছর পরেও এই সালোয়ার-কামিজ ফিট করবে"

রূপার বাচ্চা হয়ে গেছে। এখন যা চেহারা, সালোয়ার জিনস পরতে সাহস করবে না। শাড়িতে জড়িয়ে যুবতী থাকার চেষ্টা। বিয়ে পর্যন্ত মাপজোক। তারপর কেউ মাথা ঘামায় না। ছোটবেলায় দুজন হুটহাট করে বেরিয়ে পড়ত ট্রেনে। যেদিকে দু-চোখ যায়। যেখানে খুশি নেমে পড়ত। রিক্সায় সস্তার লজে। মা রেগে যেত। সোমত্ত মেয়ে। আজ বাদে কাল বিয়ে হবে। একা একা এভাবে বেরনো শোভা পায়? যদি কিছু হয়ে যায়।

"কিচ্ছু হবে না। ঠিক সামলে চলতে পারব" ডানপিটে মেয়ে কারও কথাই শুনবে না। চেঁচানোটাই সার। মা চুপ করে যেত। মাকে দমিয়ে ওরা দুজনে মুক্ত বিহঙ্গ। রূপার বাবার হার্ট অ্যাটাক। হুড়মুড় করে মেয়েকে শাঁখা-সিঁদুরে বিদায় দিলেন। চেনা বলয়ের অন্য পৃথিবীতে। বিদিশা আবার একা।

পরিবর্তনের জোয়ারে মিস ডস কুমারী থেকে উইন্ডসে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার নতুন বয়ফ্রেন্ড। ফিজিক্যাল অরগ্যাজম না হোক ইন্টেলেকচুয়াল তো দিতে পারে। কম্পিউটারে নতুন রসদ। পাস্টটাইমের মধ্যেও শেখা ছিল। ফেসবুকের মতো টাইম পাশ শুধু নয়। বহির্বিশ্বের হাতছানি। ইন্টারনেট বন্ধুত্ব। বে-নামে কখনও ছেলে কখনও বা মেয়ে সেজে চ্যাট। এরই মধ্যে সাংসারিক মানুষের নিঃসঙ্গতা। একাকী বাসনা। বিদিশা ইন্টারনেট ধরে এদের সুপ্ত জগতে। মানুষকে চেনা বিভিন্ন আঙ্গিকে।

আজ চলেছে অনির্বাণকে চিনতে। কম্পানির বাৎসরিক প্রোটোকলে হেলথ চেক আপ করাতে এসছিল। ডাঃ অগ্নিমিত্রা গুপ্ত চেক-আপের ফাঁকে ওর বাঁ ব্রেস্ট বড় থাকায় বিদিশার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বিদিশার কপালে অনির্বাণ।

"গাইনাকম্যাস্টিয়া। অনেকেরই থাকে"

"হর্মনের গন্ডগোল?" উৎসুক অনির্বাণ।

"বেশিরভাগটাই ইডিপ্যাথিক। কারণ জানা নেই। ইউসুয়ালি দুটো ব্রেস্ট সমান থাকে। আপনারটা আনকমন। নর্মাল ভ্যারিয়েশনের চেয়ে বেশি"

"ক্ষতি আছে?"

"এরেবাবেই নয়। পিওরলি কসমেটিক"

খেলার লোভ সামলাতে পারেনি বিদিশা। অনির্বাণ দেখতে খারপ নয়। হেসে বলেছিল "আপনার বউয়ের আপত্তি আছে?"

"কখনও করেনি। এখন অবান্তর। বিয়ের অনেকদিন তো হল। ঘর আর মেয়ে নিয়েই ব্যাস্ত। এক সুইস বান্ধবী প্রশ্ন করেছিল। পরে কথা বাড়ায়নি"

মানে বউ ছাড়াও অন্য মেয়ে আছে। এতদিন শুধু ওয়ান ম্যান নিয়ে খেলেছে। ভূত চাপল রোমিওকে নিয়ে খেলার। এই ভাসার জেদেই সংসারে জড়াল না। জুয়া খেলার অন্য আনন্দ। হারও আছে, আবার জিতও। বৈচিত্র্যও মেডিক্যালের গোল্ড মেডেলগুলো বাগিয়েছে। তার জিত। এমএস-এ প্রথম। আবার জিত। তবুও সুবিমলদার স্মৃতিতে হারটা ভুলতে পারে না। মজার খেলা। সবাই খেলছে। জিতলে আনন্দে উল্লাস করছে। হারলে দুঃখে মনমরা চোখের জল। মনে নিয়ে এলেই আবেগ।

অনুরূপদাকে আঘাত দিলেও কাবু করতে পারেনি। অরণিও ফিরে গেছে ঘরে। যা গেছে তা যাক। এবার শুধু দেহ মনের খেলা নয়। অন্য কিছু। যা আগে খেলেনি। অনির্বাণ আইডিয়াল বখরা। অনির্বাণও বিদিশাকে ছাড়তে চায়নি। সুইজারল্যান্ড থেকে ফেরার পর সুলগ্নার সঙ্গে সম্পর্কটা নেহাতই সামাজিক। উন্মাদনা চাই। লুসি জেদগ্রোভা না হোক, বিদিশার মতো স্বাস্থ্যবতী হলে মন্দ কী!

"বিয়ে করেননি?"

"সেরকম পেলাম কোথায়?"

"আপনার মতো সুন্দরী ডাক্তারের পাত্রের অভাব। পেশায় যদিও মেয়েদের নিয়েই বেশি কারবার"

"আপনি কী মেয়ে?" ভুবনমোহিনী হাসি।

"মেয়েদের মতো ব্রেস্ট থাকতেও সার্টিফাই করছেন ছেলে। অন্য প্রমাণও দিতে পারি"

বলেই চমকে উঠল। সুলগ্না শুনলে লজ্জায় বেগুনি হয়ে যেত। সাহস দেখে নিজেই আশ্চর্য। এভাবে কোনও বাঙালি মেয়েকে আগে বলেনি। কী যে ভূত চাপল। বিদিশাকে দেখে লালসা আবার জেগে উঠেছে। লুসি জেদগ্রোভা অন্য রূপে কলকাতায়। সুন্দরী মহিলা দেখলে জিভ লকলক করে। সুলগ্নার সঙ্গে বিয়েও ওই মুখশ্রী দেখে।

কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। সাহসের বলিহারি। দেখা যাক কত দম। দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইনে সে পরীক্ষা হবে। ওর অনাস্বাদিত পৌরুষ।

বলেছিল "দুসপ্তাহ পরে কনফারেন্সে দুর্গাপুর যাচ্ছি। দুপুরবেলার পর ফ্রি। বি মাই গেস্ট অ্যাট দ্য পিয়ারলেস ইন" ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

ল্যাংচা খাওয়া শেষ। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল। হাইওয়ে ধরে ড্রাইভ করছে। গন্তব্য জানা, উদ্দেশ্যও। আজকে নতুন রোমাঞ্চ চাই। যার নায়ক অনির্বাণ। সুবিমল না থাকলেও তো অন্যরা ছিল। জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। বাবা-মাও চেয়েছিল। বিদিশা তেমন কাউকে পায়নি।

বাংলাদেশের রিফিউজি পরিবার। বিদিশার মা চেয়েছিল মেয়ে বাঙাল বিয়ে করে। বাবার ঘটিতেও আপত্তি ছিল না। দাদু-দিদিমার কাছ থেকে বাঙাল ভাষাটা ভালোই রপ্ত করেছে। ঢাকায় গেলেই গুচ্ছ-গুচ্ছ ঢাকাই শাড়ি। টাকা থাকলে জামদানি সিল্ক।

মা বলত "ঢাকাই শাড়ি পরলে তোকে ভীষণ মানায়। পরিস না কেন?"

"ওই শাড়ি পরে ডাক্তারি করা যায়?"

"মাঝেমধ্যে পরলে পারিস। ভালোই লাগে"

পরার চেয়ে কেনার আগ্রহ বেশি। ঢাকায় গেলেই কাদেরি কিবরিয়া, সিমুল জামান বা লিজা আহমেদ লিসার সিডি কেনে। ফেরার পর মনে হয়, ভিন্ন দেশ হলেও কোথায় একটা নাড়ির বন্ধন। পদ্মার ঘ্রাণ। ইলিশের টান।

স্টিরিওতে বাজছে নীল দিগন্তে, ওই ফুলের আগুন লাগল। ফুলের আগুন দিগন্তে কতখানি লেগেছে জানা নেই, ওর সান্নিধ্যে অনির্বাণের নতুন বসন্ত। লুসি জেডগ্রোভার মধ্যে দেহের আমন্ত্রণ থাকলেও, আবেগ ছিল না। বিদিশাকে দেখে শুধু বাসনা নয়, প্রেমেও পড়েছিল।

"উইল ইউ হ্যাভ ডিনার উইথ মি?"

বিদিশা চমকে "খাওয়াবেন?"

"নিশ্চয়ই। মাই হনার। লেটস গো টু হায়াত রিজেন্সি। এক্সকুইজিট ইতালিয়ান কুসিন ইন লা কুচিনিয়া"

ফোকটে ভালো হোটেলে ডিনার। উপেক্ষা করতে পারেনি। জানলার পাশে বসে শ্যাটু রথচায়েল্ডে চুমুক দিয়ে অনির্বাণ জিজ্ঞেস করেছিল "এনি প্রেফারেন্স?"

"সামন। আপনার ভালো লাগে না?"

"ভীষণ। এখানের শেফ খুব ভালো করে। হি ইজ ফ্রম ইটালি"

মনে নেই কখনও সুলগ্নাকে এখানে এনেছিল কি না। ডাল চচ্চরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। বিদিশাকে এক্সপেন্সিভ হোয়াইট ওয়াইন স্মোকড সামন খাইয়ে যদি বাগে আনতে পারে। নয় একটু খরচ হল। প্রেম করবে খরচ করবে না তা কী হয়? রোমান্টিক বুলিতে বাগে আসবে না, ভালোই জানে।

ওয়াইনে চুমুক "আই হ্যাভ ফলেন ফর ইউ"

মুচকি হাসল বিদিশা "না বোঝার কী আছে? এমনি কেউ শ্যাটু রথচায়েল্ডের মতো ভিন্টেজ ওয়াইন খাওয়ায় না। এ বয়সে প্রেমে পড়েই বা কী হবে? বউ-বাচ্চা তো ছাড়বেন না"

"ছাড়তেও পারি" প্রন-ককটেল মুখে পুরল।

"কেন মিথ্যে বলছেন? আপনি কী আমার জন্য বউকে ডিভোর্স দিতে পারেন? পারেন না। করবেনও না। শুধু ফুর্তি ছাড়া"

"ইফ ইউ ফিল সো ইউ মাস্ট বি ইন ড্রিমওয়ার্ল্ড। বিলিভ মি, আই হ্যাভ রিয়েলি ফলেন ফর ইউ"

"আর ইউ শিওর?" চশমাটা খুলে তাকাল।

"পজিটিভ। উইল ইউ বি মাইন?"

সেই ইঙ্গিতেই পিয়ারলেস ইন। ব্যক্তিগত জীবনকে হারজিতের জুয়ায় দাঁও লাগানো যায় না। শান্তিটাই নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বিদিশা দেখতে পায় ছেলেবেলার ভালোবাসা সুবিমলদাকে। দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। লা কুচিনার ঢিমে আলোয় ওর দিকে তাকিয়ে অনির্বাণের ভেতরটা শিউরে উঠল। মিঠে অনুভূতিতে। ঠিক সেরকম, যখন প্রথম যৌবনে সুলগ্নাকে দেখেছিল। এখন অনেক ডিপ রুটেড। সুলগ্নার বদলে, যদি এই মেয়েটা বউ হত"

কোনও মেয়েকে ভালোবাসলেই তাকে বউ করতে ইচ্ছে করে। একবারও মনে হয় না, তাতে ভালোবাসা ম্লান হয়ে যাবে। পাপড়ি মেলা ফুল, দূর থেকে অনুভবের। ছুঁতে গেলে শুকিয়ে যাবে।

হেসে বলল "হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মাইন? আপনার বউ বাচ্চা আছে। হোয়ার ডু আই ফিট ইন?"

"ইন মাই হার্ট" স্পষ্ট অনির্বাণ।

"আপনাদের, ছেলেদের হার্ট মানেটা ঠিক বুঝি না। ভালোবাসাটা কী? কারও জন্য মন কেমন করা? না কি বুকের বোতাম খুলে দেখার ইচ্ছে?" হকচকিয়ে গেল অনির্বাণ। মেয়েটা অবলীলায় সত্যিটা দেখছে।

চুপ থাকতে দেখে বলল "উত্তর দিলেন না"

"উত্তরের কিছু নেই। দ্য প্রুফ অফ দ্য পুডিং ইস ইন ইটিং"

সেদিন শুধু ইটিং দিয়েই শেষ লা কুচিনার দামি সন্ধে। পরে আরও কয়েকবার দেখায় অনির্বাণের ভালোবাসা নিঃশব্দে গিলেছে। স্তুতি শুনতে মন্দ লাগেনি। বাড়তি পাওনা ভালো ভালো হোটেলে খাওয়া। মন্দ কী। এ জীবন ফুর্তির। বন্ধনের নয়।

পিয়ারলেস ইন। গাড়ি পার্ক করে অনির্বাণকে ফোন করতেই বেরিয়ে এল।

"পারফেক্ট টাইমিং। লাঞ্চ শেষ, মিটিং শেষ। আই অ্যাম ফ্রি" তিনতলার ডিলাক্স স্যুইটে সোফায় বসে বলল "তুমি বলতে পারি?"

"শিওর" বিদিশা পাশের সোফায়।

"ডাইনিং রুমে খাবে? না রুম সার্ভিস?"

"এখানেই। বেশি খিদে নেই"

এখানে বিদিশার সঙ্গে অভিসার। লুকিয়ে প্রেম করার মধ্যে আলাদা রোমাঞ্চ। শহরের বাইরে হলে বেড়ে যায়। ড্রাইভ করে আসাটাই সম্মতি। সেটা।

"দুপুরে ভাত খাই না। নান কিংবা রুমালি রুটি, বাটার চিকেন, গ্রিন স্যালাড। তুমি খাবে না?"

"হয়ে গেছে। কনফারেন্সে লাঞ্চ ইনক্লুডেড"

বিদিশার উপস্থিতিটাই ভালো লাগছে। সুলগ্নার বোরিং প্রেসেন্সের থেকে প্রাণবন্ত বিদিশার অনেক জৌলুস।

বিদিশা তাকাল "কী দেখছ?"

"তোমাকে"

"বুঝতেই পারছি"

অনির্বাণ উঠে বাথরুমের দিকে "বস। চেঞ্জ করে আসছি"

বিদিশা জানে পরের মুভ। সুবিমলদা, অনুরূপদা যা চেয়েছিল। অরণিও কী তাই? অসম্পূর্ণতা কোথায়? খাওয়া হয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত অনির্বাণ বেরিয়েই জড়িয়ে ধরল।

বিদিশা ওকে সরিয়ে বলল "তোমার ভালোবাসা শুধু এই?"

ঘাবড়ে থমকাল। দেহের খিদেতে হারাতে চায় না ওকে। সরতেই বুঝল আকর্ষণটা শুধু দৈহিক নয়। সিগারেট ধরিয়ে বলল "তোমার বউ কী বাজে দেখতে?"

"একদম নয়। তুমি ওর থেকেও বেশি। সি ইজ ফ্রিজিড। অলওয়েস ড্রাই"

কে শুনতে চেয়েছে বউয়ের সেক্সুয়াল ইতিহাস? কাঁদুনে অসহ্য। অনির্বাণের ভালোলাগা, না-পাওয়া, প্রতীক্ষা গুলিয়ে একাকার।

অনির্বাণকে কাঁপতে দেখে বিদিশা বলল "অমন করছ কেন? করতে দিইনি বলে? করলেই যদি পাওয়া পাজামাটা খুলে ফেল"

অনির্বাণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অপ্রস্তুত। দোটানায় পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে ফেলল। আন্ডারওয়ার খুলতে গিয়ে দেখে বিদিশা খাটের ওপাশের সোফায় সিগারেট খাচ্ছে "ওটা আর বাকি কেন? খুলে ফেল। আমি আছি"

আন্ডারওয়ার খোলার দৃশ্যে মনে পড়ে গেল সুবিমলদাকে। ওর নিষ্পাপ ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে অপবিত্র করে চলে গেছে। আজ ইংল্যান্ডে সুখের জীবনে। ভুলেও গেছে লিপিকার বাড়ির দুপুরের স্মৃতি। দেহের খিদে মিটিয়ে, ছোবড়ার মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। রেখে গেছে বুকভরা ব্যথা। অসহ্য জ্বালা।

এখন দাবাগ্নি। অনুভবও করবে না দেশে এক অসহায় মেয়ের কান্না। ভেতরের হাহাকার। নিঃশব্দ ফল্গুধারায় তছনছ করে দিচ্ছে সত্তাকে। এই দাবানল থেকে মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই।

উদ্ধত অনির্বাণ অপেক্ষায়। ওই তো আসছে জড়িয়ে ধরতে। চোখ বুজল। ভালোবাসার স্পর্শ, ছোঁয়া, চোখ বুজে অনুভব করতে চায়। তীব্র যন্ত্রণায় মাথা ঘুরে গেল। অন্ধাকার। ব্যাথায় অণ্ডকোষ দুটো ফেটে যাচ্ছে। গোঙাতে লাগল। এ তো চুম্বন নয় যার আশায় চোখ বুজে অপেক্ষা করছিল। বিদিশা হাঁটু দিয়ে সপাটে মেরেছে উলঙ্গ যৌবনে। বোঝবার আগেই বিদিশা সোফায় পড়া ব্যাগটা তুলে গাইছে আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো।

নব-বসন্ত তীব্র যন্ত্রণায় মলিন। খাটে কাতরাচ্ছে। প্রেম-ভালোবাসা উবে গেছে। শুধু ব্যথা, অণ্ডকোষ থেকে মাথা পর্যন্ত। ওর অবয়বটা ঝাপসা। বিদিশার ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিষ্টি তির্যক হাসি। গলায় রবীন্দ্রসংগীত **আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো**। গাইতে গাইতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একুশ

সীমা নির্বাক পাথর। কথা নেই। থম মেরে গেছে। হজম করে উঠতে পারছে না। এই ক'মাসে যে এভাবে ঝড় উঠবে জানত? কী-ই করতে পারত? কেউই জানে না। খালি প্ল্যান-প্রোগ্রাম।

রুমা সীমার দিকে এগিয়ে বলল "কিছু খেয়ে নে"

সীমা জানলার বাইরে তাকিয়ে "তোরা খেয়ে নে। ইচ্ছে করছে না"

রুমা কী বলবে ভেবে পেল না। আড়চোখে চেয়ারে বসা দেবজিতের দিকে তাকাল। উত্তর খুঁজছে। পরশু রাত থেকে কাজকর্ম ফেলে দেবজিৎ এখানেই। রাতে সীমা বাড়ি ফিরে আবার সকালে এখানে। এ মুহূর্তে সীমার পাশে দাঁড়ানোটাই বড়। দেবজিৎ মোবাইলে এখানে বসেই অফিসের কাজ সারছে। চোখের ইশারা করল রুমাকে। জিজ্ঞেস কর না। খাওয়াটা নিয়ে এস। রুমা কিচেনে ঢুকল।

দেবজিৎ চেয়ার ছেড়ে সীমার পাশে "এবার কী করবে, কিছু ভাবলে?"

ওর স্বরে জমা দুঃখের পাহাড় আছড়ে পড়ল চোখে। লোকটা পাশে দাঁড়ালেই শান্তি। বেশি কথা বলে না। যা বলে হৃদয়স্পর্শী।

"কিছুই বুঝতে পারছি না" সংশয়টা স্পষ্ট।

সীমা কাঁদছে। কাঁদুক। দুঃখ ধুয়ে দিক। হাল্কা হয়ে যাক। যাতে সামলাতে পারে নিজেকে "বুঝতে হবে না। তাঁর ওপর ছেড়ে দাও"

"তোমার মতো যদি ছেড়ে দিতে পারতাম। পারি না। সবই তো হারালাম। বাঁচব কী নিয়ে?"

"জানি না। জবাব জানা নেই। শুধু জানি, তিনি যখন দুঃখ দিয়েছেন, পথও বাতলাবেন" ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দুঃখে বিচলিত না হয়ে নিশ্চিন্ত।

"পথ হারিয়ে গেছে। আর কিছু কী পড়ে রইল?"

"নিশ্চয়ই। তুমি জান না। যতদিন জীবন ততদিন পথ"

"কোন পথ?"

"বিবেক আর সুযোগ বলে দেবে। অপেক্ষা ছাড়া কিছু করার নেই"

কে সারা সারা, হোয়াট উইল বি উইল বি দ্য ফিউচার ইজ নট ফর আওয়ার্স টু সি। সীমাও জানে। তবু মন মানতে চায় না। ঈশ্বরে সমর্পণেও দ্বিধা, সংশয়, আস্থার অভাব। সিচুয়েশনের দখল নেওয়ার মিথ্যে

প্রচেষ্টা। অবচেতনে সেই প্রচেষ্টাই করছিল সীমা। তাই সংশয়, অতৃপ্তি। বুঝতে পারলেও সীমাকে কী করে বোঝাবে দেবজিৎ।

ভাবলেশহীন বাইরে তাকিয়ে সীমা বলল "না গেলেই পারতাম। ও চায়নি। আমিই জোর করছিলাম। মোটা টাকার লোভ সামলাতে পারিনি"

"রুমা খাবার বেড়েছে। এস খেয়ে নিই"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবার টেবিলে "টাকার লোভে জয়ন্তকে হারালাম"

"গলসির কাছে এর আগেও অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তোমাদের রাতে ড্রাইভ করা ঠিক হয়নি। সারি সারি লরি। লাইটও তেমন নেই। গাড়িগুলো স্পিড লিমিট মানে না। রাতে কোথাও থেকে গেলে পারতে। ফোন করলে ব্যবস্থা করে দিতাম"

"করতেই পারতাম। ও বলল সকালে রেকর্ডিং। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার। আমিও সায় দিলাম। বুঝতে পারিনি সর্বনাশ হবে"

"হয়ত হওয়ারই ছিল। নিয়তি..."

"মন তো মানে না"

রুমা রুটি ঝিঙেপোস্ত বেড়ে বলল "নিজেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সত্যিই আশ্চর্য। তুই বেঁচে গেলি"

"ইমপ্যাক্টটা ওর দিকেই বেশি ছিল। আমার দিকেও কিছুটা। জানলার কাচটা ভাঙল। হাত না কেটে ঘড়ির কাচটুকুই শুধু চুরমার"

খাওয়া মুখে দেবজিৎ বলল "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে"

"আশ্চর্য। তাই না দেবজিৎদা?"

"ওটা ভবিতব্য বলে মেনে নিতে পারলে জয়ন্তরটা কেন নয়?"

ভবিতব্য বটেই। না হলে, এ ক'মাসে সীমার দুনিয়া এমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়? অভিষেক সরকারের মৃত্যু দিয়ে যার শুরু। জয়ন্তর মৃত্যুতে কী শেষ? না এর পরেও... হোয়েন ইট রেইনস্, ইট পোরস্। ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়ে নিয়ে সুদিনের প্রতীক্ষা।

"মুখে বলা সহজ, মেনে নেওয়া কঠিন। সবাই তো তোমার মতো নয়। সহজেই মেনে নিতে পারে"

মনে পড়ল দেবজিতের বাবার মৃত্যু। সত্তর বছর বয়সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত। ওকে কাঁদতে দেখেনি। নিস্পৃহ, নির্বিকার।

রুমার কথায় 'একটুও চোখের জল ফেলতে দেখলাম না' সীমার মনে হয়েছিল "এ কী রে বাবা, এও হয়!"

“কী করবে ঠিক করেছ?”

মাথা নাড়ল। আবার কি সকালে রেওয়াজে বসতে পারবে? নতুন সুরের ঝলকানিতে মাতাতে পারবে। এখন সে একা। জয়ন্ত নেই। অভিষেক সরকারও নেই। এগোবার প্রেরণাও নেই। অভিষেক সরকারের মৃত্যুটা মেনে নিলেও জয়ন্তরটা মানা কঠিন। গাড়িটা জয়ন্তই চালাচ্ছিল। বাঁ দিকের লেনে লরির সারি। ডান লেনে মাঝারি স্পিডে। স্টিরিওতে ওরই গাওয়া গান হিমেরও রাতের ওই গগনের দীপ গুলিরে, হেমন্তিকা। অন্ধকারে হেড-লাইটের আলোয় যতটুকু দেখা যায় “আজকের ফাংশনটা ঠিক জমল না”

“আমার গান খারাপ হয়েছে?”

“না। শ্রোতা ভালো ছিল না। লারেলাপ্পা গানেরই বেশি”

“মফসসলে এসব গানই পছন্দ করে। রাগাশ্রয়ী চলে না”

“হিন্দি সিনেমা যেভাবে ঢুকে গেছে, আমরা সেভাবে পারিনি”

“গান ছাড়াও স্টার ইমেজ কাজ করে। বাংলায় সেরকম কেউ নেই। উত্তমকুমারের পর সেরকম কারও ইমেজ, গ্ল্যামার নেই। শুধুই সুরে চলে? প্রেজেন্টেশনের লোকও চাই”

“ঠিক বলেছ। গান ইন্ডিভিজুয়েল এন্টিটি নয়। সম্পূর্ণ প্যাকেজিং। তুমি সেক্সি সুর দিলে। আমিও যতটা সম্ভব আবেগ দিলাম। অথচ ফিল্মের হিরোইন যাত্রার ড্রেসে। লোকে নেবে কেন?”

“নেবে না। অক্ষমতা ঢাকতে গালভরা নাম - আর্ট ফিল্ম, গ্রামের দর্শক, শহরের দর্শক। আন্ডার এস্টিমেট কেন? অনুভূতি একই। না পারলেই এক্সকিউজ। আর্টিস্টিক সূক্ষ্মতার বড্ড অভাব”

সীমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল “ভুল সময় জন্মেছি”

“ভুল সময় নয়। যুগোপযোগী কিছু দিতে পারছে না যা মন ছোঁয়”

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল জয়ন্ত। হঠাৎ মোবাইল। বাঁ লেনে লরির সারি। পার্ক করা যাবে না বলে চট করে কথা সেরে নিচ্ছিল। লক্ষ করেনি একটা ট্রেকার বাঁ দিকের রাস্তা থেকে হঠাৎ ডান দিকে। হেড অন কলিশন। সীমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখে হাসপাতালের বেডে।

“কষ্ট হচ্ছে?” দেখে মনে হল ডাক্তার। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে মাথা নেড়েছিল।

“চেনা কেউ আছে যাকে খবর দিতে পারি?” রুমার নাম নম্বর দিল।

“জয়ন্ত কোথায়?”

“এখন বিশ্রাম নিন” প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেছিল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগতেই দেখল দেবজিৎদা। তবু ভরসা। ও থাকলে চিন্তা করতে হয় না।

“এখন কেমন আছ?” মাথা নেড়ে চোখ অন্য দিকে

“কী করে যে অ্যাকসিডেন্ট হল”

“এখন বিশ্রাম নাও। আমরা আছি”

“বাবা-মাকে খবর দিয়েছ?”

“হ্যাঁ, দিয়েছি। কলকাতা থেকে বেরোবার আগেই। অ্যাম্বুলেন্সে লেডি ফ্লোরেন্সে সিফটের বন্দবস্ত করেছি। চেক আপ করতে হবে। স্পেশালিস্ট, ইনভেস্টিগেশন, যন্ত্রপাতি। রুমাও যাবে। মেশোমশাই-মাসিমা ওখানেই আসবে”

“জয়ন্ত কোথায়?”

রুমা দেবজিতের দিকে তাকাল। তাকেই জবাব দিতে হবে। ও আসার সঙ্গেই হাসপাতালের তৎপরতা বেড়ে গেছে। ডাক্তার, নার্স, সুপারিন্টেনডেন্ট ছোটাছুটি করছে। সিএমওএইচ চলে এসেছে। চিফ সেক্রেটারি বলে কথা। নীলবাতি জ্বালানো গাড়ির সঙ্গে একগাদা লোক। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। কাকে খাতির করতে হয় ভালোই জানে।

দেবজিৎ সীমার হাত ধরে বলল “অনেক চেষ্টা করেছিল। জয়ন্তকে বাঁচানো গেল না”

মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটা ভেঙে পড়ল। কাঁদতেও ভুলে গেছে। দেবজিৎ আশা করছিল কিছু বলবে। সীমা চুপ। কান্নায় ভেঙে পড়লে হাল্কা হত। দেবজিৎ ঘাবড়ে গেল। মুনি-ঋষিদের ভাবলেশহীন দেখেছে। মানুষকে নয় “গাড়িতেই মারা গেছিল বোধহয়। তবুও হাসপাতালে অনেক চেষ্টা...”

কথা নেই। রুমা চেয়ার ছেড়ে সীমার বেডে বসে ওর হাতটা চেপে ধরল। সীমা দেওয়ালের দিকে চেয়ে।

রুমাকে ওর সঙ্গে থাকতে দিয়ে বেরিয়ে গেল দেবজিৎ। বাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। চায়ের ট্রে হাতে বেয়ারা। দেবজিতের জন্য এক্সট্রা আপ্যায়ন।

কাপটা এগিয়ে রুমা বলল “খেয়ে নে” চুমুক দিয়ে বলল “সাহেব বেরিয়ে গেলেন। দিয়ে এস”

দেবজিৎ সুপারিন্টেনডেন্টের ঘরে। সিএমওএইচ যমুনেশে বড়ুয়া সুপার রজতকান্তি সামন্তকে বলল “লেডি ফ্লোরেন্সের অ্যাম্বুলেন্স আসছে”

“আমাদেরও তো অ্যাম্বুলেন্স আছে। সঙ্গে একজন ডাক্তারও এস্কর্ট করবে”

“আপনাদেরটা ওয়েল ইকুইপড্ নয়। অ্যাডভান্সড্ লাইফ কেয়ার সাপোর্টের ব্যবস্থা নেই। সরকারি ফান্ড থেকে দুটো অ্যাম্বুলেন্স এসপেশালি ফর ক্রিটিকাল পেশেন্টদের জন্য অ্যারেঞ্জ করেছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কী একটা এলআইসির জন্য এখনও পৌঁছয়নি”

“সে তো বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়ায় পাব না। যদি এপাশের জন্য একটা... স্যার, এই সাপোর্ট নিয়ে এখানে রেগুলার গন্ডগোল। আমরা কী করব স্যার যদি ইকুইপমেন্ট না থাকে?”

দেবজিৎ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল "এত ফান্ডস নেই। কয়েকটা এনজিওর সঙ্গে কথা হচ্ছে। যদি ডোনেট করে"

"আপনি চেষ্টা করলে সব সম্ভব। মন্ত্রীদের বলে লাভ নেই। যদি করে দেন"

"দেখি কী করতে পারি" সুপারকে বলল "মিঃ সরকারের বডিটাও কলকাতায় ট্র্যান্সপোর্টের বন্দোবস্ত করেছেন তো?"

"হ্যাঁ স্যার। সব হয়ে গেছে। লেক প্লেসের বাড়িতে নিয়ে যাবেন?" রজতকান্তি সামন্তর প্রশ্ন।

"হ্যাঁ। ওনার রেলেটিভসরা আসবেন। মিউজিক ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের সবাই। প্রেস"

"বেরতে আরও দু-ঘণ্টা। যদি কিছু মনে না করেন স্যার, আমরা লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছি"

"লাঞ্চ বড় একটা খাই না"

"ম্যাডাম?"

"ওনাকে জিজ্ঞেস করে নিন। পুরো লাঞ্চ উনিও করবেন না। যদি স্ন্যাক্স কিছু খান" যমুনেশ বড়ুয়াকে বলল "হেলথ সেক্রেটারি বলছিলেন, আপনাদের এখানে সব এক্সপায়ার্ড ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে"

ঘাবড়ে গেল সিএমওএইচ। এই সময় প্রশ্ন করবে ভাবতে পারেনি। ব্যাপারটা তাহলে নবান্নের কানে গেছে। ভয় পেল। পুনিত আগরওয়ালকে ভ্যাকসিন সাপ্লাইয়ের কনট্র্যাক্টটা ওই দিয়েছিল। তার জন্য আগরওয়াল মোটা টাকার ভেটও দিয়েছে। এখানে অনেকেই জানে। বিনিময় যে এক্সপায়ার্ড ভ্যাকসিন দেবে ভাবতে পারেনি। টাকা খেয়েছে বলে জেনেও রিজেক্ট করতে পারেনি।

তিনটে মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। মেয়েগুলো দেখতেও তেমন নয়। গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ থেকে দেখতে এসেছিল। বলেছে পছন্দ হয়েছে। যদি একটাকে পার করতে পারে। রিটায়ারমেন্টের তো আর কয়ক বছর। প্র্যাক্টিস ছাড়া এটাই রোজগার। সরকারি মাইনেতে এই মেহেঙ্গা বাজারে তিনটে পার করবে আর কী করে? উপরি ছাড়া। টাকা দিয়ে খালাস। আর কিছু শুনবে না। লেখাপড়া শিখে ডাক্তার না হয়ে ব্যবসা করা উচিত ছিল। লাখো কামানো ছাড়াও রংবাজি। সরকারি গোলামি নয়। এরা কাউকে তোয়াক্কা করে না। টাকা খাইয়ে সাত খুন মাফ। সে গরিব মেয়েগুলোকে পার করতে টাকা খেলেই অপরাধ?

"আমিও জানতাম না। কিছুদিন আগে জানলাম। ইনভেস্টিগেশন কমিটি তৈরি করেছি। রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব"

দেবজিৎ চায়ে চুমুক দিয়ে, মোবাইলে। কেটে বলল "বোধহয় বেশিক্ষণ লাগবে না। ডানকুনি ক্রস করে গেছে। ম্যাডাম, মিসেস সরকারের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে যাবে। আমি মিস্টার সরকারের বডিকে ফলো করব। হ্যাভ টু সর্ট হিম"

কেওড়াতলায় জয়ন্তকে ক্রিমেট করে জানল রুমা হাসপাতালে। ছাড়া পাওয়ার পরও কেউ না-কেউ সীমার সঙ্গে।

"মেশোমশাই মাসিমা কখন আসবেন?"

"জানি না। বলেছিল খেয়ে আসবে" সীমার উত্তর।

"এলে বেরব। অফিসের অনেক কাজ বাকি। রুমাকেও একটু স্কুলে যেতে হবে"

"একটু বস। এখনি এসে পড়বে। ফোন করছি"

জীবনটা কত ক্ষণভঙ্গুর, অনিশ্চয়তায় ভরা। তার মধ্যে জয়-পরাজয়ের হিসেব, লেঙ্গি, ধান্দা জেতার লোভে। দেবজিৎ বুঝলেও সীমাকে তো বুঝতে হবে। তবেই শান্তি।

বাইশ

ঐত্রিলা আশা করছিল সায়ন্তনি ফোন করবে। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেনি। ঠিক এই সময়। ঐত্রিলা লক্ষ করেছে, জীবনে যখন পরিবর্তন ঘটে, একসঙ্গে নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। সময় পার হয়ে যায় তার তাৎপর্য বুঝতে। পরিবর্তনকে সামাল দিতে দিশাহীন অবস্থায় ভাবার অবকাশও থাকে না।

সায়ন্তনি যখন ফোন করল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিষেধ করতে পারল না "আমার সৌভাগ্য। কবে?"

"ব্যস্ত? আপনার ছুটি না?"

"কালই দুপুরে আসুন। দু-মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন"

"আবার লাঞ্চ কেন?"

"আসবেন যখন, দু-মুঠো খেয়ে যাবেন" ফোনটা কেটে দিল।

বৈষ্ণবঘাটার শূন্য ফ্ল্যাটে একা হাঁপিয়ে উঠেছে। সায়ন্তনির সঙ্গে ছুটির দিনটা কেটে যাবে।

যাদবপুরের একান্নবর্তী পরিবার থেকে এই বদ্ধ খুপরিগুলোতে হাঁসফাস করে। অভয় সিরিয়াল না করলে ওদের পৈতৃক বালিগঞ্জ গার্ডেন্সের বাড়িতে থাকতে পারত। ওর দুনিয়ায় বিভিন্ন লোকের আনাগোনা। ভ্রুকুটি উঠবে। তাই ওখানে না থেকে এই ফ্ল্যাটে। সেন্ট মেরিস কারমেল কনভেন্টে থেকে যখন সাড়ে তিনটেয় বাড়ি ফিরত, বাবা অফিসে, মা ঘুমোচ্ছে। দাদু ইশারায় ডাকত। স্কুলের ব্যাগটা খাটে ফেলে সোজা দাদুর ঘরে। দিদিমাকে বলত "কই গো তোমার টিনটা বার কর-তো"

দিদিমা মরচে ধরা টিন থেকে নাড়ু, তক্তি হাতে দিয়ে বলত "রেবা কাল দিয়ে গেছে। তিলের নাড়ু, তক্তি। বুড় বয়সে দাঁত নেই। চিবাতেও পারি না। তোর জন্য রেখে দিয়েছি"

খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে মহানন্দে সেবন। পিসির নাড়ু, তক্তি। বেশিভাগই একা গিলত। মা জানলে আক্ষেপ করত, দাঁত খারাপ হয়ে যাবে। কয়েকবার মায়ের কাছে দাদু বকুনিও খেয়েছে। ভালোবাসার মন তো। নতুন কিছু এলে ঐত্রিলাকে না দিয়ে খাওয়া ভাবতেই পারে না। একান্নবর্তী জীবনে চাওয়া সীমাবদ্ধ। পাওয়াতে তৃপ্তি ছিল। দাদুর আদর, মায়ের বকুনি, বাবার স্নেহ।

দাদু ঠাট্টা করত "তোর ঠাকুমা বুড়ো। আমায় বিয়ে করবি?"

"নাঃ" ঐত্রিলা মাথা নাড়ত।

"কেন? আমি কী দেখতে খারাপ?" দাদু কোলে তুলে নিত।

“আমি উত্তমকুমারের মতো ছেলে বিয়ে করব” কোলে বসে, তক্তি চিবিয়ে জবাব। দিদিমাকে দাদু বলত “দেখ, দেখ, মেয়ে আমার হিরো বিয়ে করতে চায়। আমাকে পছন্দ নয়”

“মেয়ে আমার সুচিত্রা সেন গো। তোমার মতো বদখত দেখতে লোককে কেন বিয়ে করবে?” দিদা বিছানা থেকে সায় দিত।

“দেখি তাহলে, তোর জন্য একটা উত্তমকুমারের মতো বর খুঁজে আনতে পারি কি না” দাদুর মুখে একগাল হাসি।

দাদুকে খুঁজতে হয়নি। নিজেই খুঁজে নিয়েছিল অভয় সেনকে। তখন কী জানত ও একই লাইনে ঢুকবে।

ছোটবেলার স্বপ্নটা যে এভাবে বিদ্রুপ করবে, কে জানত? সে তো হিরোকে বিয়ে করতে চায়নি। চেয়েছিল সুপুরুষ। অভয় সেন সুপুরুষ। ফর্সা, ৫’ ৮” সুপুরুষের প্রতি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রথম দিনেই আকর্ষণ। মুখে সিগারেট, কামানো গাল, মেদ না থাকলেও ভরাট শরীর। বাঁকা হাসিটায় তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত ছিল না, জোর দিয়ে বলতে পারে না। ঐত্রিলার মতো আরও অনেকে আকৃষ্ট। পদ্মপর্ণা তো বলেই ফেলেছিল “ওকে দেখার পর রাতে ঘুমোতে পারছি না”

“ওকে গিয়ে বলে দে” ঐত্রিলা ঠাট্টা করত।

“সে সুযোগই খুঁজছি”

সুযোগ যে আসেনি, এমন নয়। মর্মাহত হয়ে ফিরতে হয়েছিল পদ্মপর্ণাকে।পাত্তাই দেয়েনি অভয় সেন। জানে সে সুপুরুষ। এ হেন ছেলের পেছনে মেয়রা ছুকছুক করবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাদের নিয়ে ফ্লার্ট করার ইচ্ছে নেই।

পদ্মপর্ণার ব্যর্থতায় সংযত ঐত্রিলা। সুপুরুষ তো কী? পাওয়ার জন্য কি নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে? ক্যান্টিনে আড় চোখে দেখলেও, সামনা-সামনি এলেই না দেখার ভান করে চলে যেত। নজর এড়ায়নি, মেয়েটা তাকে পাত্তাই দেয় না। অন্য মেয়েরা সঙ্গভিক্ষা করলেও, এ অন্য রকম। ফিরেও তাকায় না। পৌরুষে আঘাত। ক্যান্টিনে আড্ডার ফাঁকে, অজান্তেই বারবার চোখ পড়েছে দূরে বসা মেয়েটার দিকে। চৌকো মুখে ভারী ফ্রেমের চৌকো চশমা। ছিপছিপে গড়নে মানানসই। আভিজাত্যের লক্ষণ স্পষ্ট। হাল্কা লাল লিপস্টিকে পাতলা ঠোটের ফাঁকে নিঁখুত ঝকঝকে দাঁতের সারি। নীল জিনস, গোলাপি টপস। বব চুল গোলাপি ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। সাজে-চলনে-বলনে নিজস্ব জৌলুস। মেদ না থাকলেও নিতম্ব পরিপূর্ণ। পরিমিত স্তন গড়নের সঙ্গে মানানসই। আকৃষ্ট অভয় সেন। কারমেলের চোস্ত ইংরেজিতে অভয় সেন কুপোকাত। তৃতীয় দৃষ্টিতে ঐত্রিলার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অনুভূতিটা মিলিয়ে যেত, যদি না অভয় সেন হিরোর মতো ঐত্রিলাদের বাংলা ভাষা আন্দোলনের পোস্টার না ছিঁড়ে ফেলত।

ঝাঁঝিয়ে বলেছিল "পোস্টার ছিঁড়লেন কেন?"

"এসব হিপোক্রেসি পোষায় না। কথা বলবেন ইংরেজিতে। পড়বেন সাহেবি পোশাক। আর বাংলা ভাষার আন্দোলনের পোস্টারে ইউনির্ভাসিটি ঢেকে দেবেন। অদ্ভুত!"

"ইংরেজিতে কথা বল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসা যায় না? ভাষাটা কী শুধু আপনাদের বাংলা মিডিয়াম স্কুলের একছত্র অধিকার?" ঐত্রিলার পাল্টা।

"তা তো বলিনি। আগে সত্যিকার বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করুন, তারপর ভাষা আন্দোলন করুন। ফলো হোয়াট ইউ প্রিচ"

না চিনে, জেনে তোপ দাগছে। যেন বাংলা স্কুলের ছেলে, কনভেন্টের মেয়ের ছাঁচটা বাঁধা। কর্তৃত্বতে বিরক্ত।

ঝাঁঝিয়ে বলল "ইউ আর প্রিচিং ইওর কনসেপ্ট। নিজের কনসেপ্টকে ঘাড়ে চাপানোটা ঠিক নয়"

"কিছুই চাপাচ্ছি না। ভাষা অন্দোলনের আগে একটা লাইন পুরো বাংলায় বলুন তো। তারপরে আন্দোলন"

আপব্রিঙ্গিংয়ে আঘাত করছে। নয় সে কনভেন্টে পড়েছে। নয় দু-চারটে ইংরেজি কথাই বলে। তা বলে কী বাংলা ভাষা জানতে নেই? ভাবে কী?

"জীবনানন্দের একটা কবিতা মুখস্ত বলুন। কিংবা বিষ্ণু দে। পারবেন?"

অভয় সেন থতমত। ভাবতে পারেনি ওসব বই পড়েছে। সমারসেট মম, হ্যারল্ড রবিন্স বা জ্যকি কলিনসেই এরা বেশি সাবলীল। এরা এল্টন জন শোনে। জোন বেজের তালে ছন্দ আঁকে, পিয়ানোয় সুর ভাঁজে। এরা কী জানে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগে বেহাগ বা শক্তি চাটুজ্জের বাড়ির ঠিকানা? কালকূটের অমৃতকুম্ভের দুনিয়া? দো-আঁশলা সংমিশ্রণ মাত্র। লোক দেখানো বাঙালি হওয়ার চেষ্টা। ভাষা নিয়ে আন্দোলন তারই বহিঃপ্রকাশ। সেটা ভেবে কথাটা বলেছিল অভয় সেন। ভাবতে পারেনি তিরটা বুমেরাং করবে।

"কেন পারব না?" বলে বনলতা সেনের প্যারা আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আবৃত্তি। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। ও কী বনলতাকে খুঁজে পেয়েছে? হাজার বছর ধরে কবি খুঁজলেও হাজার মানুষের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

আবৃত্তি শেষে বলল "আপনার দারুণ গলা। মনে হচ্ছিল সৌমিত্র চ্যাটার্জি আবৃত্তি করছে"

"শুধু গলাটাই দেখলেন। চেহারাটা দেখলেন না?"

"রয়েই গেছে দেখতে। পদ্মপর্ণা, দীপশিখা, পিয়ালি তো আছেই। আমার না দেখলেও চলবে"

কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হনহন করে হেঁটে চলে গিয়েছিল। পেছনে না তাকলেও, ওর চোখের চাহনি যে তাকে বিদ্ধ করছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভালোলাগার আনন্দে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বুঝতেও পারেনি, এই ছন্দ, তার অন্তরে ঝড় আনছে। বুঝল কয়েক রাত পরে। পারসন্যালিটির লড়াই নয়, সামঝোতার বাস্তব পদক্ষেপ।

সেই সামঝোতা কোথায় হারিয়ে গেল। নিঃসঙ্গ একাকিত্বে সেই স্পন্দন খোঁজাই ভুল। মার্ক কিছুদিন আগে এসেছিল। মার্ক জেফারসন। আলাপ অনেকদিন থেকেই। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারে লেকচার দিতে বহুবার এসেছে কলকাতায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ইকনমিক অ্যাডভাইসার। এশিয়ান ডিভিশন দেখাশোনা করে। সেই সুবাদে মাঝেমধ্যেই ভারতে। ইদানীং কলকাতায় যাতায়াত বেড়ে গেছে। নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মন্ত্রী আমালাদের সঙ্গে নিত্য বৈঠক। ঐত্রিলার চাকরি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারে, এলেই দেখা হয়। কয়েকবার একসঙ্গে পাঁচ-তারা হোটেলে খেতেও গেছে।

সেবার যখন এসেছিল ওকে ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। পার্ক হোটেলের স্যুটে বসে বলেছিল "গোয়িং থ্রু এ প্রসেস অফ সেপারেশন"

"হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

"মাই ওয়াইফ ওয়ান্টস্ এ ডিভোর্স। সি হ্যাস ফাউন্ড এ নিউ বয়ফ্রেন্ড"

"হোয়াট অ্যাবাউট ইওর চিলড্রেন?"

"দে হ্যাভ গ্রোন আপ। দে আর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দেয়ার ওন"

বিশ্ব ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ অফিসারের একাকিত্বটা মন ছুঁয়ে গেছিল। সব থেকেও নেই। সাকসেসের পেছনে ভেতরের মানুষটা ডুকরে উঠছে। একটু অশ্রয়, সুনিবিড় প্রশস্ত ছায়া খুঁজছে নিজেকে মেলে ধরার জন্য।

ভালোবাসা কী? সব তালগোল। যখন অভয় সেনকে বিয়ে করেছিল, মনে হয়েছিল এটাই ভালোবাসা। এখন নিঃসঙ্গতায় মনে হয়, ভালোবাসা কোনও সম্পর্ক নয়। দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলার অবকাশ মাত্র। অনেক সামাজিক ব্যাখ্যা। বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রেমিকা, স্ত্রী। চির-পরিচিত ব্যাখ্যা নাও তো থাকতে পারে। একান্ত অনুভূতিগুলো ভাগ করে নেওয়াই ভালোবাসা।

ঐত্রিলা মার্ককে বলেছিল "হোয়াট উইল ইউ লিভ উইথ?"

"ডোন্ট নো" ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শূন্যতায় আলোর রেখা খুঁজছে। সাকসেসের ধ্রুবতারা নয়, শান্তির মোহনা। ওর কথা মনে হতেই ঐত্রিলার মনে হল সেও তো তাই খুঁজছে। সভ্যতার নাগপাশে মেঘে ঢাকা তারা। পশ্চিমে সুখ, ভোগ, আড়ম্বর আছে। ওদের দুনিয়া ওখানেই শেষ। ওখানে থেকে পাওয়া সমাপ্ত। তাই মার্ক বারবার ছুটে আসে পুবে, ধ্রুবতারার খোঁজে।

কলিং বেল। সায়ন্তনি নিশ্চয়ই। বলেছিল এ সময় আসবে। কাল রাতেই রান্না করে রেখেছিল। সকালে মাংসটা রেঁধে অফুরন্ত অবসর।

"চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?"

চটিটা খুলে বসবার ঘরে। ফ্ল্যাটটা বড় না হলেও ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন বাঙালিয়ানা প্রকট - বিষ্ণুপুরের ঘোড়া থেকে মঞ্জুষার হস্তশিল্প। বসার ঘরের সোফার কভারও শান্তিনিকেতনি। শুধু বলনেই সাহেবি ঢং। সায়ন্তনি ঐত্রিলাকে কোনও ক্লাসের গতে ফেলতে পারছে না। সেটাই বাড়তি আকর্ষণ। অরণি আর তার মেলবন্ধন? তাই কৌতূহল থেকে আসক্তি। ট্যানিয়া, সুলগ্না, শর্বরীর মধ্যে চেনা গোলকের আকর্ষণ থাকলেও, ঐত্রিলার অচেনা ব্যাপ্তিটাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অজানা চিরকালই আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিবস্ত্র নারী যত না, অর্ধবসনা বেশি মোহময়ী। আচ্ছাদিত গভীরে নতুনের ইঙ্গিত।

হাল্কা খয়রি তাঁতের শাড়ি, ম্যাচিং চকোলেট ব্লাউজ, বিনুনি করা চুল, মেকআপ-হীন সায়ন্তনির গেরস্থ প্রতিচ্ছবি। কালো মুখ প্রোজ্জ্বল।

মাথা নাড়ল "অসুবিধে হবে কেন? রুবির কাছেই তো থাকি। বাইপাস দিয়ে বেশি সময় লাগেনি"

"গাড়িতে?"

"এদিকে চালাতে অসুবিধা হয় না। কলকাতার ভেতরে ঢুকলে কনসেনট্রেশন হারিয়ে ফেলি। সেই ভয়ে ওপাশে চালাই না" সোফাতে সায়ন্তনি "উনি কোথায়? শুটিংয়ে?"

প্রশ্নটা আশাই করছিল। ভণিতা না করেই বলল "জানি না। আমার সঙ্গে আর থাকেন না। ডিভোর্স প্রসিডিং চলছে। আশা করি মিউচুয়াল কনসেন্টে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে"

সেদিন তো পার্টিতে আলাপ হল। মনে হয়েছিল আইডিয়াল কাপল। বুঝতেও পারেনি। এখন আসাটা কী ঠিক হল?

দ্বন্দ্বটা অনুমান করে বলল "ভালোই করেছেন। একা একা হাঁপিয়ে উঠছিলাম"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সায়ন্তনি। সেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। দুর্গন্ধ, অরণির ঘরে ঢোকা যায় না। বাড়ি সাজাতেও আর ভালো লাগে না। ওর পরিণাম যে সেদিকেই বেশ বুঝতে পারছে। ভয়, সংসার খরচ উঠবে কী করে? এতদিন অরণির ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে। অরণিকে আর ওরা বেশিদিন চাকরিতে রাখবে না। তারপর? অন্ন-সংস্থান? কে তাকে চাকরি দেবে, শর্বরী ছাড়া। সমকামী-সঙ্গে নারীর ভূমিকায় শর্বরীর বলিষ্ঠ পৌরুষকে স্যাটিসাফাই করতে হবে। তার পৌরুষের এখন লিঙ্গ পরিবর্তনের সময়। এখানে সে রানি নয়, শর্বরীর দাসী। ভেতরের পৌরুষ এখনও নারীসঙ্গ কামী। তাই ঐত্রিলা। যে ভাবেই হোক, জিততে হবে। হেরে গিয়ে সে বাঁচতে পারবে না। ব্যাধিগ্রস্ত অরণি হারিয়ে যাবে। সেটাই তার কাল।

“আমিও। তাই ভাবলাম...”

“আপনার স্বামী?”

“ওর অনেক প্রবলেম”

কথাটা ঘুরিয়ে বলল “চা করি”

সাজগোজ ছাড়া ঐত্রিলাকে আরও ভালো লাগছে। নিজঢঙে, সাবলীলতায় অনন্যা। একাকিত্বের মধ্যে মিলনের রাগিণী। এবার পূর্ণতার অন্বেষণ।

কাপটা হাতে নিয়ে বলল “সময় কাটে কী করে?”

“সোম থেকে শুক্র চাকরি। বাকিটা গান, বই। টিভি খুব একটা দেখি না”

“পড়া আমার ধাতে নেই। গান ভালোবাসি। ফাস্ট বিটের। টিনা টারনার, ডোনা সামার্স, ভ্যানেসা মে, হোয়াম, এই সব। আমিও টিভি দেখি না। অত ধৈর্য নেই”

“আপনি তো পার্টি ভালোবাসেন?”

“বাসতাম। এখন হাঁপিয়ে উঠছি। টায়ার্ড অফ ওয়াইল্ড নাইটস”

“নেভার লাইকড্ দোস। জাস্ট ফর অভয়, অ্যাটেন্ড করতাম। নাউ আউট অফ কোয়েশ্চেন”

চা'টা শেষ করে সায়ন্তনি বলল “জীবনটাই চায়ের মতো। চুমুক দিলেই শেষ”

ঐত্রিলার ঠোঁটে শুষ্ক হাসিঃ

গিভ টু মি দ্য লাইফ আই লাভ,

লেট দ্য লেভ গো বাই মি

গিভ দ্য জলি হেভেন অ্যাবাভ

অ্যান্ড দ্য বাইওয়ে নাই মি

শর্বরী বসুর আগ্রাসী অরগ্যাজমের বাইরে অন্য ছন্দ। যেখানে অরণির ভবিষ্যৎ ধোঁয়াশায়, শর্বরীর দৈহিক আগ্রাসন ব্যবসায়িক, সেখানে উত্তেজনা নেই। মাধুর্যটাই ম্রিয়মাণ। ঠিক দেহজীবীদের মতো। আনন্দ ভালোলাগার মধ্যে। ঐত্রিলাকে যতটুকু দেখছে, ততই ভালো লাগছে। বুকে হাত, শাড়ি-সায়ার অন্তরালে দেহ নিয়ে খেলা নয়। সান্নিধ্যই স্নিগ্ধ কোমলতা, নারীত্ব। দেহের চেয়ে নারীত্বেই আকর্ষণ।

“কবিতা ভালোবাসেন দেখছি”

“আগে অনেক কিছুই ভালোবাসতাম। এখন ঠিক কী ভালোবাসি জানি না। রং'টা যে ভাবে পাল্টে যাচ্ছে, বুঝতেই পারি না, আদৌ কিছু ভালোবাসি কি না”

“দুম করে চলে এলাম। কিছু মনে করেননি তো?”

"এলেন বলেই ভালো লাগছে। এবার আপনিটা বাদ। তুমি... ঠিক আছে?" সায়ন্তনিকে অন্তরঙ্গ করতে চাইছে।

বাবার উচ্ছল জীবনের ফাঁকে এটাই কী খুঁজেছিল? কোথাও কী আন্তরিকতার অভাব ছিল ছোটবেলায়? তাই কখনও কালীশেখর, কখনও উন্মুক্ত উরুদ্বয় রনিতের জন্য, কখনও ট্যানিয়ার প্যান্টির ভেতর খেলা, উন্মুক্ত স্তন সুলগ্নার জন্য। কিছুতেই আকাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধতা পায়নি। দেহ, দেহ খুঁজলেও নিভৃতে নিঃশব্দে মন খুঁজেছে মন। ভাষা অজানা, শেখেনি। তাই ব্যর্থ প্রয়াস। শর্বরীর উগ্র আধুনিকতায় বিকোতে গিয়েই কি অন্তরের শূন্যতা? অরণির মানসিক অবসাদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ঘরে-বাইরের পার্থক্য। না-পাওয়া ছেলেবেলাকে কি এখনও খুঁজছে নিঃশব্দ শূন্যতায়?

"বেশ, আজ থেকে তুমি"

হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে দেহটা সোফায়। জীবনে নতুন অনুভূতির প্রথম স্বাদ। ভালোলাগার সম্পূর্ণতা। ভালোবাসার পূর্ণতা।

ঐত্রিলা সায়ন্তনিকে বলল "আপনি কিছু করেন না?"

"না। এখন ভাবছি, কিছু করব। এ বয়সে কেউ চাকরি দেবে না। এক্সপিরিয়েন্সও নেই। যদি ব্যবসা করা যায়..."

"কীসের, ভেবেছেন?"

মনে পড়ল, ওর স্তন নিয়ে খেলতে গিয়ে শর্বরী বলেছিল "আর্ট। আজকের দুনিয়ায় এভরিথিং টু ডু ইজ উইথ আর্ট। ইওর বুবস আর আর্টিস্টিক। বিউটি ইজ আর্ট। সো-বিজ ইজ আর্ট। অল আর্ট সেলস্। দ্যাট সেলস মোস্ট ইজ ক্রিয়েটিভ আর্ট"

ঠিক বুঝতে পারেনি "মানে?"

"আর্টের কদর দিনকে দিন বাড়ছে। যত ভিনটেজ, তত ভ্যালুয়েবল। মিলিয়ানেয়ার্সরা আর্ট কিনে রেখে দিচ্ছে। প্রপার্টির মতো। পরে চড়া দরে নিলাম করার জন্য"

শর্বরীর হাত সায়ন্তনির গভীর অরণ্যে। খেলা করছে, সায়ন্তনির ক্লাইটরিস নিয়ে। স্তনে ঠোঁট। জাগিয়ে তুলছে দৈহিক আকাঙ্ক্ষা। তবুও সায়ন্তনি নিস্পৃহ। ধোঁয়াশা আগামীর কথা ভেবে।

খেলতে দিয়ে বলেছিল "হাউ ড্যু আই ফিট ইন? ছবি আঁকতে পারি না?"

স্তন থেকে ঠোঁট তুলে বলেছিল "ছবি আঁকতে হবে কেন? ইউ হ্যাভ গট এ প্রাইম প্লেস ইন রাসবিহারী কানেক্টর। মেক ইউজ অফ ইট। আলাপ করিয়ে দেব আর্ট ডিলার্সদের সঙ্গে। লেট আউট ইওর ফ্ল্যাট ফর এক্সিবিশন। টেক এ কমিশন আউট অফ দ্যাট। সিম্পল"

"ওরা নেবে?"

"কেন নয়? সেণ্ট্রালি লোকেটেড স্পট ইজ ইন হাই ডিমান্ড। আরেন্ট ইউ এনজয়িং মাই ফিঙ্গার?"

"অফ কোর্স"

বলতে তো হবেই। খুশি করতেই হবে। উত্তেজনা না থাকলেও, ভান করতে হবে। মাদকতা না থাকলেও, আসক্তি দেখাতে হবে। তার দেহ-মনের চাওয়া নয়। বাঁচার পথ। যা শর্বরী বসুই দিতে পারে। তাই ওর চাওয়াকে পূর্ণ করতে খেলায়।

ঐত্রিলাকে বলল "ভাবছি বাড়িটাকে আর্ট এক্সিবিশনের কাজে লাগাব"

বোধগম্য হল না। তার দুনিয়ায় বায়রন, কিটস, শেলি, বনলতা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সামারসেট মম। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল শর্মা, অদিতি চক্রবর্তীর ছবি। নন্দনের রকে তর্কের ঝড়। কিন্তু এর পেছনে অর্থের খেলা অজানা।

"তাতে টাকা রোজগার হবে?"

"দেখি চেষ্টা করে। ডিভোর্স হলেও তুমি অনেক ভালো আছ। ফ্রি" কথায় দীর্ঘশ্বাস।

"বুঝলাম না। এতদিনের ঘর ভেঙে যাওয়া কতখানি অনুভব করি"

"ওভাবে বলিনি। বুঝি তোমার মনের অবস্থা। তবুও কোথায় একটা শান্তি"

মেয়েটার হয়ত অনেক দুঃখ, যা ঐত্রিলা জানে না। দীর্ঘশ্বাস অনেক কথা বলে। ঐত্রিলা শুনতে পাচ্ছে হাহাকারের বেহাগ। তার মূর্ছনা যেন তারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। নিঃশব্দে সেই সুর-ই ধ্বনিত। মরুভূমিতে মরূদ্যান। একটু আশ্রয়।

"অভয় সেন হঠাৎ চলে গেল কেন?"

"বোধহয় পুরনো হয়ে গেছি। আমার মধ্যে আর উন্মাদনা পাচ্ছিল না" শাড়িটা বুকে জড়িয়ে ঐত্রিলা বলল।

"কোথায় গেল?"

"মনোলীনার সঙ্গে লিভিং টুগেদার"

"মনোলীনা! হি মাস্ট বি ম্যাড। মনোলীনা কি ঘর করার মেয়ে?"

"একসঙ্গে ঘর তো করছে গলফ গ্রিনে"

"ওটা ঘর নয়। খেলা। ঘর বাঁধার খেলা"

"অতশত জানি না। এত বছর ধরে ওর সঙ্গে থাকলাম। সেটা ঘর, না খেলা?"

“বলতে পারব না। আমি স্ট্রেট-কাট। শুতে হয় তো শোব। আনন্দ ফুর্তি করতে হয়, করব। কিন্তু এসব ঘর-ঘরের নাটকে কোনও আগ্রহ নেই।... বাথরুমটা কোথায়?”

ঐত্রিলা ডাইনিং টেবলের পাশের দরজাটা দেখাল “ওই দরজাটা। দাঁড়াও লাইটটা জ্বেলে দিই”

কিচেন থেকে ফ্লাসের শব্দ। সায়ন্তনি কিচেনে ঢুকে বলল “ঘর তুমি করেছ কি না, তুমিই জানো। তুমি ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনও চাকুরে মেয়েকে এত পরিষ্কার দেখিনি”

চালটা কুকারে চাপিয়ে বলল “দুটো আলু ছেড়ে দিই? আলুসেদ্ধ”

“বাদ দাও। এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছি। আলু প্রায় বন্ধ করেছি। তোমার একটা মেয়ে আছে তো। তোমার সঙ্গে থাকে না?”

“না। বড়দির কাছে, আসানসোলে। বড়দি আমার থেকে কিছুটা বড়। দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সাত বছর আগে জামাইবাবু প্লেন ক্রাশে মারা যায়। একেবারে একা। আমিও চাকরি করি। তাই বড়দি বলল, অঙ্কিতাকে মানুষ করবে। অঙ্কিতা ওখানে পড়াশোনা করে”

“এখানে আসে না?”

“মাসে একবার। আর ছুটি-ছাটা থাকলে”

“এখন তো একা। এনে রাখলেও পার”

“এখানের ভালো স্কুলে ভর্তি প্রায় অসম্ভব। কুলটির লরেটো কনভেন্টে পড়ছে। ওখানেই থাকুক। মাধ্যমিকের পর নিয়ে আসব। ততক্ষণে, এদিকটা গুছিয়ে নিই। নিজেই বুঝতে পারছি না, কী করব?”

সোফায় ফিরে সায়ন্তনি বলল “আমারা দুজনেই একই জায়গায়”

দুজনেই স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে থেকে আজ নোঙরহীন নৌকো। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকতেও কোনদিকে এগোচ্ছে, জানে না। জিতের খেলা থেকে হারের সাঁঝবেলায়। ধ্রুবতারা খুঁজছে। মেঘের গভীরে, কোথায় লুকিয়ে জানে না। হারজিতের গোলোকধাঁধায় ওদের কেবল ঘুরতেই শেখানো হয়েছে। ধ্রুবতারা চিনতে নয়। আজ তাই জীবনের জোয়ারে এলোপাথাড়ি ঝাপটায় মরিয়া নোঙরের স্বপ্নে। চোরাবালিতে হাতে হাত ধরে নক্ষত্র চিনতে মরিয়া দুজনে।

ঠিকানা কোথায়?

তেইশ

ক্যামেলিয়া ক্লাবের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে সায়ন্তনি বলল "দিস ইজ আওয়ার কোয়ায়েট নেস্ট"

সুলগ্নার বাড়িতে শ্বাশুড়ি, মেয়ে। ওখানে এভাবে মেলামেশা সম্ভব নয়। এখন অরণি সারাদিনই বাড়িতে। সুলগ্নাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অগতির গতি জনবহুল চৌরঙ্গীর ওপর এই ক্যামেলিয়া ক্লাব। সুলগ্না মেম্বার নয়। অনির্বাণের মেম্বারশিপে স্ত্রী হিসেবে প্রবেশাধিকার। তার ছোটবেলার দুনিয়া থেকে অনেক আলাদা।

ক্যামেলিয়া কোনও উচ্চবিত্তদের ক্লাব নয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের আড্ডার জায়গা। ইংরেজ আমলে অনেক বাবুয়ানা ছিল। এখন ইংরেজরাও গেছে। বাবুয়ানাও সেরকম নেই। যদিও তাদের রীতিনীতি এখনও বর্তমান। এখানে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঢোকা যায় না। আগে মহিলারা মেম্বার হতে পারত না। একবিংশ শতাব্দীর নারী স্বাধীনতার যুগেও হারেম কালচার। শিক্ষিত রুচিবান ইংরেজদের মধ্য-প্রাচ্যের কেউ শিখিয়েছিল পুরুষ স্বাতন্ত্র। নিজের দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলন সম্ভব নয়, ওরা ভালোই জানত। তাই তাদের তীর্থস্থান, ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে এসে মধ্য-প্রাচ্যের হারেমের স্বপ্ন বলবত। এখানে বেড়াতে এসে দেশের হাড়-কাঁপানো অন্ধকার বৃষ্টিভেজা শীতে পাবে স্নুকার খেলার অবকাশ নেই। তাই এই পলিউটেড সিটির শীতের মিঠে আমেজ উপভোগ করতে যদি-বা সঙ্গিনীদের কখনও ডার্টি কলকাতায় আসতে হয়, বাইরে বেরনো যায় না। স্বামীর সহচর হয়ে সান্ধ্য-মজলিসে ক্লাবেই বিচরণ। দুপুরে তো আর বিকিনি পড়ে গঙ্গার ঘাটে ন্যাস্টি নেটিভদের সঙ্গে স্নান করা যায় না। সে যত পুণ্যেরই হোক। তাই বিয়ার গাল্প করে ক্লাবের সুইমিং পুলে গা ভাসিয়ে সান-বেদ আকর্ষণীয়। দুপুরে যখন ফ্রি, জিন উইথ লাইম কর্ডিয়ালে চুমুক। তিনপাত্তির বাজিতে কিক।

সেই ট্র্যাডিশন বহন করছে এখনকার সোসালাইট। অবশ্য মেম্বারশিপের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে মহিলাদের জন্য। কিছুটা চাপে, কিছুটা তাপে।

সাহেবরা অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে। তার প্রধান, চিন্তা কোরো না। ভাবনার অলীক পৃথিবীতে ভেসে যেও না। ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি, ফর টুমরো উই ডাই। জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে বরণ করে ভোগের সপ্তম মার্গে ভাসিয়ে দাও। এতেই জীবনের সার্থকতা। ভাবলে, যদি একটা বুর্জয়া ক্লাস তৈরি হয়! রাজত্বে, রাজস্বে টান পড়বে যে। সাহেবদের পা-চাটা মূর্খ বাঙালি, রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর, সব গালভরা পদবির ভূষণে, সামাজিক স্ট্যাটাসের নেশায়, সংস্কৃতিকে দাঁও লাগিয়েছে পাশ্চাত্যের মনমোহিনী মাদকতায়।

সাহেবরা চলে গেছে। তাদের বাবুয়ানাও আজ আর নেই। কিন্তু উত্তর কলকাতার সাবেকি পায়রা ওড়ানো বাবুয়ানার রক্ত তো এখনও বইছে। সম্পূর্ণ বর্তমান, অন্য রূপে। সাহেবদের তৈরি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেলে, ক্ষতি কী? কষ্ট করে কিছু করতে হচ্ছে না। শুধু নতুনভাবে সাজানো সেই মজলিস। বৌবাজারের বাইজির মুজরায় নয়, ক্লাবের ফরেনারদের জন্য নিভৃত ঘরে, একাকী। সেখানেই মধ্যবিত্ত বাঙালির নতুন মোড়কের বিদেশি স্ট্যাটাস।

মেম্বার হলে জাতে উঠবে। কালো চামড়ায় সাহেব হতে না পারলেও, নতুন মোড়কে পাতযোগ্য করা। লোকে বলবে, বাঃ বাঃ আমাদের ছেলে হারজিতের খেলায় এগিয়েছে। আজকের পথিকৃৎ। তার হাত ধরেই সভ্যতা বর্তমান। সমস্যা ভোলাতে উৎসব-পার্বণ। অজান্তে সুপ্ত জমিদারি রক্তের আড়ালে ডানা মেলে ভাসতে চায়। ক্যামেলিয়া ক্লাবের প্রাঙ্গণ, লন, সুইমিং পুলের জলরাশির নীলে।

উই আর দ্য এলিট অফ ক্যালকাটা।

এই এলিট কিন্তু ক্লাবের ফ্রি পার্টিতে দামি লেদারের ভ্যানিটি ব্যাগে অলক্ষ্যে ফিস-ফ্রাই গুঁজতে দ্বিধা করে না। কালকের ব্রেকফাস্ট আজকের কুড়নো খাবারে। বিয়েবাড়ির বাইরে ভিখিরিদের দেখে নাক সিটকানো, পাতের এঁটো ছুড়ে পুণ্যি। এলিট কে? ওরা পেটের তাগিদে এঁটোকাটা কুড়িয়ে খায়। সভ্য সুটেড-বুটেড আধাসাহেব। আভিজাত্যের ব্যাজ পরে ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেউ জানবে না। জানলেই বা কী? বড়াই করে বলতে বাধে না “আরে চাকর বাকরদের কী কিছু ঠিক আছে?”

এরা যে কেউ নয়। ক্যামেলিয়ার মেম্বার। জাত আলাদা। ক্লাস অন্য।

সুলগ্না কোন ক্লাসে জানে না। সল্ট লেকের মধ্যবিত্ত, সপ্তপর্ণির পুতুল না ক্লাবের নির্জনে উপেক্ষিত অরগ্যাজমের কামনায় লুকোচুরি। সাহবদের মেরি-লিভিং, বাবুদের বাই-নাচানো কামে জড়িত, আভিজাত্যের মুখোশ আঁটা অতৃপ্ত আইডেন্টিটিলেস ক্লাস। ক্লাস তো একটা আছেই। জানে না নামটা।

সায়ন্তনি শাড়ি খুলে বলল “তাড়াতাড়ি খুলে ফেল। আজ আবার শর্বরী ডেকেছে বিজনেসের ব্যাপারে। অরণির যা দশা, কিছু তো করতেই হবে”

সুলগ্না খাটে, সায়ন্তনির ব্লাউজের দিকে তাকাতে পারছে না। ভাবছে। ওর দিকে না তাকিয়ে বোতামগুলো খুলে ফেলল। সাদা ব্রা। স্তনযুগল বেরবার প্রতীক্ষায়। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শর্বরীর সঙ্গে মোলাকাতের আগে সুলগ্নার থেকেই অরগ্যাজম চাই। এখনই... কামনার পরিত্রাণ না হলে তৃপ্তি নেই। ব্রায়ের হুক খুলে মেলে দিল উদ্ধত স্তনযুগল। তার সব চেয়ে বড় অ্যাসেট।

“কী হল? বসে আছিস”

“আজ থাক না”

"থাকবে কেন? ফুর্তি ছাড়া ঘর ভাড়া গুনবি"

"বিল অনির্বাণের কাছে গেলে কী জবাব দেব?"

"তখন ভাবা যাবে। গল্প বানাতে কতক্ষণ!"

"নীচে অনির্বাণের বন্ধু সমীরণের সঙ্গে দেখা হল। লাউঞ্জে না দেখলে সন্দেহ করতেই পারে"

"আমার সঙ্গে থাকলে কিছুই ভাববে না। এখানে ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে লোকে সন্দেহ করে, মেয়ে-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না"

চোখ ঠেকল সায়ন্তনির বে-আব্রু অবয়বে। লম্বা, বলিষ্ঠ, চড়াই-উতরাই ভরপুর পুরুষালি দেহের আহ্বান। বুকটা তুলে বলল "দেখ্, ভালো লাগছে না?"

কালো উপচে পড়া স্তনের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল। প্রথমবার এক সাবালিকার সামনে নগ্ন। শিউরে উঠল। ওর গভীর অরণ্যে আকর্ষণ নেই। সংস্কার?

"আজ থাক। গল্প করি"

"জামা খুলে গল্প কেন? নে, নে, দেরি করিস না। খুলে ফেল। লজ্জা পাচ্ছিস?"

লজ্জা পায়নি। দ্বিধাগ্রস্ত। বাবার সারা জীবনের সঞ্চয় সল্ট লেকের একতালা বাড়ির ছবি চোখে ভাসছে। এখন নিশ্চয়ই ঘুমচ্ছে। মা সিরিয়াল দেখছে। একমাত্র মেয়েকে হাই সোসাইটিতে বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব খালাস। ঝাড়া হাত-পা, রিটায়ার্ড জীবনে আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নেওয়া। সুলগ্নার মেয়ে এলে সারাদিন তাকে নিয়েই। কখনও সখনও অনির্বাণের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। জামাইয়ের উন্নতিতে গর্ব। সামাজিক স্বীকৃতি।

"জামাই সুইজারল্যান্ডে। বিদেশি কম্পানিতে মোটা মাইনের চাকরি। নাতনি লরেটোতে পড়ে। সপ্তপর্ণিতে বড় ফ্ল্যাট। দারুণ সাজানো। শাশুড়িও ভীষণ ভালোমানুষ। গেলে, কি আদর-আপ্যায়ন" মেয়ে-জামাইয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হারজিতের খেলায় বাবাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। বাবার আশংকাগুলো ভিত্তিহীন, সেকেলে, আজকে অচল। আলবাত তেলে-জলে খাপ খায়। যেন ঘর সংসার করলেই তেলে-জলে মিশে যায়। চেনা গতে চিন্তাধারা। লক্ষ্মণরেখার মধ্যে ঘুরপাক। সামাজিকতায় স্বামী-স্ত্রী। বুঝতে পারে না - সে কোন ধরনের এলিট। বিদেশি ছাঁচের, না বেথুন কলেজের। মধ্যেবিত্ত বাঙালি শিক্ষিত সুন্দরীর ক্লাসটা ঠিক কী?

কাজের পর বাবা টেবলে প্যাকেট রেখে ডাকত "আমার লক্ষ্মী মা কোথায়?"

কলেজ থেকে ফিরেছে। চায়ের কাপটা এগিয়ে প্রশ্ন "ওটা কী?"

"তোর জন্য। খুলেই দেখ" পুরনো আরাম কেদারায় গা এলিয়ে চায়ে চুমুক।

খয়রি কাগজে মোড়া প্যাকেট খুলে মন ভরে যেত। কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ সেক্সপিয়ার। ভাবেনি জীবনটাই ম্যাকবেথ হয়ে যাবে।

ইজ দিস দ্য ড্যাগার আই সি বিফোর মি

দ্যাট ড্রপেথ লাইক দ্য জেন্টল রেনস অফ সামার

হলুদ খয়রি মলাটের রবীন্দ্র রচনাবলী বা সাদা-সবুজের সেক্সপিয়ার শাড়ি-গয়নার বাইরে অন্য ভাবনা। যার সান্নিধ্যে বড় হওয়া।

“শাড়ি-গয়না একদিন পুরনো হয়ে যাবে। এ সারা জীবনের সম্পদ। একে পাথেয় করে জীবনের খোরাক পেয়ে যাবি”

তাই সায়ন্তনির নগ্ন অবয়ব হাতুড়ি মারছে চেতনায়। সাময়িক চাহিদাই কি ক্লাস? সরাতে পারলে কোনও ক্লাস নেই। সীমাহীন সাম্রাজ্য। ক্যামেলিয়া থেকে লাস-ভেগাসের ক্যাসিনো, মহেঞ্জদারো-হারাপ্পা থেকে প্যারিসের সন-জে-লিজের পারাডিসো ল্যাটিনো। পরিধি অসীম।

নগ্ন সায়ন্তনি সুলগ্নার পাশে “এত কী ভাবছিস?”

“কিচ্ছু না” সুলগ্নার স্বরে দীর্ঘশ্বাস।

নিস্পৃহ সুলগ্নাকে চুমু খেল। যেন পাথরকে আদর। উত্তেজনাহীন, কামনা বিহীন। এই কী সে, যার সঙ্গে বারবার দেহ নিয়ে খেলেছে?

সায়ন্তনির হাতটা সরিয়ে বলল “ছেড়ে দে না”

“সব খোলার পরেও বলছিস ছেড়ে দিতে। দেহের জ্বালা মেটাবে কে?”

“সমীরণ দেখে ফেলল। কী ভাবতে কী ভেবে বসে। নিশ্চয়ই অনির্বাণকে বলবে। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা ক্র”

“যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখানে জামা পরে বেশি কিছু সুরাহা হবে না”

পরিণতির কথা যে খুব ভাবছিল তা নয়। হঠাৎ বাবার মুখটা ভেসে উঠতে সব ওলট-পালট। বাবা তো গভর্নমেন্টের জমিতেই একতলা বাড়ি বানিয়েছে। প্রাসাদ, মার্সিডিজ, রাজভোগ, প্ল্যাটিনামের সেট কিছুই দেয়নি। ইচ্ছে কী ছিল না? থাকলেও পারেননি। তা বলে কী জীবন ব্যর্থ? সবাই সব কিছু পায় না। চাওয়া-পাওয়া আপেক্ষিক। সামাজিক ভূষণ। নাই বা সে পেল অনির্বাণের সান্নিধ্য। কী আসে যায়? আর্থিক সাচ্ছল্য, বিলাসবহুল ঘর, ফুটফুটে মেয়ে তো পেয়েছে। এত পাওয়ার মধ্যে দেহের চাহিদার খামতি কতখানি?

মেয়ের মুখটা ভেসে উঠতেই ফিসফিস করে বলল “না রে। পারব না। এখনও ঘর-সংসার আছে”

“আমার নেই?” ঝাঁঝিয়ে উঠল সায়ন্তনি।

"তাই বলেছি? অনেকে তো অনেক কিছুই পায় না। আমার এটা নয় অপূর্ণই রয়ে গেল। ক্ষতি কী?"

"সুযোগ যখন আছে, থাকবেই বা কেন?"

সায়ন্তনির হারানোর ভয়! ট্যানিয়াকে হারিয়েছে। সুলগ্নাকে হারাতে চায় না। ট্যানিয়াও গণধর্ষণের উঠতি মাদকতা থেকে ছিটকে। জিত না হার সেটা বড় নয়। শান্তি নষ্ট হয়েছে। সে আর হারজিতের বড়ে হতে চায় না, রানিও নয়। পাওয়ার মধ্যে হারানোর ভয়।

কিছুদিন আগেই ট্যানিয়া ফোন করেছিল "কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ভালো লাগছে না। বাবাও চান না, এখানে আর থাকি। যা ঘটে গেল, এর পর মুখ দেখাব কী করে?"

"অত ভাবছ কেন? টিভির খবর তো দুদিনেই বাসি। কিছুদিনেই লোকে ভুলে যাবে"

"সবাই ভুললেও আমি তো পরছি না"

"তুমিও ভুলে যাবে"

"এখানে ভালো লাগছে না। মফস্সলের মেয়ে। ওখানেই ফেরত যেতে চাই"

"আবার বার্নপুর। ওখানে কী তোমাকে ছেড়ে দেবে? পাঁচ কথা হবে না"

"বাবা-মা আছে। ছোটবেলার বন্ধুরা"

"গ্রহণ করবে? আমার মতো ভালোবাসবে?"

"তোমার মতো না হলেও, মেয়ের মতো বাসবে" পরোক্ষ বিদ্রুপ। বুঝতে পারলেও কিছু বলার ছিল না। ট্যানিয়া তার কবল থেকে অনেক দূরে।

দৃঢ়ভাবে বলেছিল "এখানে থাকলে ভালো করতে। কিছুদিন এনিয়ে কথাবার্তা হত ঠিকই। কাজে ডুবলে আবার দুনিয়া ফিরে পেতে"

"আমার কোনও দুনিয়া নেই। কিছুদিন তোমাদের সোসাইটিতে ঘুরেছি বলেই কি আমি এখানকার?"

"আমি তোমার কেউ নয়?"

"নিশ্চয়ই অনেক কিছু। কলকাতার স্মৃতি। আনন্দ-ফুর্তি, সেটাও নতুন শিক্ষা"

"এত তাড়াতাড়ি আনন্দকে বাদ দিলে?"

"ভেতরের অনুভূতিকে চাখা হয়ে গেছে। এবার বিয়ে"

"তোমায় কে বিয়ে করবে?" সায়ন্তনির কথায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

"দেখা যাক। এবার ছেলের সঙ্গে বাকিটা"

সায়ন্তনির মুখে থাপ্পড়। তার থেকে ছোট ট্যানিয়ার বিদ্রুপ। রাগে শিরশির করে উঠল গা। ভাবে কী? সুখের দিনে প্যান্টি খুলে মজা লুটে এখন তার অস্তিত্বই নেই! বউকে না জানিয়ে বাবুদের বেশ্যাবাড়ি যাওয়া।

চেহারাটা অচেনা। যোনিটাই অতি পরিচিত। সায়ন্তনি কী ভোগের সোপান?

রুক্ষভাবে বলল "চাইলেই পেয়ে যাবে? অত সহজ!"

"এই দুনিয়া আমার নয়" ট্যানিয়ার স্বরে দৃঢ়তা।

মেয়েটা কী পাগল? এত সুখ, নাম, টাকা, গ্ল্যামার, সহজ ফুর্তি আর কোথাও পাবে? পালাতে চাইছে কেন? জীবনের তালগোল পাকানো ঠাট্টাগুলো যখন আসেপাশে এভাবে ভিড় করে, তখনই কী পালাবার স্পৃহা জাগে! তখন মনে পড়ে, আকাশের পশ্চিম কোণে শেষ তারাটার কথা। নিজের কথা। অনেকের অব্যক্ত বেদনা। .অচিনপুরের রাজকন্যের সোনার কাঠি হাতছানি দেয় না। দুঃস্বপ্নে ভেসে জীবনকে টানতে মন চায় না। রক্ত ঝরলেও সৃষ্টির কুঁড়ির সাধ জাগে। মারিজুয়ানার নেশায় বুঁদ না হয়ে, মরণকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলা। দেখতে সাধ জাগে, চিরনিদ্রার শান্তিকে একান্ত আপনার করে।

"আমি কী নিয়ে থাকব?"

"আমার মতো হাজারো ট্যানিয়া আছে। খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। ভালো থেকো সায়ন্তনি" ফোনটা কেটে দিয়েছিল।

ট্যানিয়া হারিয়ে গেছে। ট্যানিয়ার প্যান্টির অন্তরালে জলপ্রপাত শিহরণ জাগলেও, সুলগ্না এখন ওর জায়গায়। সবার যৌবনের বহিঃপ্রকাশ একই। গোপন অংশ নিয়ে খেললে একই অনুভূতি। ওর আধিপত্যই প্রধান। আজকে থমকে। শর্বরী আবেগ নয়, আধিপত্যকামী। দুনিয়াদারিই প্রধান। ট্যানিয়ার পরে সুলগ্নাও হাতছাড়া, মেনে নেওয়া কঠিন।

অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধলেও স্বরে মাখন "জানি, অনেক কিছু পেয়েছিস। আবার হারিয়েওছিস। এখানে হিসেব-নিকেশ নয়। স্রেফ আনন্দ। অধিকার নেই?"

"কে বলল নেই?"

"তোর স্বামী ঢোকাতে চাইলে ফিরিয়ে দিবি?"

"না। ফেরাব কেন?"

"স্বামী বলে? না তোর ইচ্ছেয়"

"দুটোই"

"স্বামীকে সন্তুষ্ট যদি আনন্দের পাথেয়, আমিই বা বাদ কেন?"

"তুই স্বামী নোস"

"অনির্বাণ না হয়ে অন্য কেউ হলে ফিরিয়ে দিতিস?"

"আমায় ভালোবাসিস?"

"আলবাত। নইলে কাপড়-জামা খুলে ফেলতাম না"

"আমি তো তোকে বাসি না"

"তবে কেন এতদিন খেলেছিলি?"

"খেলিনি। অনেকদিন না করে করে থাকতে পারছিলাম না। তুই বুকে হাত দিলি। নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না"

"সেদিন যদি খারাপ না লেগে থাকে, আজ কেন? ইচ্ছে খতম"

"শুধু ইচ্ছে-অনিচ্ছে নয়। ঠিক-ভুলও"

"অন্য ছেলের সঙ্গে করা ঠিক, আর আমার সঙ্গে ভুল। এ তোর সংস্কার"

সংস্কার তো বটেই। আপ-ব্রিঙ্গিং না ওরিয়েন্টেশনে, যতটা না দেহে-মনে। না কি, পরিবর্তনশীল মূল্যবোধে?

সায়ন্তনির নগ্ন উজ্জ্বল অবয়বে চোখ "মনে হল না করাই ভালো"

সায়ন্তনি প্রশস্ত স্তন উঁচু করে বলল "ফিরিয়ে দিবি?"

সুলগ্না খাট ছেড়ে উঠে পড়ল "আমায় ছেড়ে দে। না, না, না। পারব না। আমার মেয়ে আছে। আমার দিকে চেয়ে। কাপড় খুলে কোন সাহসে দাঁড়াব? আমায় মুক্তি দে"

এই প্রথম সায়ন্তনি অনুভব করল উত্তরসূরি না থাকার ব্যথা। ছেলেমেয়ে থাকলে সেও হয়ত পিছিয়ে যেত। সোসালইট মা, তার মাতৃত্বকে জগাতে পারেনি। শূন্যতা রয়ে গেছে। যা ট্যানিয়া, সুলগ্নাও ভরাট করতে পারবে না। অরণি চিন্তার বাইরে। আর লীলাখেলা নয়। খুঁজতে হবে মনের গভীরের চাবিকাঠি। সায়া, ব্রা, ব্লাউজ পরে বলল "একসঙ্গে বেরোব। নইলে সমীরণ সন্দেহ করতে পারে"

সায়ন্তনিকে গোছাতে দিয়ে সুলগ্না বলল "পেয়েই বা কী লাভ? না পেলেই বা কী ক্ষতি?"

সায়ন্তনির সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। সুলগ্না কী বলছে বুঝতে পারছে না। ও যে এ ভাষা বোঝে না। মানুষ সব দিকে হেরে গেলেই এসব বলে।

ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিন্নায়ং।

ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়নং পুরানো ।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

গীতার শ্লোকে ঘুরে তাকাল শর্বরী। ভিড়ের মধ্যে কে আওড়াচ্ছে? লোকটির ওপর চোখ পড়ল। মাঝারি লম্বা, সুদর্শন, উজ্জ্বল চোখ। স্বপ্নিল নয়, তীক্ষ্ণ অথচ নিস্পৃহ। পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক, হাতে পানীয়।

ছকের বাইরে। পার্টির ভিড়ে গীতা। লোকের ভিড়ে হারিয়ে ফেলল তাকে। নানা লোকের কথাবার্তা। শর্বরীর মাথায় ওই শ্লোকের কথা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিখ্যাত শ্লোকগুলো জানা। আত্মা অবিনশ্বর। বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। দমবন্ধ লাগছিল বলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আধো অন্ধকার। সামনে দুটো বড় গাছ। পাতার ফাঁক দিয়ে খোলা আকাশ। অজস্র তারা। মনে পড়ল, ছোটবেলায় বাবার পাশে জ্যোৎস্নায় তারা গোনা। অরুন্ধতী, স্বাতী, মৃগশিরা, পুনর্বসু। বাবা নাম ধরে চিনিয়ে দিত। নরম মন নিয়ে দূরের জিনিসকে কাছ থেকে দেখা। আজ এই অন্ধগলিতে মনটাই হারিয়ে গেছে। তারা আছে। দেখার মন নেই।

হঠাৎ চোখ পড়ল বারান্দার কোণে সেই লোকটি, যে গীতা আওড়াচ্ছিল। বারান্দার থামে ভর দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে। এগিয়ে গেল ওর দিকে।

"পার্টির মধ্যে গীতা আওড়াচ্ছিলেন কেন?"

লোকটা ফিরে তাকাল "আমায় বলছেন?"

"আপনি ছাড়া তো অন্য কেউ নেই। গীতা আওড়ে খুব স্মার্ট দেখাতে চাইছিলেন?"

"মানে?"

শর্বরী হাসল "অফেন্স নেবেন না। ভোগবাদীদের ভিড়ে গীতা বেমানান"

"আমি এমনই" ফের অন্ধকারে তাকিয়ে।

অস্বস্তিকর নীরবতা শর্বরীই ভাঙল "প্লিজ মাইন্ড করবেন না। আপনার শ্লোক শুনে বাবার কথা মনে পড়ে গেল। কয়েক বছর আগে অ্যাক্সিডেন্টে সব শেষ" ঢোক গিলল "কী বলব ভেবে পাচ্ছি না"

"ভাবার তো দরকার নেই"

আবার অস্বস্তিকর নীরবতা। শর্বরী শুনতে পাচ্ছে ফেলে আসা গান। যা লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। হারজিতের নেশায় মুছে গেছে জীবন থেকে। সেখানে তারা জ্বলে না। ধ্রুবতারার সন্ধান দূর-অস্ত। শুধুই শূন্যতা।

নিচু স্বরে প্রশ্ন করল "আচ্ছা, মৃত্যু কী?"

"এটা কোনও প্রশ্ন হল?"

"জীবনের আসল প্রশ্ন নয় কী?" অবাক, ওর দিকে তাকাল।

"ঠিক বলেছেন। ক'জন বোঝে? আমি দেবজিৎ। দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়"

"আমি শর্বরী বসু"

"মৃত্যুর ব্যাপারে কী জানতে চাইছিলেন?"

"মৃত্যু কী জীবনের শেষ! না, আর একটা জীবনের শুরু?"

“আত্মার পুরনো শরীর ফেলে নতুন শরীর গ্রহণ”

শর্বরী বিরক্ত “ও সব ছেঁদো কথা ছাড়ুন। বহু শুনেছি। আমিও গীতার শ্লোক মুখস্থ বলতে পারি। শুনবেন?

নৈনং ছিন্দমিত শসত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়মত্যাপো, ন শোষয়তি মারততঃ

এসব ছেলেভোলান ছড়া”

দেবজিৎ অবাক “বাঃ, দারুণ বললেন”

“ভাবেন বুঝি আমরা মেয়েরা শোপিস? হাঁড়ি-খুন্তি নাড়া ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না? সিরিয়াস আলোচনা করতে বাধা কোথায়?”

লজ্জা পেল দেবজিৎ “না না, সে ভাবে ভাবছেন কেন? তবে কি না, এসব ভারী আলোচনা আগে মেয়েদের মুখে শুনিনি”

“এখন শুনলেন। এবার বলুন তো মৃত্যু বলতে কী বোঝেন? শ্লোক, গীতা না ফলিয়ে, নিজের ধারণাটা বলুন”

“আমার ধারণা জেনে কী হবে?”

শর্বরী জোর দিল “তবুও জানতে চাই”

“থাক না। আরেকদিন হবে। চলুন, ভেতরে যাই” এড়িয়ে যেতে চাইল। অজানা, অচেনা মেয়ের সঙ্গে একা বারান্দায়, পার্টির মাঝখানে তত্ত্বকথা আলোচানার মানেই হয় না। তার জীবনদর্শন দিয়ে এই আধুনিকাকে বিড়ম্বিত করার অভিপ্রায় নেই।

দেবজিৎ চলে যেতে আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইল। বেফাঁস কিছু বলেছে? এড়িয়ে গেলেন কেন? একটু ভাবতেই মনে হল অনৈতিক কিছু বলেনি। এটা ঠিক সময় নয় এ সব আলোচনার। পরে দেখা হলে তোলা যাবে। লোকটার মধ্যে কিছু আছে। জানতে হবে। কী ভাবে?

দেবজিৎ ততক্ষণে ঘরে।

চব্বিশ

সায়ন্তনিকে অরণি বলল “খেতে দেবে না?”

“আবার খাবে? কিছুক্ষণ আগেই তো খেলে। সেটাও শেষ করতে পারনি” আশ্চর্য সায়ন্তনি।

“আবার খিদে পাচ্ছে”

“কী খাবে বল? রোল করে দিই”

“যা খুশি”

সায়ন্তনি কিচেনে ঢুকতেই কিছু খুঁজতে অরণি নিজের ঘরে। না পেয়ে বেরিয়ে এল “দেখ তো মোবাইলটা কোথায় রেখেছি”

দরজার ফাঁক দিয়ে সায়ন্তনি দেখল, ওটা বসার ঘরের কফি টেবলে।

আঙুল তুলে দেখাল “ওই তো, টেবলে”

অরণি মোবাইলটা নিয়ে ব্যাটারি খুলতে লাগল। খাবার নিয়ে ঢুকতেই দেখল অরণি মোবাইলে সিম কার্ড ঢোকাচ্ছে “সিম কার্ড বার করছ কেন?”

“কার্ডটা পাল্টে ফেললাম” খাবার টেবলের দিকে এগোল।

“পালটালে কেন?”

“অনেক উল্টোপাল্টা কল আসছে” মোবাইল টেবলে রেখে এগ-রোলে কামড়।

যা খুশি করুক। অত সময় নেই। ঘরের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে। শর্বরী বসু কয়কজন আর্ট এক্সিবিশনের অর্গানাইজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। টাইম দিয়েছে। কিচেনটা গোছাতে ঢুকে পড়ল। অরণিকে নিয়ে নষ্ট করার সময় নেই। রোলটা আধা খেয়ে অরণিও বাথরুমে। পুরটা শেষ করার সময় নেই। অফিসে বেরোতে হবে। অফিসের কাজে মন নেই। ঘুরে বেড়াতে, বাজার করতে ইচ্ছে করছে।

অনসূয়া টেবলের কাছে এসে বলল “জাভার এই চারটে লাইন ডি-বাগ করতে পারছি না”

তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেশ সেজেছে তো। ৫’ ৪” হাইট। খয়েরি স্ল্যাক্স, সাদার ওপর লাল-খয়েরি ফুল আঁকা টপস। লিপস্টিক। একটু ভারী হলেও বব চুলে মন্দ লাগছে না।

ওকে এভাবে তাকাতে দেখে বলল “কী দেখছ? আমায় আগে দেখনি”

“তোমায় ভীষণ সুন্দর লাগছে। আজ সন্ধেবেলা কী করছ?”

“তেমন কিছু নয়। বরুণ, অমিয়, চিরন্তন সবাই ব্যস্ত”

“তন্ত্রতে যাবে না?”

হেসে ফেলল “আমার তন্ত্রের পেছনে কেন? তুমি তো আর যাবে না”

“যেতেও পারি। নিয়ে যাবে?”

আশ্চর্য! কী বলছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না। এ কী সেই অরণি যাকে এতদিন দেখে আসছে? কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

“ঠাট্টা কর না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, ভাবতেও পারি না”

“কেন? না ভাববার কী আছে? বলছি তো যাব। আজই। যা বোঝার তাড়াতাড়ি বুঝে নাও। তারপরে বেরব”

অনসূয়া শকড। এতদিন পর, ও অন্য জীবন চাইছে “বেশ। আজ সারা সন্ধে তোমার সঙ্গে...”

“দেখি তোমার প্রোগ্রামটা কই?”

“একটু সরে বস। লেট মি লগ অন টু মাই ডমেন ওয়ার্কস্পেস” মাউস দিয়ে হাইলাইট করল “এই যে এখানে। বারবার এরর দেখাচ্ছে। বুঝতেই পারছি না, কোথায় গন্ডগোল”

অনসূয়া বঙালি হলেও কলকাতার মেয়ে নয়। চাকরি সূত্রে বাবা-মা ব্যাঙ্গালুরুর স্থায়ী বাসিন্দা। স্কুল-কলেজ সব ওখানেই। মা বাংলায় এমএ বলে বাংলাটা শেখাতে দ্বিধা করেনি। চাকরি নিয়ে কলকাতায় শেয়ারড্ অ্যাকোমোডেশনে সল্ট লেকের এফই ব্লকে। দিনে উইপ্রোটেকের ক্যান্টিন। রাতে কোথাও একটা। না বেরলে অন লাইনে সুইগি। অ্যাকোমোডেশনে রান্না বারণ।

অনসূয়াকে সরিয়ে নিজের কি-বোর্ডে। আর এরর নেই।

“কী করলে?”

“ঠিক করে দিলাম” মুচকি হাসল।

“কী হয়ছিল?”

“স্ক্রিপ্ট ঠিকই ছিল। প্রসিডিওর কল ঠিক হয়নি বলেই এই গন্ডগোল। আমার দুটোয় কাজ শেষ। তারপর বেরব। বাজার করার আছে। কোথাও খেয়ে তন্ত্রতে”

“বেশ” অনসূয়া উঠে পড়ল।

ও চলে যেতেই অরণির মনে হল এরা শিশু। এখনও অনেক শেখা বাকি। কম্পিউটারে একের পর এক সাইট খুলে যাচ্ছে। সবেরই লগ-ইন নেম আর পাসওয়ার্ড পাল্টাচ্ছে। ভয়, সবাই যেন পাসওয়ার্ডগুলো জেনে গেছে। ওরা ঢোকার আগেই স...ব... পালটে ফেলতে হবে। কলেজের বন্ধু সুমনকে ব্যাঙ্গালুরুতে ফোন। সেদিন বলছিল নতুন ওয়াই-ফাই সিকিউরিটি সিস্টেম বার করেছে। পাঁচ-ছয় হাজার টাকা।

"হ্যালো। অরণি"

"কেমন আছিস?"

"বলছিলি সেদিন সিকিউরিটি সিস্টেমের কথা। কাল বাড়িতে একটা লাগিয়ে দিবি?"

"কাল হবে না রে। মিটিং আছে"

"তবে পরশু"

"নেক্সট উইকে করলে হবে?"

"না। এই উইকেই। পজিটিভলি পরশু করে দিস। কলকাতার এখন যা অবস্থা। ফিলিং ইনসিকিওরড"

"বেশ। পরশু লোক পাঠিয়ে দেব" ফোনটা কেটে দিল।

কাজ করতে ভালো লাগছে না। অনসূয়ার সঙ্গে ঘুরবে, বাজার করবে, খাবে। সে তো দপুরবেলার পর। কোটাকের সাইটে শেয়ার মার্কেট মনিটার। সেনসেক্স ২৫,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। অনেকদিন কেনা হয়নি। আজ শেয়ার কিনতেই হবে। অনসূয়ার সঙ্গে ঘোরার কথা ভেবে মনে ভীষণ আনন্দ। গার্গী টেবলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কৌতূহলবশত কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখটা পড়ল। দুটো সাইট নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। একটা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, অন্যটা কোটাক সিকিউরিটি।

এনএসই-র গ্রাফে চোখ পড়তেই বলল "সেনসেক্স ভালোই উঠেছে। কিছু বিক্রি করলে?"

"নাঃ। কিনলাম"

"কিনলে?!! এত হাই সেনসেক্স?!!"

"সেনসেক্স আরও বাড়বে। কিছুদিনের মধ্যেই ৩৫০০০ ছাড়িয়ে যাবে"

"৩৫০০০?" গার্গীর চোখে বিস্ময়।

"আলবাত। একবার যখন উঠতে আরম্ভ করেছে, স্কাই ইজ দ্য লিমিট"

গার্গী বড় একটা শেয়ার কেনে না। একটু-আধটু বোঝে। কী বলছে! সেনসেক্সের পারদ যখন চড়ছে, কেউ কেনে? হিসেবে মিলছে না। ও বলছে শেয়ার ৩৫০০০-এর বেশি। অত সহজ?

অরণির দিকে তাকিয়ে বলল "কীসের শেয়ার কিনলে?"

"উইপ্রো, ইনফোসিস"

আইটি সেক্টর বলে একটু-আধটু খবর কানে আসে। এমনিতেই এগুলো ব্লু-চিপ। প্রাইস বেশি। গার্গী শুনেছে, আগামি দিনে আইটি সেক্টরে তেমন গ্রোথ-এর সম্ভাবনা এই। আর অরণি কি না ওখানেই টাকা ঢালছে। নিশ্চয়ই পড়াশোনা করেই।

"দুটো শেয়ার কিনলে?"

“না দুটো নয়, আরও অনেক”

“কত হাজারের?”

“হাজার কী বলছ? লাখের”

চমকে উঠল। এত টাকা অরণি পেল কোত্থেকে? প্রদীপ সেনের মতো আবার কোনও দু-নম্বরি কাজে জড়ায়নি তো। গার্গীর অত লোভ নেই। যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের তারাই ঝট করে বড়লোক হওয়ার নেশায় মাতে।

প্রদীপ সেন শেষমেশ জামিন পেলেও চাকরিটা খুইয়েছে। অরণি আবার সেই ভুল করছে না তো? মনে হয় না। সাধাসিধে অরণিকে সব-সময় ভালোমানুষই মনে হয়েছে। এতদিনে যতটুকু চেনে, ভাবতে পারে না, ও কোনও দু-নম্বরি কাজে লিপ্ত হবে। কার মনে কী, জোর দিয়ে বলা যায় না।

গার্গী বলল “একটু দেখেশুনে কিনো। আমরা তো ব্যবসাদার নই। কষ্টার্জিত টাকা। হিসেব করে দাঁও লাগিও”

গার্গী চলে গেল। আবাক লাগছিল। অরণি তো এমন বেহিসেবি ইনভেস্টমেন্ট কখনও করে না। আজ কেন? শেয়ার মার্কেট না বুঝলেও, এটুকু বুঝতে পারছে কোথাও একটা গরমিল। নইলে এমন কিছু টিপস্ পেয়েছে, যার ভিত্তিতে বেধড়ক্কা টাকা ঢেলে যাচ্ছে। টাকাটা অরণির। গার্গীর কিছু আসে যায় না। তবুও মনে হল, ঠিক করছে তো?

দুটোর পর অনসূয়াকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সায়ন্তনির জন্য শাড়ি কিনতে হবে। কতদিন শাড়ি কিনে দেয়নি। ওর যখন সময় নেই বেরোবার, অনসূয়াকেই পছন্দ করে দিতে হবে।

“সায়ন্তনির জন্য শাড়ি কিনব। কোথায় ভালো পাওয়া যাবে?”

অনসূয়া হেসে বলল “কলকাতায় কী শাড়ি-গয়নার দোকানের অভাব? কোন দিকে যাবে? শিয়ালদহ হলে মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল। গড়িয়াহাটে ট্রের্ডাস অ্যাসেমব্লি, সিলেক্ট স্টোরস, বসাক, ভোজরাজ, প্রিয়গোপাল বিষয়ী। পার্ক স্ট্রিটে মাড়োয়ারি মার্কা শাড়ি পাবে সভেরাতে”

“কয়েকটা ভালো শাড়ি কিনব। তার আগে, চল কোথাও খেয়ে নিই। কোথায় খাবে?”

“যেখানে তুমি নিয়ে যাবে”

“সল্ট লেকে তো প্রচুর রেস্তরাঁ। ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, না মোগলাই”

দুপুরবেলা মোগলাই। আউদে প্রচুর অর্ডার দিল।

“এত খেতে পারবে?”

“আরে খাও না। যা পারবে না, শেষ করে দেব”

শেষ পর্যন্ত বিরিয়ানির প্লেটটাই শেষ করতে পারল না। বেয়ারাকে ডেকে বলল “সব প্যাক কর দে না”

গড়িয়াহাটে আরেক বিপত্তি। যে দোকানেই ঢোকে, সেখান থেকে একটা শাড়ি কিনে ফেলে। অর্নগল বকবক করছে। ক্রেডিট কার্ড তো পকেটে। চিন্তা কী? নো লিমিট। হিসেব করে কিনতে হবে, কেউ লিখে দিয়েছে? কতদিন শাড়ি দেয়নি সায়ন্তনিকে। আজ আবার অনসূয়াও সঙ্গে। ওকেও একটা দিতে হবে। সন্ধে গড়িয়ে রাত। যে অরণি সন্ধের পর কী করবে খুঁজে পেত না, আজ সময়ই পাচ্ছে না। কী বোকাই না ছিল! অনসূয়ারা যখন দল বেঁধে তন্ত্রতে, কি কুক্ষণেই না ঘরে বই নিয়ে। জীবনটা ভোগের। সায়ন্তনি যদি করতে পারে, সে নয় কেন?

সায়ন্তনির এখন ভোগের চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চিন্তাই বেশি। শর্বরী বসু অপেক্ষা করে ছিল। দেহলীলার বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ইচ্ছে-অনিচ্ছেটা বড় নয়। শর্বরী যা চায় উজার করে দিতে প্রস্তুত। ফোকটে নয়। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। বিনিময় ব্যবসার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। শর্বরীর ক্ষমতা আছে। যদি পাড়ার কেষ্টদাকে কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কৃষ্ণকলি বসু করতে পারে, সায়ন্তনিকে কেন নয়?

সায়ন্তনিকে দেখে শর্বরী হেসে বলল “ইন টাইম। লেটস গো”

নীল জিনস্ সাদা-নীল টপসে শর্বরীকে মন্দ লাগছে না। বব চুল, সানগ্লাস, হাল্কা লিপস্টিক, ডান হাতে ঘড়ি। পার্টির পর ভালোভাবে ওকে দেখাও হয়েনি। নরম গহ্বরের ভিজে ছোঁয়ার স্পর্শটা লেগে। শর্বরীর গাড়িতে আলিপুর।

সায়ন্তনিকে বলল “ড্যাসবোর্ডে সিগারেটের প্যাকেটটা দাও”

কার লাইটারে সিগারেট ধরিয়ে বলল “হেল্প ইওরসেলফ। অ্যাওয়ার্ডের তালিকা দেখেছ? ভূষণ, শ্রী। ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া। এরপর পর্ণশ্রী চালু হবে। অনষূয়া বসু বা সোনালী সাওয়ান্তকে যে কেন দিল না। দে শুড হ্যাভ গট সাম আওয়ার্ড ফর দেয়ার ডুয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড ইনক্রিজড্ পাবলিক রিলেশনশিপ”

হেসে ফেলল সায়ন্তনি। কোথায় দেশটা চলেছে। মিথ্যে বলেনি। ঐতিহ্য আজ মাটিতে। সত্যি, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া। যদি প্রত্যেক সার্থকতাকে এভাবে প্রহসন বানিয়ে ধুলোয় লোটাতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য সায়ন্তনি কেন শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া-ব্রা লোটাতে পিছপা হবে?

পুরনো বাংলোর সামনে গাড়িটা দাড় করিয়ে সিকিউরিটিকে বলতেই গেট খুলে দিল। ড্রয়িং রুমে মধ্যবয়স্ক সোফায় সিগার মুখে। মিষ্টি গন্ধ। মন্দ লাগছে না।

“মিঃ ট্যান্ডন। মাই ফ্রেন্ড সায়ন্তনি। সায়ন্তনি নাগ”

হ্যান্ডসেক করে শর্বরীর পাশে বসতে লক্ষ করল অশোক ট্যান্ডন তাকে মাপছে “কফি?”

"উইদাউট মিল্ক। ওয়ান সুগার" শর্বরী বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল।

সিগারে টান দিয়ে অশোক ট্যান্ডন বলল "ইউ ওয়ান্ট টু ডু বিজনেস? আর্ট এক্সিবিশন"

"শর্বরী টেলস মি দেয়ার ইজ গুড মানি" সায়ন্তনি উৎসুক।

"অ্যাট ইওর ফ্ল্যাট। ক্যান ইউ স্পেয়ার ইট ফোর টাইমস্ এ ইয়ার অ্যাট লিস্ট?"

"ইফ ইউ সো উইশ"

"উই উইল ইউজ ইট ফর এক্সিবিশন। ইউ গেট এ পার্সেন্ট অফ দ্য প্রফিটস্"

"দ্যাট উইল স্যুট মি জাস্ট ফাইন"

"গ্রেট ডিমান্ড ফর আর্ট নাউ। পিপল বাই আর্ট নট ওনলি ফর কালেকশন, বাট ফর ইনভেস্টমেন্ট। ইটজ লাইক গোল্ড। ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন ইট সেলস অ্যাট অ্যান এলিভেটেড প্রাইস। প্লেন্টি অফ ইয়ং ট্যালেন্টস্ ইন দ্য ডিস্ট্রিক্টস লুকিং ফর এক্সপোজার, বাট উইদাউট দ্য নেসেসারি রিসোর্সেস। উই প্রোভাইড দেম দ্য প্ল্যটফর্ম, ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ইন রিটার্ন মেক সাম মানি"

"নট সাম। সে গুড মানি অশোক। এলস সি উডন্ট বি ইন্টারেস্টেড" শর্বরী টিপ্পনি কাটল।

"ওয়েল নট ব্যাড টু টক অফ" অশোকের সম্মতি।

শর্বরী বলল "এ নিউ চিক ফ্রম বহরমপুর পেইন্টিং ভেরি ওয়েল। ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এ লট অ্যাবাউট আর্ট, বাট সি লুকস প্রমিসিং। উই ক্যুড ট্রাই হার আউট"

কফিটা ট্রে থেকে এগিয়ে অশোক বলল "প্লিজ... ভেরি ওয়েল দেন। গিভ মি ইওর কনট্যাক্ট ডিটেলস্। গেট ইন টাচ উইথ ইউ হোয়েন দ্য টাইম কামস"

সায়ন্তনি আশার আলো দেখতে পারছে। মধ্যবিত্ত জীবনে উঁচু লাইফ-স্টাইলের জন্য টাকা চাই। তা আসবে উচ্চবিত্তদের হাত ধরে। স্বামীর মতো ছা-পোষা থাকলে, চিরকাল দাসত্বের মাস মাইনে ছাড়া গতি নেই। চাকরি চলে গেলে ভাগ্যকে দোষারোপ। তাকে জিততে হবে শর্বরীর হাত ধরে। প্রয়োজনে বারবার ওকে দৈহিক বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রাখতে হবে। সি ওয়ান্টস্ দ্য অরগ্যাজম অফ লাইফ। এ খেলা এতদিনে তার নখদর্পণে। সি উড গিভ হার দ্য মোস্ট প্যাশনেট অরগ্যাজম অফ হার লাইফ, টু মেক হার ওয়ে টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মানি।

অ্যাট এনি কস্ট।

অরণি তন্ত্র থেকে ফিরল, তখনও সায়ন্তনি বাড়ি ফেরেনি। বাড়িতেই বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে অর্গিতে ব্যস্ত থাকাও আশ্চর্য নয়। ওর ঘরে সিগারেটের টুকরো খুঁজতে লাগল। কোথাও পুরুষের উপস্থিতির চিহ্ন। ঘরের

আলো জ্বালিয়ে মোটা ফ্রেমের চশমা দিয়ে বেডসিটে সিমেনের হলুদ দাগ খুঁজছে। নীল বেডকভারে দাগ দেখা না গেলেও, সাদা বেডসিটে ধরতে মরিয়া। রাত একটা। অরণি ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানে না কখন সায়ন্তনি ফিরেছে। পাশের ঘরে নাইটি পরা সায়ন্তনি নিশ্চিন্ত ঘুমে। সামনেটা খুলে একটা স্তন বেরিয়ে। কদ্দিন বউয়ের স্তন নিয়ে খেলা করেনি। এত সুন্দর আগে বোঝেনি। ওর পাশে শুয়ে স্তনে হাত। বউ বলে কথা। অধিকার আছে। আজ হাজির স্বামীত্বের দাবি নিয়ে। হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল সায়ন্তনির।

"তুমি! করছ কী?"

ওকে জাপটে ধরল। মুখে গালে এলপাথারি চুমু। হাতের নিষ্পেষণে উন্নত বক্ষ-যুগল ক্ষত-বিক্ষত।

"আহঃ লাগছে। নিজের ঘরে ঘুমোতে যাও" বিরক্ত, ধমকানি।

অরণির শোনার সময় নেই। নাইটির দড়িটা খুলে সরিয়ে সায়া তুলে প্রস্তুতি।

"কী পাগলামি করছ। লাগছে। ছাড়"

অরণি নাছোড়বান্দা "তুমি আমার বউ। অন্যের সঙ্গে ফুর্তি করতে পার, আর আমি করলেই ব্যথা লাগে?"

অরণিকে ঠেলতেই কসে থাপ্পড় বসাল। আজ পৌরুষ জেগেছে। ওকে ভোগ করবে স্বামীত্বের অধিকারে। থাপ্পড়ে ঘাবড়ে গেল সায়ন্তনি। এ রূপ আগে দেখেনি। আজ বোধহয় থামানো যাবে না। সারাদিন ঘুরে এমনিতেই ক্লান্ত। দেহে শক্তি নেই। থাপ্পড়ে কাবু। সব শক্তি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল। পারছে না। পাজামার দড়ি খুলে আন্ডারওয়ারটাও নামিয়ে ফেলেছে। সায়ন্তনি হাল ছেড়ে দিল। করবে, তো করে নিক। তারপরে তো ঘুমোতে পারবে। চোখ বুজে প্রবেশের অপেক্ষায়। কিন্তু কই! কোনও উদ্ধত পুরুষাঙ্গ তো যোনিদ্বারে চাপ দিচ্ছে না। শুধু ল্যাতল্যাতে মাংসপিণ্ড উরুতে ঘষছে। লালসা থাকলে মিটিয়ে নিক। প্রতিবাদ থামিয়ে সে উন্মুক্ত। ১৫ মিনিটেও প্রবেশের অক্ষমতায় সচকিত সায়ন্তনি। এ কোন অরণি। পৌরুষও হারিয়ে ফেলেছে? অনেকদিন করেনি বলেই কী অধঃপতন। না কী, ক্ষমতাই হারিয়ে গেছে।

বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে এটা স্বাভাবিক নয়। কোথাও একটা গন্ডগোল। কিন্তু কোথায়?

পঁচিশ

হারউড পয়েন্ট থেকে লঞ্চে উঠে পড়ল বিদিশা।

ওরা দল বেঁধে ফ্রি ক্যাম্পে। ওকেও সঙ্গে আসতে বলেছিল। সোশাল সার্ভিস কিছু নয়। হাসপাতালগুলো জনপ্রিয়তা বাড়াতে মাঝে-মধ্যেই এরকম ফ্রি ক্যাম্পের আয়োজন করে। চাকরি। আসতেই হবে। ব্যবসা বাড়াবার ফ্রি ক্যাম্পে বিদিশার পুণ্যি লাভ হবে না। এভাবে করতেও চায় না। কর্পোরেট চাকরি। হুকুমের দাস। কলা যখন বেচতেই হবে, রথ দেখার লোভটাও সামলাতে পারেনি। জয়তীদের সঙ্গে আসার থেকে একা রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে ড্রাইভে অনেক তৃপ্তি। ওদের ক্যাচক্যাচানির থেকে, প্রকৃতিকে নিজ মহিমায় একাকী উপভোগ করার মধ্যে, ছোট ছোট শখগুলোকে পূরণ করার অবকাশে অন্য পাওয়া।

গঙ্গার বুকে ঢেউয়ে রোদ পড়ে ঝিলমিল করছে। চোখ রাখা যায় না। দূরে সূর্যের আলোর ঝলকানির সামনে একটা নৌকোর সিল্যুয়েট। ক্যামেরায় ফোকাস করতেই এলসিডি স্ক্রিনে গঙ্গার দৃশ্য। এতই ব্রাইট যে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে ফ্রেমিং করে, শাটারে ক্লিক। কে জানে, কেমন হবে? পরে ছবিটা দেখেছিল। অসাধারণ। সিলভার সিলভার এভরিহোয়ার ক্যাপশন দিয়েছিল। রুপোর থালায় সহস্র মুক্ত কে যেন ফেলে রেখেছে। একটানা ঘিট-ঘিট শব্দ করে লঞ্চটা এগিয়ে চলেছে মুড়িগঙ্গার জল কেটে। ঝিমুনি এসে যায়। ঘুম তাড়াবার জন্য, এধার-ওধার তাকাল। লঞ্চ এগোচ্ছে কচুবেড়িয়ার দিকে। নদীর পাড়টা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে ইঁটভাটাগুলো। লম্বা চিমনি। গলগল করে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। এক জায়গায়, নদীর পারে অনেকগুলো নৌকো পরপর উল্টো করে রাখা। আবার ক্লিক। দারুণ পার্সপেকটিভ পেয়ে মনটা ভরে গেল। এই দৃশ্য একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে ক্যামেরাবন্দি এই মুহূর্ত। যার স্মৃতি বুকে করে বেড়াবে বহুদিন।

অন্যদিকে বহু দূরে নদীর পার। নদীটা এখানে অনেক চওড়া। ওপার প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মনে হয় সমুদ্র। তফাত শুধু ঢেউয়ের আকারে। এখানে ঢেউগুলো অনেক ছোট। সমুদ্রের মতোই জল প্রায় নীল। স্রোতের টান বেশি। জলের ওপর কয়েকটা গাঙচিল উড়ছে। হঠাৎই একজোড়া একেবারে লঞ্চের কাছে চলে এল। বিদ্যুৎগতিতে ক্যামেরা তাক করে বিদিশা আবার শাটার টিপল। অপূর্ব শট। মনে মনে ফটোটার নাম দিল দ্য পেয়ার ইন ফ্লাইট। ভেসে বেড়াবার মধ্যে যে আনন্দ, এদের না দেখলে বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ থেকেই মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ কানে আসছিল। এবার তার উৎসটা খুঁজে পেল। দূরে বাঁ দিকে এক

জায়গায় অনেকগুলো লঞ্চের ভিড়। পাড়ে অনেকগুলো বাস-জিপ-ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেশ কয়েকটা স্টিমার সাগরের যাত্রী নিয়ে পারাপার করছে।

"ওটাই কচুবেড়িয়া দিদিমনি" ঘুরে দেখে লঞ্চের লোকটি।

"আমাকে বলছেন?"

"হ্যাঁ দিদিমনি। ওটাই কচুবেড়িয়া। কলকাতা থেকে বাসে করে লট ৮ পর্যন্ত এসে ওপারে সাগরে যায় বেশিরভাগ লোকে"

সত্যিই, ওখানে খুব ভিড়। মাইকে অনবরত ঘোষণা। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। বেশ হই-চই হচ্ছে। স্টিমারগুলো যে জেটিতে এসে যাত্রী নামাচ্ছে, সেখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরা লাইন ঠিক করে যাত্রীদের ভালোভাবে নামতে সাহায্য করছে। বিদিশাদের লঞ্চ দাঁড়াল ভিআইপি জেটিতে। এখানে স্বেচ্ছাসেবক নেই, আছে সরকারি কর্মচারী। জেটি থেকে বেরতেই হাজার মানুষের ভিড়। বিদিশার কাছে এ এক অচেনা জগৎ। এতদিন ভারতবর্ষ কথাটা শুধু শোনাই ছিল। এই প্রথম দেখল সেই ভারতকে। কে নেই সেখানে? বাঙালি, বিহারি, রাজস্থানি, গুজরাটি, উত্তরপ্রদেশীয়। সত্যি সত্যিই মহামানবের সাগরতীর। তীর থেকে মেলার সাগরপাড় ৩০ কিলোমিটার। বাসে ট্রেকারে বা ট্যাক্সিতে যেতে হবে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সূর্য পাটে। নদীর জল আস্তে আস্তে লাল থেকে ধূসর হয়ে কালোতে। পটাপট আলো জ্বলতেই চারদিক উজ্জ্বল। আগে কখনও দেখেনি। একটা ঘোরের মধ্যে ট্রেকারে উঠল। সাধারণ বাসগুলোয় এত ভিড় যে ঠেলাঠেলি করেও উঠতে পারত না। কদ্দিন বাস ঠেলে ঝোলার অভ্যাস চলে গেছে। অন্ধকার সাগরদ্বীপের বুক চিরে এক ঘণ্টায় বাস পৌঁছে দিল সাগরমেলায়।

এর নাম গঙ্গাসাগর।

না সাগরমেলা।

না কি মানবমেলা।

অজস্র মানুষ আর মানুষ। দোকানও। এখানেও ক্রমাগত মাইকে নানারকম ঘোষণা। বেশিরভাগ-ই হারানো মানুষের খোঁজ। তার মধ্যেই কীর্তন, রামনাম। যেন এক বিচিত্র হরেকরকম্বা। মূল কপিল মুনির আশ্রমের কাছে অসম্ভব ভিড়। ভালো পুলিসি ব্যবস্থা। এত নিঁখুত বন্দোবস্ত দেখে মনে হল, কে বলে পশ্চিমবঙ্গে কোনও অর্গ্যানাইজেশন নেই? আছে, দেখতেই পাচ্ছে। ভালো লাগল। ওদিকে খুব ভিড়। একটু এগিয়ে দেখল সাধুদের জটলা। এক বিচিত্র দৃশ্য। কত রকমের সাধু সেখানে। বিচিত্র চেহারা, বেশবাস, বিচিত্রতর জটা। কয়েকজন সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাধুও হাজির। পুণ্যলোভীরা মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরেছে তাঁদের। কয়েকজন

তো আবার হাউহাউ করে কাঁদছে। মনে হল সাধুদের মধ্যে কয়েকজন এর-ই মধ্যে ভালো ব্যাবসাও ফেঁদে ফেলেছে। জড়িবুটি দিচ্ছে।

যত মানুষের অসহায়তা, ততই জড়িবুটি থেকে ভাগ্যলিপির খেলা। সবাই যেন কাল-কে পিছনে ফেলে জয়ী হতে বদ্ধপরিকর। মানতে পারে না, জীবন শুধু সুখে ভরা আনন্দের দেওয়ালি নয়। দুঃখ ব্যথার সন্ধ্যারতিও। আরো ঘুরে ঘুরে মেলা দেখার ইচ্ছে থাকলেও মেডিক্যাল ক্যাম্পে যেতে হবে। বাধ্য হয়েই ক্যাম্পে ফিরতে হল। শুনেছে নবান্নের এক আমলা সব বন্দোবস্ত করেছে। দেবজিৎ। দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়। নামটাই জানা। চেনে না। কাল খোঁজ নিতে হবে।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই ছুটে সাগরতটে। সূর্য তখনও জলের তট ছেড়ে, পুবে ঝিলিক মারছে না। তার রং মেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার আগে আর-একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। উঠলেই বারো ঘণ্টার পরিক্রমা। পুব আকাশে সবে লালচে আভা। সাগরের জল স্লেট রঙের। তার মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে পুণ্যস্নান। পাপ ধুয়ে সবাই পবিত্র হতে চাইছে। এটা শুধু রীতি নয়। এর সঙ্গে আদি ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। রোজকার জীবনে নানা ভালমন্দের সঙ্গী মানুষ সচেতনভাবেই পাপ আর পুণ্যকে নিজের করে নেয়। বিশেষ সময়ে সেই পুণ্যের নির্যাসটুকু রেখে পাপ ধুয়ে ফেলে হাল্কা হতে চায়। এই চাওয়াই বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতকে এক সুরে বেঁধে ফেলে। তাকে মুহূর্তের জন্য হলেও উপলব্ধি করতে সবারই মন কেঁদে ওঠে। কী পেল, না পেল পরের ব্যাপার। অনুভব করতে তো ক্ষতি নেই।

দৈনন্দিন পাপ ধুয়ে নিষ্পাপ হয়ে জীবনে ফেরার স্বপ্ন। আঁশগন্ধে ভরপুর দুনিয়ায় নতুন করে বাঁচতে চাওয়া নির্মল পবিত্রতায়। এখানে পাওয়া নির্মল মন হারিয়ে যাবে হারজিতের অন্ধগলিতে। তবুও মুহূর্তের পবিত্রতাকে পাথেয় করে শান্তির ছোঁয়া। কোথায় শান্তি? এই যে অজস্র মানুষ একসঙ্গে জলে, সবাই কী শান্তি পাবে? পুরুষ-নারী-বাচ্চা-বুড়ো কোনও ভেদাভেদ নেই। সবাই চাইছে পুণ্যের ঘড়া পূর্ণ করতে। গঙ্গাস্নান করলেই যেন সব মিটে যাবে। তৃষিত হৃদয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ক্লেদাক্ত জীবনে একটু আলো। লোকে বলে, এই স্নানেই মোক্ষলাভ। সত্যি কি না সময় বলে দেবে। চেষ্টা করতে বাধা কোথায়?

এদের মতো বিদিশাও হারিয়ে গেছিল। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে নিজেকেই খুঁজছিল। সুবিমলের কাছে হার। পরে অনুরূপদা, অরণি, অনির্বাণের সঙ্গে শেষমেশ জিত। পুরনো হারজিতের খেলাই। অবচেতনে মায়ের দুঃখকে এখনও পূর্ণ করতে পারেনি।

“তুই আমায় শান্তি দিবি না”

“বিয়ে করলেই শামিত শান্তি পেয়ে যাবে?” বিদিশার প্রশ্নে জবাব দেয়নি। দামাল মেয়েকে বুঝিয়ে লাভ নেই। চিরকাল একগুঁয়ে। বৃষরাশি বলে কথা। মন যা চাইবে, তাই করবে। এই হারানোর মধ্যেই পাওয়ার

ঝংকার। একাকিত্বে জীবনের গান। শুনতে পেয়েছে বলেই সংসারের মোহ আকর্ষণ করে না। মায়ার বন্ধনে প্রবঞ্চনা, ব্যর্থতা। ভালো সাজার আড়ম্বর। নিজের দুনিয়ায় আপেক্ষিকতা নেই। আর একা লাগে না। তার পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ। কারোকে নিয়ে সম্পূর্ণতা আনতে হবে, এমন তো নয়। সে একাকী অনন্যা। সত্যি কী? জানে না। তাই শান্তিটা মরীচিকা। ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। আজও খুঁজে যাচ্ছে। যার আকর্ষণে সেও অন্যদের মতো ছুটে এসেছে সাগরমেলায়। এর আগে কখনও আসেনি। এ এক অন্য অনুভূতি। একদিকে প্রকৃতির নিটোল রূপ। অন্যদিকে সুন্দর মুহূর্তগুলো ডিজিট্যালে বন্দি।

ছোটবেলার ছবি তোলার শখটা আজও যায়নি। ছোটবেলায়, প্রকৃতির মধ্যে থাকতে ভালোবাসত। দার্জিলিং, রংপো, থিম্পু, পারো ঘোরা বাবা দাদার সঙ্গে। মনে হত সেই ছবি যদি ধরে রাখা যেত। বাবার একটা পুরনো ভয়গল্যান্ডার ক্যামেরা ছিল। তখন কালার ফিল্মের কত দাম। সেই বয়সে ওটাতেই দৃশ্যকে পটবন্দি করতে শেখা। দাদা বলেছিল, উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করলে একটা ক্যামেরা কিনে দেবে। দিয়েওছিল। বিদেশ থেকে নিকন। সে কি আনন্দ বিদিশার। দাদা বড় শখের উপহার এনেছে। তা দিয়ে কত ছবি। বাবা, মা, ভাই বোন, দাদা, মেমসাহেব বৌদি, দ্বিতীয় হুগলি সেতু। এমনকি দুপুরবেলা ঘুমিয়ে থাকা কুত্তাটারও। হাত খরচ সব ফিল্মের প্রিন্টিং অ্যান্ড ডেভেলপিং-এ।

মা বলে "এত যে ছবি তুলিস, রাখব কোথায়? ঘরে যে আর জায়গা নেই"

কোথায় আবার? বিদিশার ঘরে। ঘর তো নয়, অ্যালবামের স্তূপ। বই আর অ্যালবাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ। কোণে কম্পিউটার। ঘরের মধ্যে হাঁটা ভার। এটাই ওর পৃথিবী।

মা বলত "এই যদি মেধাবী সৃষ্টিশীল মেয়ের থাকার ছিরি হয়, হলফ করে বলতে পারি কোনও ছেলে তোকে বিয়ে করবে না"

বিয়ে করুক চাই না করুক, বিদিশা বাঁচতে চেয়েছে তার মতো করে। ছিমছাম পটের বিবি নয়। তাসের দেশের মতো জীবনটাকে চেনা ছকের অঙ্কে সাজাতে চায়নি। বৈচিত্র্য নেই। মজাও নেই। মজা পাহাড়ি নদীর মতো এঁকেবেকে পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়ায়।

ক্লিক! পরপর বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল। সানরাইজ অ্যাট দ্য সাগর। ছবিগুলো ফোটোশপে এডিট করতে হবে। প্লে-ব্যাক করে দেখল, শটগুলো নেহাত খারাপ হয়নি। ক্যামেরা কাঁধে ফেলে পুবের রক্তিমে চেয়ে হারিয়ে গেছিল। হঠাৎই কানে এল উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণঃ

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্বাং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সুরেঃ

শৃনান্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তসহু

বেদাহমেতং পুরতষং মহামতম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরসতাৎ

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়

কে এত সুন্দর শ্লোক বলছে? ঘুরে তাকাতেই চোখাচোখি স্বপ্নিল চোখের ভদ্রলোকের সঙ্গে। যেন দেবদূত ধ্যানের ঘোরে বিভোর হয়ে মন্ত্র বলে চলেছে। বিদিশার চোখে চোখ পড়তেই ধ্যানভঙ্গ "বিদিশা মুখোপাধ্যায়?"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়"

গোটানো প্যান্টটা ঠিক করতে নিচু হতেই বিদিশার ক্যামেরায় ক্লিক।

অবাক দেবজিৎ দাঁড়িয়ে বলল "আমার ছবি তুললে কেন?"

"ইচ্ছে হল" দেবজিতের দিকে না তাকিয়ে জবাব। তাকিয়ে দূরে আবছায়া সিল্যুটের মতো জাহাজটার দিকে।

অদ্ভুত মেয়ে তো। ক্যামেরায় জাহাজটাকে জুম-ইন করছে ফ্রেমে।

দেবজিৎ বলল "বেশি জুম করলে ক্যামেরা শ্যেক হবে। পরে ফোটোশপে ফ্রেম করে নিও। কত মেগাপিক্সেল?"

"একুশ। আরও বেশি আছে। কেনার সামর্থ্য নেই" ওর কথামতো ক্লিক। একটা। ফের আরেকটা।

"ছবি তুলতে ভালো লাগে?"

"ভী... ষ... ণ। সেই জন্যই তো গঙ্গাসাগরে"

"শুনেছি তুমি মেডিক্যাল ক্যাম্পে এসেছ"

"ওখানেই উঠেছি"

"সব ইন্সট্রাকশন দিয়ে রেখেছিলাম। কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

বিদিশা তার ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বলল "কেন হবে? আপনি তো সব ঠিক করেই রেখেছেন। এসব ক্যাম্প করে দেশ-সেবা হয় না। প্রচার মাত্র"

"তো এলে কেন?"

"না এলে, চাকরি যাবে। তা ছাড়া, আগে কখনও গঙ্গাসাগরে আসিনি। দেখার ইচ্ছেও ছিল। ছবি তোলার অনেক কিছু পেয়ে গেলাম। বাড়তি বোনাস। দারুণ মন্ত্র পড়েন। আপনার সংস্কৃত শুনতে শুনতে অন্য পৃথিবীতে চলে গেছিলাম। আপনার বলার মধ্যে এমন মাদকতা যা আচ্ছন্ন করে রাখে"

"তুমি সংস্কৃত জান?"

"না। শিখিনি। ডাক্তারি করে, ওসব শেখার সময় কোথায়? শিখেই বা কী হবে?"

দেবজিতের বেশ মজা লাগছে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে। এরাই আজকের প্রজন্ম, আগামী। এদের কাছে এসব শ্লোক মূল্যহীন। এরা তো অ্যামেরিকান কালচার রপ্ত করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খোঁজে। এদের মূর্খামির জন্য 'আমাদের' বলে আর কিছু থাকবে না।

“কী করে কী হবে, তুমি জান?”

অবাক বিদিশা। শুনেছে নবান্নের দাপুটে অফিসার। আলাপ হওয়ার পর তেমন দাপুটে লাগছে না। আর পাঁচজনের মতোই। কোনও অহং নেই। তবে একটু অন্যরকম। ওর ধারণা ছিল না, আমলারা স্তোত্রপাঠ করতে পারে। পলিটিক্স নিয়েই বেশি ব্যস্ত। দেবজিৎ সবাই নয়। সে আলাদা।

বিদিশার বেশ মজা লাগল দেবজিতের কথাগুলো। কাজলকালো চোখ মেলে বলল “না জানি না। তবে জানার চেষ্টা করছি”

“মানে স্টেজ ওয়ান। চা খাবে?” দেবজিতের অঙ্গুলি হেলনে হৈ হৈ করে দুটো লোক ছুটে এল। এরা যে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বিদিশা লক্ষ্যই করেনি। এবার বোঝা যাচ্ছে দেবজিৎ রীতিমতো ডাকসাইটে আমলা। দূর থেকে ওকে পাহারা দিচ্ছিল।

ওদের বলল “চায়ের ব্যবস্থা কর”

ওরা চলে যেতেই বিদিশা জিজ্ঞেস করল “স্টেজ ওয়ান মানে কী?”

“ঈশ্বর সাধনার প্রথম ধাপ”

“ওসব ঈশ্বর-টিশ্বর বুঝি না। সাইন্সের ছাত্রী। জানার চেষ্টা করি। ব্যস। আপনাকে দেখে সাধুবাবা মনে হচ্ছে না। অথচ এসব কী বলছেন?”

“ঈশ্বর পেতে গেলে সাধু হতে কে বলেছে?”

“সাধুরা তো বলে”

“ওদের কথা বাদ দাও। তুমি কী বল?” মুচকি হেসে প্রশ্ন।

এই মেয়েটার সঙ্গে এত সময় নষ্ট করছে কেন? মন বলছে, ওর মধ্যে কিছু আছে। সেটা কী দেবজিৎ জানে না। বিদিশাও নিশ্চয়ই জানে না।

ঘাবড়ে গিয়ে বিদিশা বলল “ঠিক বুঝি না। বুঝতে চাই। সংসার ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে জপ করতে পারব না। তাই সে আশা ছেড়ে দিয়েছি”

“পাহাড়ে বসে জপ করলেই ঈশ্বর পেয়ে যাবে? কে বলেছে ওখানে ভগবান আছে?”

“কেউ বলেনি। তবে সবাই তো ওদিকেই যায়” কয়েক মিনিটে বিদিশাকে গুলিয়ে দিয়েছে। অসহায় লাগল। মনে করত খুব চালাক। সুন্দরী চালাক বলে অহংকারও ছিল। এক নিমেষে ধুলোয়। বিদিশা কথা

খুঁজছে। দেবজিৎ বুঝতে পেরেছে ওর সব গুলিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে ওর চিন্তা-ভাবনাকে দিশা দেখাতে হবে।

বিদিশাকে বলল “চল চা খাবে”

সার্কিট হাউস দেখে অবাক। যেন ফাইভ স্টার হোটেল। একগাদা চেলা-চামুণ্ডা চারপাশে বড় সাহেবের প্রয়োজনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বিদিশা বলল “আপনাদের কী মজা। আপনারাই রাজা। কত লোক। আমার মতো ডাক্তারদের কেউ পোঁছে না”

“কে বলল?”

“যা সত্যি, তাই বললাম। পান থেকে চুন খসলেই দল বেঁধে চড়াও”

“এই দু-দিনের রাজা সেজে কী হবে?”

বিদিশা আশ্চর্য “দু-দিনের রাজা-সাজা! কী বলছেন? এই তো জীবনের সার্থকতা। কত লোক আপনার জায়গায় পৌঁছনোর জন্যে মরে যাচ্ছে”

দেবজিৎ হেসে বলল “সেটা তাদের প্রবলেম। এটা রুজি-রোজগার মাত্র। তুমি ডাক্তারি কর, আমিও চাকরি করি। সংসার চালাতে হয়”

“আপনার সংসারে আর কে আছে?”

“বউ, মেয়ে। মা দু-বছর আগে মারা গেছেন। তোমার ক'টা বাচ্চা?”

“এ মা! বাচ্চা হবে কী করে? বিয়েই তো করিনি”

“কেন করনি? দেখে তো মনে হচ্ছে বিয়ের বয়স হয়েছে”

বিদিশা ঠোঁটে জিভটা আলতো করে বুলিয়ে বলল “তেমন পেলাম কই?”

“তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের মনের মতো পাত্রও জুটল না?” দেবজিৎ ঠাট্টা করল।

“না, জুটল না। তাই ফোটোগ্রাফি, গান এসব নিয়েই আছি। শুনে মনে হচ্ছে আপনি ভালো ছবি তোলেন”

“ওই আর কী”

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল বিদিশা “এ মা! দেরি হয়ে গেছে। চলি। ক্যাম্পে পৌঁছতে হবে। নইলে ঝাড়”

ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে দেবজিৎ বলল “রাতে এখানে আমার সঙ্গে খেও”

যেতে যেতে পেছন ফিরে বিদিশার জবাব “ভেজিটেরিয়ান পছন্দ করি না। ইলিশ মাছ খাওয়ালে আসব”

“বেশ তাই খাওয়াব” হাওয়ায় কথাটা ছুড়ে দিল।

কেন যে ওকে খেতে বলল জানে না। টিঙ্কুর চেয়ে বড়, রুমার থেকে ছোট। এরা মাঝের জেনারেশন। এদের বোঝবার কৌতূহল চাপতে পারেনি। মেয়েটার স্বাভাবিক চপলতায় আকৃষ্ট। মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা ওর অজানা। মেয়ে নিয়ে সময় নষ্টের লোক নয়। ওকে নিছক একটা মেয়ে বলে ভাবতে পারছে না। কেন নিজেও জানে না। কৌতূহল। জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যার কোনও কারণ নেই। চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও ঘটে। কোনও অজানা শক্তি বা উদ্দেশ্য, যা নিয়তিই জানে। তার খোঁজেই মানুষ বারবার ঝুঁকি নেয়। চলার গতি বাড়ে। গুলিয়ে যায় পাপ-পুণ্য। অজানার টানে ঝুঁকি না নিলে জীবন এগোত না। থেমে থাকত তাসের দেশের ঘোরাটোপে।

দেবজিতের সাগরমেলার দায়িত্ব নেওয়ার কথা নয়। অনেক আমলা রয়েছে। কথায় আছে, যে বছরে গঙ্গোত্রী দর্শন সে বছর গঙ্গাসাগর হলে সম্পূর্ণ পুণ্য লাভ হয়। এ বছরে, গঙ্গোত্রী যাবার পর থেকেই ওর মাথায় সাগরমেলা। পুণ্যের আশায় কী না, জানে না। সাইকেলটা কমপ্লিট না করলে তীর্থ অধরা থেকে যাবে। তাই আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব নেওয়া। রুমা এলে ভালো হত। পরীক্ষার খাতা দেখার অনেক কাজ বলেই দেবজিৎ একা।

সূর্য মোহনা ছুঁয়ে বেশ অনেকখানি উঠে এসেছে। তবুও গঙ্গার জোলো বাতাসে বেশ ঠান্ডা লাগছে। বিদিশা যাওয়ার পর থেকেই ঠান্ডা আমেজটুকু উপভোগ করছিল। বেয়ারেকে বলল “আরেক কাপ চা খাওয়াবে?”

চুমুক দিয়ে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে। শীতের ভোরে, মিঠে আমেজে নিজেকে খুঁজে পাওয়া।

অস্তগামী সূর্য পশ্চিমে পূরবীর সুর তুলছে। বেয়ারা এসে বলল “সকালের দিদিমনি এসেছেন”

“নিয়ে এস”

বিদিশা ওর উল্টোদিকে সোফায় “কনটিনিউয়াসলি পেশেন্ট দেখে গেছি। জানি না এই একদিনে কার কী উপকার হবে। কর্তব্য করে দিলাম, ব্যস্”

“যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও, করিয়া সন্ধান”

“আপনি বুঝি রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেন?”

“যা সত্য সুন্দর, তাই ভালোবাসি” পেঁয়াজিতে কামড় দিয়ে বলল “খেয়ে নাও। তোমার জন্য বানিয়েছে”

দূরে মার্কারির আলো ঝলমল। ভেসে আসছে মানুষের কোলাহল। যেন এক মহাযজ্ঞ। জীবনের ঝংকার, ব্যবসার শোরগোল। মানুষ চেনার মহামেলা। দেওয়া-নেওয়ার মিলনোৎসব। তাড়াহুড়োয় চাদর আনতে ভুলে

গেছে বিদিশা। শীত-শীত করছে। গরম চা-ই উত্তাপ। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে তাকিয়ে গান ধরল হীমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে, হেমন্তিকা।

দেবজিৎ আবাক বিস্ময়ে শুনছে। মিষ্টি গলা। শেখা, অ্যামেচার নয়। মন ছুঁয়ে যায়। গান শেষ হতেই বলল "বড্ড মিষ্টি গলা। কোথায় শিখেছ?"

"এক সময় দক্ষিণীতে শিখতাম। এখন চর্চা নেই"

সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী শুধু নয়, গুণবতীও বটে। ছবি তুলতে ভালোবাসে। ভালো গলা। রবীন্দ্রসংগীতে দক্ষিণী থেকে ডিপ্লোমা। প্লাস্টিক সার্জেন যখন পড়াশোনায় নিশ্চয়ই ভালো। আর কী গুণ আছে? জানবার আগ্রহ। এই মেয়েটার ওপর ইশ্বরের অশেষ করুণা। এত গুণের অধিকারী, মাইট বি মাস্টার অফ নান - তাই কনফিউজড্। অথচ জানার আগ্রহ। এবার বুঝতে পারছে কেন মনে দাগ কেটেছে। সাধারণ নয়। অনন্যা। যার মাথায় জাদুকাঠি ঘোরালে আগামীর বীজ পুঁততে পারবে। ওর নশ্বর দেহ বিলীন হলেও জীবন-দর্শনের স্বাক্ষর এই মেয়েটাই আগামীর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। আগামীকে শোনাতে পারবে যা শাশ্বত, অবিনশ্বর।

বিদিশা আনমনা "ইলিশ মাছ খাওয়াবেন বলেছিলেন। তাই এলাম"

"ইলিশের কথা এখনও ভোলোনি দেখছি"

ডাক্তারি ছাড়া আর কী কী করতে পারে জানার কৌতূহল। এ প্রজন্মের মধ্যেও ব্যতিক্রম। যেমন দেবজিৎ।

"গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে যোগাযোগ করবে না?"

"আপনি চাইলে, নিশ্চয়ই করব। কোথায়?"

কার্ডটা দিয়ে বলল "তোমার ঠিকানা ফোন নম্বর বল। মোবাইলে সেভ করে নিচ্ছি" বিদিশাও নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিল।

"তুমি বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলিতে থাক?"

"হ্যাঁ। মা-বাবার সঙ্গে। ঠিকানা, ফোন নম্বর নিলেন। পরে তো চিনতেও পারবেন না। আপনারা এত বড় মানুষ"

কোনও জাবাব দিল না। স্তাবকতার জবাব নিষ্প্রয়োজন।

বিদিশার মনে হল দেবজিৎ বোধহয় ওর প্রেমে পড়েছে। অনুরূপদা, অরণি, অনির্বাণ - এরা সবাই পড়েছে, দেবজিৎই বা নয় কেন? এদের দুঃখ দিয়েও শান্তি পায়নি। এরা সাধারণ বলেই কী? দেবজিৎ ওদের থেকে অনেক ওপরে।

কত? বিদিশা দেখতে চায়। ওর দৌড় কত দূর।

ছাব্বিশ

ফোনে দারুওয়ালার গলা শুনে আশ্চর্য। এই সময় দারুওয়ালা। এই ক'মাসে প্রচুর কন্ট্র্যাক্ট ক্যানসেল করে দিয়েছে সীমা। বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে প্লে-ব্যাক। কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই। লেক প্লেসের বিশাল বাড়িতে একা, উদ্দেশ্যহীন। কিছুই ভালো লাগছে না। অভিষেক সরকারের বিশাল বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। সেখানে যে কোনও প্রাণী আছে, ফোন না করলে বোঝার উপায় নেই। ফোনে উত্তর দেয় ঠিক-ই, ব্যাস ওটুকুই। উত্তর 'না' বা 'এবার ছেড়ে দিন'। প্রায়শই দেবজিৎ বা রুমা ঘুরে যায়। মাঝে-মধ্যে রান্না করা খাবার টিফিন কেরিয়ারে নিয়ে আসে। রুমা এলে, ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন। প্রফেশনাল দুনিয়ায় মনের কথা বলা যায় না। রুমা বা দেবজিৎদাই মনের সঙ্গী। যেন বাঁচার জন্যই বেঁচে থাকা। ভবিষ্যতের প্ল্যান, ইচ্ছে কোনওটাই নেই।

দেবজিৎ ওকে স্বাভাবিকতায় ফেরাতে চায়। ওর জীবন সংগীত। ওর মধ্যেই শান্তি, তৃপ্তি, পূর্ণতা, আগামীর পাথেয়। তার মুম্বাইয়ের এজেন্ট পালন দারুওয়ালার ফোনে আশ্চর্য।

"শুনা জয়ন্তকা বুরি খবর। বাচ্চা নেহি হ্যায়। জিয়েঙ্গে ক্যায়েসে?"

"মালুম নেহি"

"কমানে পড়েগা। ঘর মে বৈঠ কর তো থক জায়েগে। মুম্বাই চলা আইয়ে"

"দিল নেহি চহতা"

"কলকাত্তা সে নেহি নিকল নে সে ভুল নেহি সাকেগা"

"ইধর বাত করনেকা দো-চার আদমি হ্যায়। উধর একদম আকেলা"

"কাম মে ডুব রহেনা। এনি এন্টারটেনমেন্টকা মালিক বাঙ্গাল কা অজিতেশ নন্দী এক নয়া পিকচর কর রহা হ্যায়। নয়া প্লে-ব্যাক সিঙ্গারকো লঞ্চ করনে চাহতা। আপকা নাম ইয়াদ আয়া"

"হিরোইন কওন?"

"বঙ্গাল কা অনসূয়া বাসু। হিরোইন বঙ্গাল কা, প্রোডাকশন বাঙ্গাল কা, তো প্লে-ব্যাক বঙ্গাল কা কিউ নেহি?"

হিসেব করেই ফোন। জাতে পারসি। জাত ব্যবসাদার। কোলাবাতে ফ্ল্যাট। অফার নিয়েই ফোন। পছন্দ হলে বড় ব্রেক। এই ক'মাসে জীবনের ওপর ঝড় বয়ে গেছে। বাবা, জয়ন্ত চলে গেছে। এই অফার মানে এটাই তার ভবিষ্যৎ। দেবজিৎদা বারবারই বলে গানে ডুবে থাকতে। জয়ন্ত যখন নেই, কলকাতায় থেকে লাভ কী? মুম্বাইতে কাজের মধ্যে ডুবতে পারলে ভুলে থাকতে পারবে। মুম্বাইতে কাজ, টাকা দুটোই।

ভবিষ্যৎও। জিততে গেলে মুম্বাই পাড়ি। এর আগে কতবার মুম্বাইতে চেষ্টা করেছে। ছোটমোট সিরিয়াল, মিউজিক ভিডিও ছাড়া বিশেষ কিছুই জোটেনি। লেগে থাকলে, মানে পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়লে হয়ত আরও কিছু জুটত। কলকাতায় বাবা আর জয়ন্তকে একা ফেলে ওখানে কেরিয়ার করতে চায়নি।

পালনকে বলল "জরুর। কব জানা?"

"নেক্সট উইক আ সকেঙ্গে?"

"হাঁ। উধর রহনে কা বন্দোবস্ত?"

"দো-চারদিন হামারে ইহা ঠহরিয়ে। উনহে গানা পসন্দ হোনে সে উনলোক হি বন্দোবস্ত কর দেগা। উন লোগকা বহত ফ্ল্যাট হ্যায়"

"অ্যারেঞ্জ করকে ফোন করুঙ্গা" ফোন রেখে দিল।

বুঝতে পারেনি ঝট্ করে ডিসিশন নিয়ে ফেলবে। ওপরওয়ালার দান ঠুকরালে ভুল করবে। আগে হয়নি। এবার না চাইতেই অফার। সময়টাই আসল। না এলে কিচ্ছু হয় না। এলে চেষ্টা-চরিত্র নিষ্প্রয়োজন। কোথাও হারের খেলা, কোথাও বা জিত। এই হারজিতের খেলায় সে নিছক পুতুল।

দেবজিৎদাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল "এই খেলায় থেকেও তুমি কী করে নেই?"

"কে বলল? আমিও তোমার মতোই খেলছি"

"মনে তো হয় না। এত নির্বিকার ভাবে?"

"ছোটবেলার অভ্যাস। আমার শান্তি দাঁওতে চড়াতে চাই না"

কথাটা বোঝেনি। শুধু বুঝেছে, দেবজিৎদার পক্ষে যেটা সম্ভব তার পক্ষে নয়।তাই হেরেও আবার জেতার খেলা। জয়ন্ত, অভিষেক সরকারকে হারিয়ে আবার মুম্বাইয়ে দাঁড়াবার অদম্য বাসনা। যা, আর পাঁচজনের মতো তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। খেলতে খেলতে কখন শেষ হয়ে যায়, বুঝতেও পারে না। যখন পারে, মনে হয় নতুন করে খেলার বাইরে জীবন শেষ। ফেরার পথ নেই। যারা বুঝতে পারে সবাই মহাপুরুষ নয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য সেবকও নয়। সাধারণ মানুষ। যারা নতুনভাবে জীবনকে দেখতে চায়। যেমন দেবজিৎদা। কিন্তু ও বাসনা ছেড়ে বাঁচবে কী নিয়ে? তাকে যে বাসনার, চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কের লক্ষ্মণরেখার মধ্যে জীবন গড়ে নিতে হবে।

সন্ধেবেলা ফোন দেবজিৎদাকে "মুম্বাই যাচ্ছি। নতুন সিনেমার কনট্র্যাক্টের অফার"

"কলকাতা ছেড়ে?"

"না, বাড়িটা থাকবে। যদ্দিন কাজ ওখানেই থাকব। ঠিক করছি?"

"তোমার মন কী বলে?"

"এখানে আর ভালো লাগছে না। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। ভ্যারাইটি চাই। নতুন মুখ। নতুন পরিবেশ। কিছু তো করি। বাবা, জয়ন্ত না থাকায় এখানে একা লড়তে পারব না"

"ওখানে?"

"জানি না। চেষ্টা করে দেখি। কিছু হওয়ার না থাকলে ঘর বয়ে সুযোগ আসে না"

"যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে লও

শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে

আমার সোনার ধান কূলেতে এসে"

কথায় রবীন্দ্রনাথ, অন্তরে রামকৃষ্ণ, বাইরে উইনস্টন চার্চিল। পুব-পশ্চিমের এক অপূর্ব যুগলবন্দি। আজকের বাঙালি নিজেদের ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে অন্যকে নকল করে জাতে ওঠার চেষ্টা করে। সে তো দেবজিৎদা হতে পারবে না। তাই বাঁচার নেশায় নতুন পথের সন্ধানে ছুটবে।

হেসে বলল "এ মাটি, সোনার দান, অবহেলা করি কী করে? কিন্তু যাব যে, কী স্বপ্ন নিয়ে?"

"স্বপ্ন নিয়ে যাওয়া বোকামি। কেবল স্বচ্ছতাই কাফি। ওখানেই শান্তি"

দেবজিৎদা ঠিক বলছে। সবাই তো সব ছেড়ে বাঁচতে পারে না। সীমাও পারবে না। তাকে বাঁচতে হবে নিজের স্বচ্ছতায়।

মুম্বাই এয়ারপোর্টে পালন দারুওয়ালা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে উঠে বলল "কাল অজিতেশ নন্দীকে সাথ অ্যাপয়েন্টমেন্ট"

স্যান্টা ক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে কোলাবার কাফে প্যারেড বেশ দূর। মুম্বাইয়ের জনবহুল রাস্তা পার হতে ঘণ্টাখানেকের ওপর।

"মিউজিক ডিরেক্টর কওন?"

"নীতিন মালিক। উও ভি কাল রহেগে"

"উসমে কুছ দম হ্যায়। উসকে সাথ বহত দিন পহলে মুলাকাত হুয়া থা। তভি ইতনা নাম নেহি কামায়া। সায়দ উসে ইয়াদ নেহি"

"ও আপকা নাম জানতা। বোল রহা থা, যব ছোটা থা উসকে পিতাজি আপকে শ্বশুরজিকে পাশ কাম শিখা। তব আপকা ঘর ভি গয়া থা। কুছ কলকত্তে কে ইয়াদে"

"ফির চান্স মিলনে কা পসিবিলিটি হ্যায়?"

“ফির নেহি তো কেয়া? আপকো অ্যায়েসে কলকাত্তা সে বুলায়া? দম লগা কর কাম কিজিয়ে। অব কলকাত্তা মে কুছ নেহি রহা। আপকো ইয়াহি জিনা হ্যায়। লগ যায়ে তো হামারে কমিশন”

ব্যবসায় ষোলো আনা। তবে ওকে ভালো লাগে। কোনও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। সোজা-সাপটা কথা। কলকাতা থেকে অনেক আলাদা। ওখানকার মতো ফোকটে উসুল করা নয়। অনেক প্রফেশনাল। এই ব্যবসাদারির মধ্যে আদিখ্যেতা নেই। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ারল্ড।

রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে বলল “দিন কে দিন, আউর ট্র্যাফিক জ্যাদা হো রাহা”

“রোজ নই নই মাল্টিস্টরিড। সব ফ্ল্যাটকা গাড়ি ইয়ে রাস্তা মে। রাস্তে তো ওহি”

অজিতেশ নন্দীকে না চিনলেও টাক মাথা ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি বেঁটে-খাটো মোটা লোকটাকে বহুবার টিভিতে দেখেছে। শুনেছে করিতর্কমা লোক। কলকাতার কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে প্রথমে ইংরেজি মাসিকে জার্নালিস্ট। সেই সুবাদে মুম্বাইতে ট্র্যান্সফার। তারপর, কী করে যেন প্রোডাকশন লাইনে। এনি এন্টারটেনমেন্টের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার। সফল প্রোডাকশন হাউস হিসেবে পরিচিত। এখন ব্যবসা একা দেখে না। পাঁচ-পাঁচটা বউয়ের উত্তরসূরির সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

স্পষ্ট বাংলায় বলল “পালন আপনার কথা বলছিল। আপনার গান শুনেছি। এই গানে নীতিন সুর দিয়েছে। ক্লাসিক্যালের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন কম্বিনেশন। আপনার সাধা ভরাট গলা। মনে হল আপনিই পারবেন” নীতিন মালিকের দিকে তকিয়ে বলল “কেঁও নীতিন, নেহি সকেগা? ট্রাই কর লেনা”

“জরুর” মাথা নাড়ল নীতিন।

পাশের ঘরে দু-ঘণ্টা ধরে নানা সুরে টুকরো গাওয়াল। পালন, অজিতেশ নন্দীর সঙ্গে কথা বলছিল। শেষে ওদের সঙ্গে জয়েন করে নীতিন বলল “চলেগা। দৌড়েগা। বাত কর লিজিয়ে। ম্যায় চলু”

নীতিনের যাওয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে টাকে হাত বুলিয়ে বলল “কোথায় উঠেছেন?”

“আপাতত দারুওয়ালার কোলাবার ফ্ল্যাটে”

“থাকবেন কোথায়?”

“জানি না। আপনি যেখানে বলবেন”

“লোখান্ডওয়ালাতে আমাদের প্রোডাকশনের একটা ফ্ল্যাট আছে। ওখানেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি” মাথা নাড়ল সীমা। “আমাদের নতুন আর্টিস্টদের নেওয়ার প্রোটোকল আছে। এই ছবির জন্য দশ লাখ দেব। প্লাস গানের সেলের ওপর একটা পার্সেন্টেজ। ক্যাশ অফিস থেকে এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে যান। বাকিটা কনট্র্যাক্ট সইয়ের পরে”

অজিতেশ নন্দীর অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হল, হয়ত এ পথেই লেখা তার আগামী। আর যখন কিছু পড়ে নেই, যেখানে ভাগ্য নিয়ে যায়। সেদিনই কোলাবা থেকে লোখন্ডওয়ালা। আগে যখন এসেছে জায়গাটা ফাঁকা ছিল। জনি ওয়াকার, হেমলতাদের বাড়ির চারপাশে সবুজ মাঠ। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারত মুম্বাইয়ের অট্টালিকার সমারোহে। এখন সেই মুক্ত বাতাস হারিয়ে গেছে। জুহু বিচের মতো জবড়জং দোকানের মেলা - খাবার, শাড়ির দোকান রাস্তায় উপচে পড়ছে। সভ্যতার কংক্রিট কাঠামো মুক্ত আকাশটাকে গ্রাস করেছে। ছোট কুঠরির মধ্যে যখন হাঁপিয়ে ওঠে, মন ভেসে বেড়াতে চায়। বিকেলে সেভেন বাংলোসের দিকে হেঁটে আসবে। ব্যানড্রা রিক্লেমেশনে দূর সম্পর্কের এক পিসিমা থাকেন। ব্যবসার দৌলতে বড়লোক। সঙ্গে অহেতুক অহং। সীমার ভালো লাগে না। বিশেষ করে এই মনের অবস্থায় এসব লৌকিকতা অসহ্য।

ফ্ল্যাটটা ছিমছাম। গ্যাস ওভেন, ফ্রিজ, টিভি, রান্নার সরঞ্জাম। চা, বিস্কুট, কনডেনসড্ মিল্ক, চানাচুর কিনল। রান্নার করতে ইচ্ছে নেই। পাও-ভাজি খেয়ে নেবে। জীবনটা ফাঁকা হয়ে গেছে। হয়ত আগেই ছিল। বুঝতে পারেনি। বিয়ের আগে সাধনার পৃথিবীতে ডুবে ছিল। তখন বাবা-মা ছিল। একাকিত্ব বোঝার অতটা সুযোগ হয়নি। বিয়ের পরে জয়ন্ত, রেকর্ডিং, প্রোগ্রাম। শ্বশুরের সঙ্গে গল্প করে স্মৃতি রোমন্থনে দিব্যি সময় কেটে যেত। ঘরের কাজ তো ছিলই।

ওদের যাওয়ার পর থেকেই শূন্যতাটা প্রকট।

আশা নেই, তবু কাজ করা।

বাঁচার কোনও রসদ নেই, তবুও বাঁচা।

এগবার প্রেরণা নেই, তবুও চেষ্টা।

জেতা-হারার খেল। কার জন্যে জেতা? কার জন্যেই বা হারা?

কনট্র্যাক্ট সই হওয়ার পর সময় কম। সারাদিন রির্হাসাল। একটা গান তিরিশবার গাওয়া। নীতিন জানে, ছবি যতটা না তার চিত্রায়ণের জন্য প্রফিট করবে, গান হিট করলে প্রফিট অনেক বেশি। সীমা বোঝে - নাউ অর নেভার।

দেবজিৎদা ফোন করেছিল "কেমন লাগছে মুম্বাই?"

"রিহার্সাল নিয়ে এত ব্যস্ত সময় পাচ্ছি না"

"নেক্সট উইকে মিটিং আছে। মুম্বাই যেতে পারি। সময় পেলে ফোন করে দেখা করব"

"আমার ফ্ল্যাটেই থাকবেন"

“ওখানে থাকা হবে না। ইকনমিক গ্রোথের ওপর সেমিনারে আমার লেকচার। হলিডে-ইনে থাকব। তোমার ওখান থেকে বেশি দূর নয়। দেখা করে আসব”

কথা রেখেছিল। এসেছিল। সান অ্যান্ড স্যান্ডসে বড় বড় লবস্টার খাইয়েছিল “এখন শান্তি”

“শান্তি-অশান্তি বুঝি না। কাজের মধ্যে ডুবে আছি”

“তুমি তো হার্মান হেসের সিদ্ধার্থর কথাই বলছ। কাজেই শান্তি। শুধু চাওয়াটাকে বাদ দিলে দেখবে বাকিটা স্বচ্ছ”

“সেটা তো ন্যাচারাল কোর্সে বাদ হয়ে গেছে”

“সৌভাগ্য বল আর দুর্ভাগ্য, এটাই তোমার আসল পাওয়া। আওয়ার সুইটেস্ট সঙ্গস্ আর দোস, দ্যাট টেল অফ আওয়ার স্যডেস্ট থটস্”

মুখে শুকনো হাসি। বুঝতে পারছে, যা বলছে সেটা ঠিক। চোরাবালিতে না তলিয়ে এর মধ্যেই নবজীবনের আশ্বাস। এই পাওয়াটাই সব থেকে বড়। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবের অঙ্কের বাইরে, সমাজ-সংস্কারের অবগুণ্ঠন ফেলে মুক্ত আকাশে ভাসার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

'শাদি কে সাতরঙ্গ' ছবি হিট করল কি না, সেটা অজিতেশ নন্দী, নীতিন মালিক, অনসূয়া বসুর ভাবনা। সীমার নয়। নিজেকে কিছুর মধ্যে ডুবিয়ে রাখাতেই শান্তি, পরিতৃপ্তি।

দেবজিৎদা বলল “চাওয়াটা ছেড়ে দিলেই তো পাওয়াটা এসে ধরা দেবে”

ওর মনে হল, আমলা কথা বলছে না। এ যেন মানুষবেশী সাধু। যুগ-যুগান্তরের মুনি-ঋষিদের বাণী এক কথায় বলে দিল দেবজিৎদা।

সাতাশ

অরণির সব কিছুতেই সন্দেহ। নইলে ব্রিফকেস নিয়ে বাথরুমে কেন? সায়ন্তনি আর নিতে পারছে না। শুধু সায়ন্তনিকে সন্দেহ এমন নয়। সবেতেই। ওর ব্রিফকেস থেকে কিছু নেবে বুঝতে পারে না সায়ন্তনি। সর্বত্র বগলদাবা।

রোজই জিজ্ঞেস করবে "আজ কার সঙ্গে শুলে?"

"অন্য কারও সঙ্গে শুতে যাব কেন?" বুঝতে পারে না হঠাৎ কেন এ পরিবর্তন।

"কেউ আসেনি, আমায় বিশ্বাস করতে হবে?"

"কোনও দিনও এ বাড়িতে অন্য কারও সঙ্গে শুয়েছি? দেখেছ কখনও?" ঝাঁঝিয়ে উঠল।

অরণি চুপ। আশা করেনি জবাব দেবে। এই আচরণে চিন্তা দ্বিগুণ। এ ক'মাসে সিম যে কতবার পাল্টেছে ইয়ত্তা নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে "ব্যাঙ্কের উটকো ফোন কল নিতে পারছি না"

ওটা উপলক্ষ মাত্র। ব্যাঙ্কগুলো সবাইকেই জ্বালায়। তা বলে কী সবাই ফোন নম্বর পালটায়? শেষমেশ বাবাকে না বলে থাকতে পারেনি। বাবার পরামর্শে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ অমিতাভ রামকে দেখিয়েছিল। সে আরেক সমস্যা। ও হাসপাতালে যাবে না। শেষে দূর সম্পর্কের ভাই বলে ডাঃ রামকে বাড়িতে ডেকে এনেছে। ডাঃ রাম বাড়িতেই চায়ে চুমুক দিয়ে অরণির সঙ্গে গল্প করেছে। বই থেকে আইটি সেক্টর। সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, এমন নয়।

ডাঃ রাম চকচকে টাকে, ফ্রেঞ্চকাট কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছে "সিজো-অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার"

গালভরা নাম। সায়ন্তনি বোঝেনি। বাবার প্রশ্নে বলেছে "অতশত বুঝি না। মাথার গন্ডগোল"

মেয়ের অসহায়তা দেখে বাবার সান্ত্বনা "চিন্তা করিস না। একটা ব্যবস্থা করব"

অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতে পারেনি। সময় হয়েছে স্বনির্ভর হয়ে কিছু করার। অশোক ট্যান্ডনের প্রোপজালটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অরণি বাড়িতে থাকলে সম্ভব নয়। হাসপাতালে ভর্তি করলে ভালো হত। কিন্তু ডাঃ রাম বাড়িতেই চিকিৎসা করতে বলেছে। ভেবে দেখল, সেটাই ঠিক। ভর্তি করলে, চাকরি যেতে পারে। তাই এভাবেই বাড়িতে ওষুধ দিয়ে নিরাময়। মাইনেটা তো ঘরে আসবে। দেখাশোনার জন্য একটা ফুল-টাইম নার্সও রেখে দিয়েছে। সামাজিক দিক দিয়েও বিচ্ছিন্ন। নিজের মনে কী যে বকে। বাবা এলেও কথা বলতে চায় না। ওষুধ দিলে মুখে পুরে রাখে। নার্স খাওয়াবার চেষ্টা করলে জলের সঙ্গে কুলকুচি করে

ফেলে দেয়। আচ্ছা বিড়ম্বনা। ক্রেডিট কার্ড বিল শোধ করতে গিয়ে সায়ন্তনি ক্লান্ত। রোজকার বিল মেটাতেই শেষ। যথেচ্ছভাবে টাকা উড়িয়েছে। মা চিন্তিত নয়। বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব খালাস। মেয়ের ব্যাপারে জড়াতে চায় না। বাবা অত সহজে হাত ধুয়ে ফেলতে পারেনি।

"কী করবি কিছু ভাবলি?"

"কিছু তো করতে হবে। ঘর করা অসম্ভব"

"চাকরি করবি?"

"নাঃ। কথা হয়ে গেছে। আর্ট এক্সিবিশনের জন্য ভাড়া দেব। অরণি থাকলে সম্ভব নয়"

"হাসপাতালে ভর্তি করলে চাকরি চলে যাবে"

"শেষ পর্যন্ত এমিনিতেই যাবে। যা রোজগার করেছে উল্টোপাল্টা শেয়ারে ইনভেস্ট করে উড়িয়েছে। এখন কত ক্রেডিট কার্ডের বিল শোধ বাকি। কোনও সাইকিয়াট্রিক হসপিসে রেখে আসি। কী ঝামেলায় ফেললে না। তখনই বলেছিলাম বিয়ে দিও না। আমাদের স্ট্যাটাসের সঙ্গে খাপ খায় না। শুনলে না"

"পড়াশোনায় ভালো। অভাবি ঘরের মেধাবী ছেলে। ভেবেছিলাম উন্নতি করবে"

"তোমরা শুধু চাকরির উন্নতিই দেখ। আমার ভালো লাগা, মানসিক সিমিলারিটি বিচার কর না"

"সে যুগে তো এভাবেই বিয়ে হত। মায়ের মতো চেহারা। বয়স পার হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেবন্ধু নিয়ে লটঘট। ভালো পাত্র পাওয়া সহজ?" বাবা কঠোর।

দমে গেল সায়ন্তনি। বাবা চোখে আঙুল দিয়ে জায়গায় বসিয়ে দেবে, ভাবতে পারেনি। যাই হোক না কেন - কে ঠিক, কে ভুল, কে ভালো, কে মন্দ, পরের কথা। বিয়েটা যে ঠিক হয়নি, এটা সত্যি।

"পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও বিয়েটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। তুমি ভালোই জানো। আর যে পেরে উঠছি না"

মেয়ের কাতর মিনতিতে বাবা নরম। সত্যিই তো, ও কী পেয়েছে? সাজানো ফ্ল্যাট। ব্যস! তা দিয়ে কী মন ভরে? সাধ-আহ্লাদ থাকতেই পারে। ও কী নিয়ে বাঁচবে?

"ডিভোর্স চাইলে মেন্টাল ইলনেসের গ্রাউন্ডসে পেয়ে যাবি। আবার বিয়ে করবি?"

"না বাপি। সেরকম কাউকে মনে ধরেনি। একা, নিজের মতো কাটাতে চাই"

"রোজগার?"

"অরণি না থাকলে, আর্ট এক্সিবিশনের জন্য ভাড়া দেব। তা ছাড়া সিনসিয়ারলি চেষ্টা করলে, কিছু রোজগারের উপায় বেরিয়ে যাবে। কন্ট্যাক্টসের অভাব নেই। খালি তুমি ওর বন্দোবস্ত কর। শুনেছি বেহালায় লং টার্ম কেয়ার হসপিট্যাল আছে। খোঁজ নেবে?"

“নিতেই হবে। এছাড়া আর উপায় কী। সিওর আবার বিয়ে করতে চাস না?”

“না” সায়ন্তনি দৃঢ়।

বলতে পারল না, পুরুষ মানুষে আগ্রহ নেই। কেন যে হঠাৎ চলে গেছে বুঝতে পারে না। স্বপ্নের পুরুষকে না পাওয়ার জন্যই নিস্পৃহতা?

প্রত্যেক মেয়েরেই বাসনা থাকে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে গাটছাড়া বাঁধার। সায়ন্তনিরও ছিল। যৌবনের দাপটে আশা করেছিল জিতে নিতে পারবে স্বপ্নের মানুষকে। পারেনি, যা পেল মন ভরেনি। তাই বাইরের পুরুষের হাত ধরে নতুনের আস্বাদ। সেখানেও একটাই খেলা। যৌবনের চাহিদার বাহক।

লিঙ্গ আছে, পৌরুষ নেই।

যৌবন আছে, তাকে ধরার ক্ষমতা নেই।

দেহ থাকলেও, মন কোথায় কে জানে?

এদের সঙ্গে দিঘার নিভৃত ঘরে সহবাস করা যায়। জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে ভোগ করা যায়। কিন্তু এদের হাত ধরে আগামীর স্বপ্ন দেখা যায় না। নিজেকে সঁপে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়া যায় না। যার হাত ধরা যেত, তার তো লিঙ্গই নেই। পুরুষ নারীর তফাতটা তাহলে কোথায়? তবে বাঁধা পড়ে থেকে কী লাভ? দেহ চাই, দেহ আছে। পুরুষ কিংবা নারীর। সম্পর্ককে সাংসারিক বর্মে বন্দি করে লাভ কী? তার থেকে, উন্মুক্ত আকাশে ওড়া অনেক শ্রেয়।

বাবার প্রশ্নের জের টেনে বলল “কী লাভ সম্পর্কে জড়িয়ে?”

“তোর যা ইচ্ছে। বয়স হচ্ছে তো। এখন বুঝতে পারি, কারও ওপর ডিপেন্ডেন্স্ লাগে। তোরও লাগবে। তখন যদি কাউকে না পাস...”

“তখনের কথা, তখন”

“তুমি অরণির বন্দোবস্ত কর। আর নিতে পারছি না”

“খোঁজ নিয়ে দেখি। ডাঃ রামকে জিজ্ঞেস করিস ফোন নম্বরটা জানেন কি না?” মাথা নাড়ল সায়ন্তনি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাবা বলল “বন্ধন না থাকলে বাঁচার রসদ পাবি না”

“কোনও বন্ধন থাকে? আগে তো বিয়ে করেছিলে। টিকল? সাত পাক কি বন্ধনের লেজিটিমেসি?”

অস্বীকার করতে পারে না। সত্যি তো, কীসের সম্পর্ক? এত বছরেও অরণির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হল না। আবার বিয়েতে কোথায় দাঁড়াবে, কে জানে? তার থেকে ও ভবিষ্যৎ গড়ুক। যেখানে ভাগ্য নিয়ে যায়...

চায়ের কাপটা টেবলে নামিয়ে বলল “দেখি কিছু করতে পারি কি না”

মেয়ে তার জীবনের যথেচ্ছাচারের জবাব দিচ্ছে নিজের জীবন দিয়ে। মেয়ের মধ্যে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিচ্ছবি। চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। নতুন করে লিখলে 'দ্য রুট অফ ইওর ডিজাসটার লায়েস অ্যাট দ্য ক্রেভিসেস অফ ইওর হোম'। যা দেখেছে, শিখেছে, যে বাতাবরণে বড় হয়েছে, সেটাই তো মেয়ের কাছে জীবনের পাথেয়। সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তো এগিয়ে যাবে।

ওর হতাশা থাপ্পড় মারছে। সুস্থ স্বাভাবিক ঘর দিতে পারলে হয়ত আবার বাঁধার ইচ্ছে হত। নিজে ঘর ভেঙে, আবার গড়তে চেয়েছে। এই ভাঙা-গড়ার খেলায় কী পেয়েছে? জানে না। ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েকে ভুল মন্ত্র শিখিয়েছে। এখন সেই মন্ত্র তার মজ্জায়, কিছুই করার নেই।

শুধু ওর সঙ্গে তাল মেলানো ছাড়া।

আঠাশ

সায়ন্তনি একটা আশ্রয় খুঁজছিল। অরণিকে বেহালার লং-টার্ম কেয়ার হসপিট্যালে ভর্তির পর নিঃসঙ্গ, একা। লোকটার সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বুঝতেও পারেনি কোথায় যেন তার উপস্থিতি জায়গা করে নিয়েছিল। সামাজিক সংস্কার, বন্ধনগুলো মনের অবচেতনে দানা বেঁধে আছে। অন্তরে রেখাপাত করে যায়। অবচেতনে প্লাস্টিকের ঠোঙার মতো ভাসে।

ঐত্রিলাও এরইরকম একাকী অসহায়। অভয় সেন যাওয়ার পর থেকে একা হাঁপিয়ে উঠেছিল। বয়ফ্রেন্ড নিয়ে চড়ে বেড়ানোর মেয়ে নয়। মনে কাউকে না ধরলে, তাকে নিয়ে ঘোরার কথা ভাবতেই পারে না। সায়ন্তনিকে অনেকদিন ফোন করেনি। মোবাইলে ধরল "বাড়ি আছেন? ভাবছিলাম আপনার ওখানে আড্ডা মেরে আসি। কর্তা কিছু মনে করবেন না তো?"

"সে গুড়ে বালি। ও নেই। চলে আসুন। দুপুরে খেয়ে যাবেন। আমারই দোষ। ফোন করা হয়নি। ঝামেলায় ছিলাম"

"কোথাও বেরচ্ছিলেন না তো?"

"নাঃ। টিভি দেখছিলাম। চলে আসুন। এলে ভালো লাগবে"

ফোন কাটতেই বিষণ্ণতায় একটু বা আলোর ঝলক। তবু কেউ আছে খোঁজ নেওয়ার। রনিত, সুলগ্না সবাই সরে গেছে। কাছে ছিল কী? টাইম পাস। স্থূল মেকি মায়াজাল থেকে মুক্তি।

রনিত প্রতিদিনই বৈচিত্র্য খুঁজছে। বেশিদিন কারও সঙ্গে আটকাবে না। একঘেয়ে হয়ে গেছে গান, পার্টি, মেয়ে তোলা, চুম্বন, স্তন, সম্ভোগ। চেহারা আলাদা, মানুষও আলাদা। কিন্তু ও কী মানুষ দেখতে উৎসুক? ওর কাছে নারী দেহ, উন্মাদনা, গহ্বর, যেখানে রস ঢালতে পারবে। ক্লান্তি আসা পর্যন্ত এই খেলাই খেলবে। সুলগ্নাও যে থাকবে না অনুভব করেছিল ক্যামেলিয়া ক্লাবে। যে সার্কেলেই মিশুক, যতই স্বামী সম্বন্ধে বিরক্তি থাক, কোনোদিনই সাংসারিক মায়াজাল ছেড়ে বেরতে পারবে না। ওর মধ্যবিত্ত মানাসিকতা থামিয়ে দেবে। মুহূর্তে আবেগ, চাওয়া, স্খলন শেষমেশ সাংসারিক বেড়াজালে। ও এই অসম্পূর্ণতায় বাঁচবে অতৃপ্তি নিয়ে।

সব যে পাওয়া যায় না সুলগ্না মেনে ফিরে গেছে অতৃপ্তির সংসারে। সায়ন্তনির মনে হয় এটা হার। সুলগ্নার কাছে হয়ত জিত। এই খেলায় কেউ জিতবে, কেউ হারবে। কে জিতেছে, কে হেরেছে - সময় বলে দেবে। শর্বরী রোজগারের বন্দবস্ত করে দিয়েছে। ওর দৈহিক লালসায় তো নিজেকে খুঁজে পায় না। ব্যবসায়িক চাহিদা জড়িত বলেই কি? মনের চাওয়া লেন-দেনের হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়।

অনেকদিন থেকেই কানাঘুষা শুনছিল। অভয় মনোলীনার সঙ্গে এখানে-ওখানে যাচ্ছে। একসঙ্গে কাজ করে। কদাচিৎ যেতেই পারে। তা নিয়ে তো কানাঘুষা হয় না। যা রটে তার কিছু তো বটে। অভয়কে প্রশ্ন করে অস্বস্তিতে ফেলতে চায়নি ঐত্রিলা। মানে নিজেকেও নামানো। তারও মানসম্মান আছে।

একদিন অভয় বলল "তোমার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগছে না"

আকাশ ভেঙে পড়েছিল ঐত্রিলার ওপর। কী বলছে! সিরিয়ালে কাজ করে। মেয়ের সঙ্গে ঘুরবে, কথা বলবে - এ আর এমন কী। তা বলে দুম করে ঘর ভেঙে দেবে ভাবতেও পারেনি।

"মানে?" জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন।

"আই ওয়ান্ট এ ডিভোর্স"

"দুম করে হঠাৎ? তোমার সঙ্গে তো কোনও গন্ডগোল হয়নি"

"থাকতে আর ভালো লাগছে না। ব্যস"

বিয়ে ইনস্টিটিউশনটা দৈনন্দিন ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় সীমাবদ্ধ? সে ভাবে বড় হয়নি। মনে পড়ে গেল বিয়ের শপথ

যদেবৎ হৃদয়ং তব, তদসতু হৃদয়ং মম

যদিদং হৃদয়ং মম তদসতু হৃদয়ং তব।

সব দেশেই এক ভাষা।

'ইন সিকনেস অর ইন হেলথ, ইন রিচনেস অর ইন পভার্টি, আনটিল ডেথ ড্যু আস অ্যাপার্ট'

ধর্মের প্রহসন থাপ্পড় মারল।

"এমন কী হল এত বছরের সম্পর্ক ভেঙে দেবে? প্রেমে পড়লে নাকি?" হাল্কা করার চেষ্টা করল।

অভয় খবরের কাগজে চোখ রেখে বলল "নাকখত দিইনি সারাজীবন একটা বিয়েতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে"

"না, তা দাওনি ঠিকই। বললে, আর দুম করে ডিভোর্স। অত সহজ?"

"সহজ নয়। লিগ্যাল ফর্মালিটিস আছে। সেগুলো করতেই হবে" নিরুত্তাপ অভয় সেন।

ঘাবড়ে গেল ঐত্রিলা। ওর পৃথিবীটা ভেঙে পড়ছে অথচ অভয় সেন নিরুত্তাপ। এই কী সে, যার পেছনে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত? রক্ষণশীল ঐত্রিলাও তো ওর প্রেমে মজে নতুন স্বপ্ন দেখেছিল। ভালোবাসার যুগলবন্দিতে ওদের আত্মজের জন্ম। কোথায় সেই দায়বদ্ধতা? ওর ঠান্ডা আবেগহীন নিস্পৃহতাটাই বুকে বিঁধছে। সঙ্গে অবজ্ঞায় চাপা রাগ।

"অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছ না কি?"

"সেটা কি অন্যায়?"

বউ ছেড়ে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়া অন্যায় কি না সংস্কৃতি বলে দেয়। দায়বদ্ধতা তো অস্বীকার করা যায় না। বিয়েটা কি হিমেল রেফ্রিজারেটার, যে কামনা-বাসনাও বন্দি? না কি দৈহিক-মানসিক মুচলেকার শিকল, যে আবার দেহ-মন কাউকে সঁপা যায় না?

"কে সেই সৌভাগ্যবতী বা দুর্ভাগ্যবতী? তার সঙ্গে ঘর টিকবে?" অবান্তর প্রশ্নের জবাব নিষ্প্রয়োজন। উত্তর না দিয়ে ফিরল খবরের কাগজে।

ঐত্রিলাকে দেখে মনটা ভরে গেল। এই মুহূর্তে আভিজাত্যের উন্মাদনার বাইরে নিজস্ব ছোট্ট পৃথিবী খুঁজছিল সায়ন্তনি। ঐত্রিলার নিরাভরণ উপস্থিতি, স্বাভাবিকতা নিজের মতো লেগেছিল সেদিন।

"বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি তো?"

"এ দিকটা আমার চেনা" সোফায় বসল ছিপছিপে ঐত্রিলা। হাল্কা আকাশি তাঁতের শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, প্রলেপহীন। ফিকে রোদে মিষ্টি লাগছে। নায়িকাদের চেয়ে খারাপ না।

"মেয়ের খবর পেলেন?"

"ভালোই আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে"

"এবার কাছে এনে রাখুন"

"তাই ভাবছি"

"স্বামী, মনোলীনা সম্পর্কে খোঁজ পেলেন? বেশিদিন টিকবে না। মনোলীনা ঘর করার মেয়ে নয়। ও কেটে পড়লে ঠিক ফিরে আসবে। ততদিন ডিভোর্স দেবেন না" বন্ধুর মতো উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা।

"আর ইচ্ছে নেই। পোড়া ঘর আর ভাঙা আয়না কখনও জোড়া লাগানো যায় না। ফিরে এলেই গ্রহণ করতে হবে এমন নয়" দৃঢ়তার সঙ্গে বলল "আপনার কর্তার খবর কী?"

হতাশ স্বরে সায়ন্তনি বলল "পাগল হয়ে গেছে। লং-টার্ম কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছি। জীবনটাই ফাঁকা। কিছুই আর নেই"

দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে নিজের অন্তরের রাগিণী। ব্যথার যুগলবন্দি। তাই আপাত অস্থায়ী সম্পর্কের বুনিয়াদ। দৈহিক উন্মাদনা থেকেও গভীর। ট্যানিয়া বা সুলগ্নার চেয়েও আকর্ষণীয়। সংবেদশীল অনুভূতির মধ্যেই নতুন উদ্দীপনার স্ফূরণ। জেতার নেশায়।

"কী হয়েছিল?"

"বরাবরই ইনট্রোভার্ট। দিনকে দিন নিজের দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছিল নিজেকে নিয়েই থাক। এখন বুঝছি ওর মানসিক মৃত্যু হচ্ছিল"

"ডাক্তার দেখাননি?"

“প্রথমে বুঝিনি। তাই দেখাইনি। পরে ডাঃ রামকে দেখাতে বললেন সিজো-অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার। গালভরা নাম। অতশত বুঝি না। নিজের দেখভালই করতে পারছিল না”

“এখন কী করবেন?”

“রোজগারের জন্য রাস্তায়। বিজনেস। সেই কথাবার্তাই চলেছে। এ বয়সে কেউ চাকরি দেবে না”

“ইজ দেয়ার নো চান্স অফ রিকভারি?”

“জানি না। ক্রনিক প্রবলেম। তাড়াতাড়ি রিকভার করবে বলে মনে হয় না”

“জীবনটা বড় নিষ্ঠুর” ঐত্রিলা আওড়াল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়ন্তনি বলল “বসুন, কফি করে আনছি”

ঐত্রিলার চোখ ঘুরছে সারা ঘরে। সাজানো ছিমছাম বড় ফ্ল্যাট। দামি না হলেও সোফার গদিগুলোতে বাংলার তাঁতশিল্পের প্রভাব। দু-পাশে কোণার্কের মূর্তি। দেওয়ালে রাজস্থানি ভিল বিয়ের চিত্রপট। কাশ্মীরি কর্নার টেবলের ওপর চামড়ার উট। ছোট্ট ক্যাবিনেটে তিনটে কাঠের হাতি। বোধহয় রাজস্থান থেকে কেনা। কর্নারের ফ্লাওয়ার-ভাসে ড্রাই ফ্লাওয়ার। ওপাশে এলজি টিভি। অবস্থাপন্ন না হলেও আর্টিস্টিক টেস্ট। সাজানো ঘরে প্রাণ ছাড়া সবই আছে।

কফিটা এগিয়ে বলল “এক চামচ। হবে তো?”

“চিনি বেশি খাই না। আমার মোটা হওয়ার ধাত”

উল্টোদিকের সোফায় বসে চুমুক দিয়ে সায়ন্তনি বলল “এত বাছবিচার নেই। যা ভালো লাগে খেয়ে নিই। এই তো চেহারা। চেষ্টা করলেও ক্যাটারিনা কাইফ, দীপিকা পাড়ুকনে হতে পারব না। অত নিয়ম করলে জীবনটাই মাটি। আপনার মতো হলে দেখাশোনা করতাম”

“বাইরের সৌন্দর্যে কী হবে? এতেই মুগ্ধ অভয় প্রেমে পড়েছিল। আর এখন এটাই ভালো লাগছে না। এখন তো মনোলীনা অনেক বেশি সুন্দর”

“সুন্দর না ছাই। পুরুষমানুষ অচেনা দেহ দেখলেই উসখুস করে। মনোলীনা তো খুলতেই আগ্রহী। নিশ্চয়ই আপনার কর্তাকে দিয়ে কোনও ধান্দা উসুল হবে। তাই পা ফাঁক করতে পিছপা নয়। যেদিন কাজ খতম সেদিন টা-টা বাই-বাই করে আরেকজনকে”

“ও কার সঙ্গে থাকুক আমার কী? আমার পৃথিবীতে নেই”

“ফিরে এলেও, না?”

“কখনওই নয়। যে ম্যারেজ নামক পবিত্র ব্যবস্থাটাকেই বিদ্রুপ করে সে মানেই বোঝে না। তার জায়গা নেই”

"ম্যারেজ নামক ইনস্টিটিউশনে আপনি বিশ্বাসী?" পায়ের ওপর পা তুলে দিল।

"কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল। এখন জানি না" ঐত্রিলা উদাসীন।

"সম্পর্ক সামাজিক নিয়মের বাইরে গড়া যায় না?" কৌতূহলী সায়ন্তনি ঐত্রিলার দিকে তাকাল।

"ঠিক বুঝলাম না"

"মানে সম্পর্কের কী চেনা ভাষা প্রয়োজন? ভালোলাগার কী কোনও ভাষা আছে? আপনি এলেন। একাকিত্বে সঙ্গী পেলাম। এটাও তো সম্পর্ক"

"নিশ্চয়ই। এখন বুঝছি আপনিও আমার মতো একা"

"তাই বা ক'জন বোঝে? একে আরেকজনের দুঃখ, একাকিত্বে সঙ্গটাও তো সম্পর্ক। কোন ডেফিনিশনে?"

সায়ন্তনি তো ঠিকই বলছে। ঘরে একলা বসে টিভি দেখার চেয়ে ওর সঙ্গে ঘুরে, রেস্টুরেন্টে খেয়ে, সিনেমা দেখে, দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। উঠে বলল "চলুন তবে একটা সিনেমা দেখে আসি। অ্যাক্রোপলিসে দেখি কোন সিনেমা দেখা যায়"।

খাওয়া। অ্যাক্রোপলিসে সিনেমা। গণ্ডি ছেড়ে বাইরে।

"বেশ। লেটস এনজয় দ্য ডে আউট"

সায়ন্তনি বলল "যাবেন একটু দূরে গঙ্গার ওপর। ফ্লোটেলে। এক্সপেন্সিভ। কিন্তু দারুণ কনটিনেন্টাল কুসাইন করে"

স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর গঙ্গাবক্ষে ভাসমান রেস্তরাঁর ডেকে ঐত্রিলা বলে গেল তার কথা। ছোটবেলা, দাদুর তক্তি নাড়ু, অভয়ের সঙ্গে আলাপ, প্রেম ও বিয়ে। অভয়ের মেয়েদের প্রতি দুর্বলতার কথাও বাদ দিল না।

মিঠে শীতের আমেজ। নীল দিগন্তে বকেদের ওড়াউড়ি। পলিমাটি মেশা গঙ্গার জল। লছমনঝোলার মতো সবুজ নয়। সায়ন্তনির মনে হল, মুক্তি রনিতের মধ্যেরাতের উন্মাদনায় নয়, শর্বরী বসুর ধান্দার অর্গিতে নয়, ট্যানিয়ার প্যান্টির ফাঁকেও নয়, সুলগ্নার অতৃপ্ত বাসনায় নয়। যা বদ্ধ কক্ষে অলক্ষ্যে। মুক্তি মনের বিকাশে। সাদা বকগুলোর মতো ডানা মেলে উদার দিগন্তে হারানোয়। নিঃসঙ্গতার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে ভেসে বেড়ানো অনাবিল আনন্দে। সোনালি রোদে, ফুরফুরে হাওয়ায় আরেক অনুভূতি। ভালোলাগার, তৃপ্তির, মুহূর্তকে বরণ করে নতুনের ডাকে পাওয়ার। যা আগে করেনি। ভালোলাগাকে নিজের মতো করে উপভোগ করার।

ঐত্রিলার মনে হল, চলার পথে এমন অনেকে আসে যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, হবেও না। মোহহীন শান্তির নতুন ছন্দে একঘেয়ামি থেকে মুক্তি। মুহূর্তের পাওয়াটাই বা কম কীসের? এই প্রশান্তিময় ভালোলাগাই কী

অজান্তে ভালোবাসায় রূপান্তরিত? তা যদি পুরুষ নারীর বুকে আলোড়ন তুলতে পারে, দুই নারীর মধ্যে কেন নয়? অনুভূতিটা তো ক্রোমোজোমের ডেফিনিশনে সীমাবদ্ধ নয়!

সায়ন্তনি স্টেক মুখে পুরে বলল "অনেকদিন পর মন খুলে আনন্দ করতে পারছি। কী যে ভালো লাগছে"

ঐন্দ্রিলা সায় দিল "আমারও"

ভালোলাগাটা সুখের স্বর্গে সাকসেসের দৌড়ে হারিয়ে যায়। দুঃখের টানে নিরালায় চাওয়া-পাওয়া, হারজিতের বাইরে কাছাকাছি নিয়ে আসে। আধুনিক পৃথিবীর বন্ধন ছাড়িয়ে কালপ্রবাহের আবর্তন মুছতে পারেনি। প্রবেশ করতে পারেনি, পরিবর্তনশীল প্রকাশের বাইরে আমির আবরণ ভেদ করে অন্তরের গভীরে। সেটাই পাওয়া। যার ঠিকানা এতদিন পায়নি।

"স্টেকটা এরা ভালো করে"

"অ্যাম্বিয়েনসটাও। প্রকৃতি আমায় টানে। জল পেলে কথাই নেই। ছোটবেলায় যখন অ্যান্ডারসন ক্লাবে সাঁতার শিখতাম আমার সে কী ভয়। এখন জলের কাছে এলে মনটা ভরে যায়"

"একদিন তাজপুর বা মন্দারমণি যাবে? চাঁদনি রাতে বড্ড ভালো"

"একটা উইকেন্ডে গেলেই হয়। ড্রাইভ করব না। গাড়ি ভাড়া করে নেব"

ডিজিট্যাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে শুরু করে দিল। কলকাতার পলিমাখা মেঠো গঙ্গার ছবি। যাতে অনেকে সকালে পুণ্যস্নান করে। জীবনের প্রবাহে শান্তির স্ফুলিঙ্গ। বিশ্বাস? না, অন্য কিছু। দৃশ্যটা অপূর্ব। ফ্রেম-বন্দি করার মতো।

"ছবি তুলতে ভালোবাস জানতাম না"

"ভীষণ। এক-সময় প্যাশন ছিল। এখন নেই। তবে ভালো সিন দেখলে তুলতে ইচ্ছে করে"

"তবে তো চাঁদনি রাতে মন্দারমণি বা তাজপুর যেতেই হয়"

"নেক্সট উইকেন্ডে"

হঠাৎ সায়ন্তনির মোবাইলে বাপি "কোথায় আছিস?"

"ফ্লোটেলের ডেকে বান্ধবীর সঙ্গে স্টেক খাচ্ছি"

বাবা উদ্বিগ্ন "আর ইউ ফাইন্যানশিয়ালি ওকে? নিড্ মাই হেল্প?"

"নট অ্যাট দ্য মোমেন্ট। ইফ নিড বি উইল কল ইউ"

ফোনটা কেটে বলল "ড্যাড। নাউ নো ওয়ান এক্সপেক্ট হিম"

"আই অ্যাম দেয়ার। মে বি নট ইন হ্যাপিনেস, বাট ডেফিনিটলি ইন সরো"

"সুইটেস্ট সঙ ওয়ান ওয়ান্টস টু হিয়ার। ইউ মেড মাই ডে"

সায়ন্তনি অনুভব করল, ঐত্রিলার সঙ্গে গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে। দেহের নয়, মনের। ভালোবাসা? মনের গভীর অরণ্যের গোলকধাঁধায়। তফাত এটুকু। এখানে নারী-পুরুষের দৈহিক চাহিদা নেই। ঘর বাঁধার স্বপ্ন নেই। নারী-নারীর দেহেরও কামনা নেই। সাদা বকের মতো উন্মুক্ত বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত নির্মল আনন্দ। জীবনের অন্য ছন্দ। যার স্বাদ আগে কখনও অনুভব করেনি।

উনত্রিশ

ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে রুষ্ট বিদিশা বলল “কেন হবে না?”

“এখন নিয়ম পাল্টে গেছে ম্যাডাম। নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ছবি, প্যান, আধার কার্ড লাগবে” অনুত্তেজিত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

“ছবি দিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া পুরনো অ্যাকাউন্টে প্যান তো আছেই। আধার কার্ড এখনও করা হয়নি”

কুঁড়েমিই বটে। সবেতেই আজকাল আধার কার্ড। নিয়মিত ট্যাক্স দেয়। আধারের অ্যাপ্লিকেশন দিলেই নর্মাল কোর্সে হয়ে যেত। কুঁড়েমির জন্য হয়ে ওঠেনি। নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েই বিপত্তি।

নরম হয়ে বলল “কোনও ভাবেই কী সম্ভব নয়? ম্যানেজ করা যাবে না?”

মিষ্টি হেসে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলল “করা গেলে তো করেই দিতাম। এতবার বলতে হত না। আপনারা ডাক্তার। জেনুইন। উপায় থাকলে করে দিতাম। আমার হাত-পা বাঁধা”

বিদিশা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল। কিছু করা যাবে না। আর নয়। এবার আধার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতেই হবে। কদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে? ওরা ডেট ফিক্স করে ডাকলে সারাদিনের জন্য হাজিরা। হাসপাতাল থেকে ছুটি। একটু সাহায্য হলে তাড়াতাড়ি করা যেত। কী করবে ভাবছিল। হঠাৎ দেবজিতের কথা মনে হল। ইতস্তত করছিল। চিনবে তো? বড় আমলা। গঙ্গাসাগরের ব্যাপারটা আলাদা। কলকাতার বাইরে। এখানে ওর পোজিশন অন্য। কাজের পরিসীমার বাইরে অনেক শিথিল। আসল মানুষটা আড়ালে। মুখোশে ঢাকা। কৃত্রিম। অনেক সাবলীল। যে গঙ্গাসাগরে নেমতন্ন করে খাইয়েছে, সে কী নবান্নে চিনতে পারবে? বলেছিল পারবে। দেখাই যাক।

মোবাইলে দেবজিৎকে ধরল “বিদিশা। গঙ্গাসাগর মেলায় আলাপ হয়েছিল। চিনতে পারছেন?”

“কেন পারব না? মিটিংয়ে আছি। শেষে হলে ফোন করব” মোবাইল কেটে দিল।

কী জানি করবে কি না। দ্বিতীয়বার ফোন করবে না। যদি ফোন করে ভালো। নইলে অন্য উপায়। ভুল করেছিল চিনতে। কেউকেটা হয়ে মাথাটা বিগড়ে যায়নি। যেমন অনেকেরই যায়। ভারসাম্য হারায়নি।

মোবাইলে নামটা ভেসে উঠতে আশ্বস্ত "দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়। স্যরি, তখন মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম”

“দেখা করতে চাই”

“বেশ তো। অফিসে চলে এস”

“না, ওখানে নয়। যেতে ভয় করে”

“ভয়? নীচে সিকিউরিটিকে বলে রাখব”

“ওখানে যাব না। বড় জায়গায় অসহায় লাগে”

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা “বেশ তো, আমার বাড়িতে এস সন্ধে সাতটার পর। আগে ফোন করে নিও। আমার মিসেস রুমা মেয়ে টিঙ্কুর সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে”

বিদিশা আশ্বস্ত হল “এই শনিবার ফ্রি?”

“এক মিনিট… হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাতে খেয়ে যেও। ফোনে ডিরেকশন বলে দেব”

ফোনটা নামিয়ে রেখে ভাবল দুম করে ওকে খেতে বলল রুমাকে না জানিয়ে। রাগ করতে পারে। সঙ্গে পাঁচ কথাও। ওকে জানার কৌতূহল বাড়তি।

ড্রাইভ করে এল। পাজামা-পাঞ্জাবিতে দেবজিৎকে অন্যরকম লাগছে। একগাল হেসে বলল “চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?”

চটিটা খুলে সোফায় বসে বলল “ভেবেছিলাম চিনতেই পারবেন না”

“কেন?”

“অনেক সেলিব্রিটি দেখলাম। সারা রাত সেবা করেছি। দিনে একশোবার ফোন। অথচ দেখলে চিনতেও পারে না”

“ওদের প্রবলেম। তোমার নয়। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। চিনল কি না চিনল, ডাস ইট রিয়েলি মেক এ ডিফারেন্স?”

মাথা নাড়ল “খুব একটা নয়। তবে দুঃখ লাগে”

“এটাই ক্ষতি করবে। দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। এটাই জাগতিক ধর্ম। যখন আর কিছু নেই, অহংটাই বর্ম। মেক ইওরশেলফ কমফরটেবল। রুমা, বিদিশা এসেছে”

“আসছি। তোমরা কথা বল। ভাজাটা শেষ করেই আসছি”

বিদিশার দিকে তাকাল। ফিকে হলুদ সালোয়ার-কামিজে খয়রি বুটিকের কাজ। হাল্কা লিপস্টিক। বিনুনি, হেয়ার-ব্যান্ড ছাড়া চুল পিঠে। ফুটপাথ থেকে কেনা চটি।

“টিঙ্কু, টিঙ্কু… আয় মা”

হলুদ স্কার্ট, সাদা টপস পরা মেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাপের মুখ বসানো। চুল এলোমেলো।

“চিনিস একে? বড় ডাক্তার। প্লাস্টিক সার্জেন। তোর নাকটা ঠিক করে দেবে”

বিদিশা লজ্জা পেল। সঙ্গে শ্রদ্ধাও। অন্যকে সম্মান দিতে কুণ্ঠা নেই। সে-ই দেবজিৎকে চেনেনি।

মেয়েটিকে বলল “নাম কী?”

“টিঙ্কু”

“কী কর?”

“প্রেসিডেন্সিতে সেকেন্ড ইয়ার ইকনমিক্স”

দেবজিৎ বলল “ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিল। আমিই দিইনি। মেয়েরা ডাক্তার হলে ঘর-সংসার থাকে না। তেমন ইচ্ছে থাকলে না করতাম না। ইকনমিক্স পড়তেই বেশি আগ্রহী। কম্পিউটারের পোকা। সারাদিন কম্পিউটারে। টিঙ্কু, আন্টি খুব ভালো ছবি তোলে”

লজ্জিত বিদিশা বলল “ভালো নয়। ওই শখ আর কি”

আন্টিকে দেখছে। এত সুন্দরী ডাক্তার আগে দেখেনি। যে কটা দেখেছে বয়স যাই হোক না কেন, একেবারে বাংলার পাঁচ। এমন সুন্দরী ডাক্তার আন্টি যদি অন্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, সে কতই না সুন্দর।

কিচেন থেকে রুমা বেরিয়ে বলল “বোস, জামাটা পাল্টে আসছি”

মানে রান্না হয়ে গেছে। মাকে দেখে টিঙ্কু উঠে পড়ল। নম্রভাবে বলল “আসি”

ও বেরিয়ে যেতেই দেবজিৎ বলল “ওয়াইন খাবে? ভালো ওয়াইন আছে”

“গাড়ি চালাচ্ছি তো। তাই খাব না”

দেবজিৎকে দেখে ধারণাটা পাল্টে যাচ্ছে। সঙ্গে শ্রদ্ধাও বাড়ছে। পোজিশনের জন্য নয়, মানুষটার জন্য। অন্যরকম। গতের বাইরে। যদিও সব কিছুই আর পাঁচজনের মতো। কেবল অহং ছাড়া। বিচ্ছিন্ন।

উল্টো সোফায় বসল “ফোনে বলছিলে কী দরকার আছে?”

দেবজিৎদার দিকে তাকাল। ৫’ ৮” রোগা ফর্সা সুপুরুষ। রিমলেস ফ্রেমের চশমা। মুখটা চৌকো হলেও হাসিখুশি।

“তেমন কিছু নয়। কাজের চাপে আধার কার্ডটা করানো হয়নি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগবে। যদি তাড়াতাড়ি ডেট…”

“কোন ওয়ার্ডে ইনকম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট হয়?”

“ওয়ার্ড এইট। ব্যাম্বু ভিলায়”

“শৈলেশ গুহনিয়োগীকে বলে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি করিয়ে দিতে”

“সে কে?”

“উদাইয়ের ইস্টার্ন জোন্যাল হেড”

আস্তে বলল “থ্যাঙ্কস”

“ছবি তুলতে, কবিতা লিখতে ভালো লাগে। আর কী কী করতে?”

“গান শুনতে। প্রায় দশ হাজার গানের কালেকশন আছে”

“কী ধরনের?”

“সব রকম। রবীন্দ্রসংগীত থেকে হিন্দি”

“ব্যান্ড?”

“সুর, ছন্দ ছাড়া গান বুঝি না। কবির সুমন, নচিকেতা, অঞ্জন দত্তদেরও যখন প্রথম এসেছিল ভালো লাগত। আজকালকার গানে সুর, ভাব মিসিং। আপনি গান ভালোবাসেন না?”

“রবীন্দ্রসংগীত। লোপামুদ্রা মিত্র, জয়তী ভট্টাচার্য, সুস্মিতা পাত্র। সেকেলে গানও”

“সুস্মিতা পাত্র। নামটা তো শুনিনি?”

“ভালো গায়”

“ইউ টিউবে আছে?”

“হ্যাঁ”

অবাক হচ্ছে ওকে দেখে। বেশিরভাগই টাকা, নাম, প্রতিপত্তির পেছনে ছুটতে ব্যস্ত। অবসরে ক্লাবে গুলতানি। নইলে হাসপাতালের পলিটিক্সে বাঁচার অর্থ। যেন টাকা, নাম, গাড়ি, বাড়ি, বাঁচার একমাত্র পাথেও। বিদিশা অনেক আলাদা। কলা-সাহিত্যে রুচি আছে।

বাজিয়ে দেখার জন্য জিজ্ঞেস করল “বই পড়?”

“হ্যাঁ। তবে আজকালকার উপন্যাস ভালো লাগে না। মনিষীদের জীবনী, ভিশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড”

গঙ্গাসাগরে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল আলাদা। কেন ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই কৌতূহল - রাতে নেমতন্ন। আলাদা হলেও ঠিক কোথায় বুঝতে পারছে না।

রুমা দেবজিতের পাশে সোফায় বসে বলল “স্যারি, দেরি হয়ে গেল। ওর মুখে তোমার কথা শুনেছি। ডাক্তার, প্লাস্টিক সার্জেন। এর আগে মহিলা প্লাস্টিক সার্জেন দেখিনি”

দেবজিৎ ঠাট্টা করে বলল “মেয়ে গায়নোকলাজিস্ট, আই সার্জেন, পেডিয়াট্রিশিয়ান দেখেছ। এবার মেয়ে প্লাস্টিক সার্জেনও দেখে নিলে। ভালো ছবি তোলে, কবিতা লেখে, গান ভালোবাসে”

“লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালে আছ?”

মাথা নাড়ল “আপনি কী করেন?”

“মাস্টারনি। স্কুল টিচার”

দেবজিৎ হাসল “শুধু স্কুলের নয়, আমারও মাস্টারনি”

“বাড়িতে কে কে আছে?”

“মা, বাবা আর আমি। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। লন্ডনের হ্যারোতে থাকে। বছরে-দুবছরে একবার আসে”

“বিয়ে করনি?”

“হয়ে ওঠেনি”

“তোমরা কেরিয়ারিস্ট। বিয়ে করে ডাক্তারি কেরিয়ার মাটি করবে কেন?”

“ঠিক তা নয়। মনের মতো কাউকে পাইনি। বাবা-মা সেই নিয়ে খুব চটা। না পেলে কী করব? রাম-শ্যাম-যদু-মধুর গলায় ঝোলার থেকে বেশ আছি। বেড়াতে ভালোবাসি। গান শুনি। ছবি তুলি”

“আমার এক বন্ধুও গান গায়। নাম শুনেছ? সীমা, সীমা সরকার”

একটু ভেবে বলল “হ্যাঁ। কিন্তু এখন তো গাইছে না”

“এখন কলকাতায় থাকে না। মুম্বাইতে। হিন্দি সিনেমায় প্লেব্যাক করছে। চার বাংলোয় থাকে। চা খাবে? বস, করে আনছি। ডান দিকের আলমারিতে চানাচুর আছে। ওকে দাও”

বাধ্য স্বামীর মতো উঠে গেল দেবজিৎ। রুমাও চা করার জন্য কিচেনে।বিদিশার চোখ ড্রয়িং রুমের সর্বত্র। দেওয়ালে দারুণ একটা গ্লেসিয়ারের ছবি। অন্য দেওয়ালে পাহেড়ে প্রথম সূর্যোদয়ের ছটা। কোণে বিষ্ণুপুরের ঘোড়া। এলজি টিভি। দেওয়ালের ওয়াল হ্যাঙ্গিংস। ক্যাবিনেটের ওপরে তিনটে হাতি।

চানাচুরের প্লেট রেখে, গ্লেসিয়ারের ছবির দিকে বিদিশার পেছনে দাঁড়িয়ে, দেবজিৎ বলল “মানস-সরোবরের”

বিদিশা অবাক “মানস-সরোবরে গেছেন? শুনেছি ওখানে যাওয়া ভীষণ কষ্টের”

“কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। নইলে নয়। দেহের থেকেও মনের জোরের ওপর নির্ভর করে। কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছ সেটাই আসল। জানা থাকলে মনের জোর এসে যায়। তখন কোনও কিছুই কষ্টের নয়”

“মনটাই আসল? দেহ নয়?”

“দুটোই জরুরি। পুরোটাই অ্যাডাপ্টিবিলিটি। হিউম্যান অ্যাডাপ্টিবিলিটি ইজ ট্রিমেনডাস। দেহ তো হারজিতের লড়াইয়ে বন্দি। মন থাকলে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়”

ঠিকই বলছে। তার মনের ক্ষোভ তো তার দেহকে জুড়য়নি। সুবিমলদার ওপর রিভেঞ্জ নিতে অনুরূপদা, অরণি, অনির্বাণকে দৈহিক, মানসিক, সাইকোসেক্সুয়ালি আঘাত করেছে। তাতে কী শান্তি পেয়েছে? মনের দাবানল তো নেভেনি। সব মেয়েরই একদিন ভার্জিনিটি যায়। তার নয়, বিয়ের আগে। মনটা আঁকড়ে থেকে কী পেয়েছে? অশান্তি ছাড়া। ঘরও হল না এই প্রতিহিংসার আগুনে। হারজিতের মধ্যে অলিখিত সীমারেখা।

যেটুকুই জিতেছে সেটাও আপেক্ষিক। জেতা-হারার সংজ্ঞাটা গোলমেলে। দেবজিৎদার কথায় নতুন করে ভাবছে।

চানাচুর মুখে ফেলে বলল "যদি হারজিত ছেড়ে দিই বাঁচব কী নিয়ে?"

"নিজের মধ্যে"

মানে বোঝার আগেই চা হাতে রুমা "দেখ তো চিনিটা ঠিক হয়েছে কি না?"

"খাওয়া নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। আপনি বসুন। সারাদিন ছুটছেন। স্কুল করে রান্না করেছেন"

"অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া আজ হাফ-ডে ছিল। দুপুরে ঘুমিয়েছি" চামচ নেড়ে এগিয়ে দিল।

"ও বলছিল, তোমার কী দরকার। হয়ে গেছে?"

"আধার কার্ডের ব্যাপার। করে দেবেন। আপনার কী সাবজেক্ট?"

"বটানি। পিএইচডি করেছি। কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে ছিল। তখন টিঙ্কু হয়েছে। ট্র্যান্সফারেবল চাকরি বলে নিইনি। মাস্টারনি হয়ে গেলাম। এখন উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স পড়াই"

ইচ্ছে করছে দেবজিতের সঙ্গে কথা বলতে। এতদিনের ধারণায় অবলীলায় রোড-রোলার চালিয়ে দিয়েছে। কথা বললে পরিষ্কার হত। দেবজিৎকে বলল "একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি কিছু মনে না করেন?" ওর আশ্বস্ত মুখ ভরসা পেল "এ যুগের টার্মসে আপনি সাকসেসফুল। শুধু নিজেকে নিয়ে বেঁচে আছেন?"

"নিজেকে নিয়ে তো বটেই, সঙ্গে সবাইকেও। রুমা, টিঙ্কু, তুমি"

"অথচ আমাকে বললেন নিজের মধ্যে বাঁচতে?"

"নিজেও জানো না কী নিয়ে বেঁচে আছ। কাজ, ফোটোগ্রাফি, কবিতা, গান সবই তোমার দুনিয়া। বিয়ে যখন করনি, আর কোনও পৃথিবী এখন নেই। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েও বাইরের দুনিয়ায় কেন?" রুমাকে বলল "খাবার রেডি হলে দিয়ে দিও। ও একা ফিরবে"

চায়ের কাপগুলো নিয়ে রুমা কিচেনে।

খাওয়া শেষে ওকে একা ছাড়েনি। অর্ডালি, ড্রাইভারকে গাড়িটা এসকর্ট করতে বলল "ওনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। চিন্তা কর না। আধারের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে"

বাড়ি ফিরে বিছানায় ছটফট। তাহলে কী, এতদিন যেভাবে জীবনটাকে নিয়ে চলেছে ভুল? অন্ধ রাগে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি। সত্যি কী কিছু পেয়েছে? হৃদয় কিন্তু জুড়ায়নি। কীভাবে শান্তি পাবে দেবজিৎদা তো বলল না। যা বলেছে ঠিক। এতকাল হারজিতের উন্মত্ততায় ছুটেছে। ছোটাই সার। ঘৃণা, দ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা জীবনটাই মাটি করেছে। ওদের ক্ষণিকের আঘাত কাটালেও সুপ্ত যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ

পায়নি। তাই শান্তিও পায়নি। একরোখা অবসেশনে আপেক্ষিক জেতা-হারা দাঁড়িপাল্লায় ঝুলিয়ে চাওয়া-পাওয়াকে তার মাপকাঠিতে বিচার করতে চেয়েছে। সাময়িক উল্লাসের পর তাও হারিয়ে গেছে ব্যথার চোরাবালিতে। অন্ধকার নির্জন শূন্যতা গ্রাস করে মানুষটাকেই মেরে ফেলছে। প্রতিহিংসা বাঁচার মন্ত্র নয়। এর বাইরেও জগৎ আছে। ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, সম্পূর্ণতা। দেবজিৎ যা পেয়েছে, বিদিশা তা পায়নি।

ও জীবনকে ভালোবাসতে পেরেছে। তার মধ্যেই বাঁচার মন্ত্র। তাই ও শান্ত, স্থির, ফোকাসড।

গভীরে অসহ্য আলোড়ন! যা অনুভব করেছিল সুবিমলদার সংস্পর্শে। সেই অনুভূতিটা আবার... মিঠে ব্যথা আনন্দের। নতুন করে পাওয়া অনেকদিনের হারানো অনুভূতি। ভেতরেই ছিল। আজ আধার কার্ডের জন্য দেবজিতের সংস্পর্শে সেই প্রদীপ জ্বলে উঠেছে।

বিদিশা কী দেবজিৎকে ভালোবেসে ফেলল?

ত্রিশ

“রনিত এল না?” সায়ন্তনি জিজ্ঞেস করল।

“না” শর্বরী উদাসীন।

“কেন, কী হল?”

“পরে বলব” এড়িয়ে মিঃ ট্যান্ডনের দিকে এগোল “ইজ এভরিথিং ফাইন? ডস্ দ্য অ্যারেঞ্জমেনট মিট ইওর এক্সেপটেশনস?”

“ফাইন। উই ওয়ার লুকিং ফর অ্যান আউটলেট অন দ্য ইস্টার্ন সাইড। থ্যাঙ্কস শর্বরী ফর প্রভাইডিং আস উইথ ওয়ান”

“ডোন্ট থ্যাংক মি। থ্যাংক সায়ন্তনি ফর প্রোভাইডিং হার ফ্ল্যাট ফর দ্য গুড ভেনচার” সায়ন্তনিকে ইঙ্গিত করল “মিঃ ট্যান্ডন ওয়ান্টস্ টু থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোঅপরেশন” ট্যান্ডনের দিকে ফিরে বলল “হোপ উইথ দিস ফার্স্ট আর্ট এক্সিবিশন অ্যাট হার প্রেমিসেস ইওর অ্যাসোসিয়েশন উইথ হার উইল ব্লসম ইন্টু এ লং টার্ম রিলেশনশিপ”

“সিওর ইট উইল”

শর্বরী কথা রেখেছিল। অরণি চলে যাওয়ার পর থেকে বড় ফ্ল্যাটটা খাঁ খাঁ। ভাড়া দেওয়া বা পেয়িং গেস্ট রাখা ছাড়া বিশেষ কোনও উপায় ছিল না। তাহলে থাকত কোথায়? বাবার বাড়িতে? ওখানে ফেরত যেতে চায়নি। হাজারও প্রশ্ন, আলোচনা। অবস্থাপন্ন গিন্নিদের এ ছাড়া আর কী বা আছে? জীবনের আর কোনও দিকও তো নেই। ঢলা যৌবনে ছেলেবাজির চান্স কম। ক্যামেলিয়া ক্লাবে তিনপাত্তি বা অন্যদের ব্যক্তিগত চর্চায় মশগুল। শেখেনি তো অন্য কিছু।

দু-তিনজন তরুণ এক্সবিশনে। মফসসলের বোধহয়। সাধারণ বেশ, খোঁচা দাড়ি, জিনস-পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ। দর্শকের প্রতিক্রিয়া গিলতে উদগ্রীব। বুঝতে অসুবিধা হল না এরাই চিত্রকর। চিত্রশৈলী আর্ট গ্যালারির তরুণ শিল্পীদের ইনট্রোডিউস করাবার জন্য মিডিয়ার প্রতীক্ষায় ট্যান্ডন।

সস্ত্রীক এক ভদ্রলোককে দেখে একগাল হাসি ছড়িয়ে ট্যান্ডন বলল “সো নাইস অফ ইউ টু কাম” শর্বরীকে ডেকে বলল “মিট দ্য চিফ সেক্রেটারি মিঃ দেবজিৎ ব্যানার্জি”

মুচকি হেসে অভিবাদন জানাল। পাশে সায়ন্তনি। ওকে ইঙ্গিত করে ট্যান্ডন বলল “দ্য ভেনু ইজ ওনড্ বাই হার। মিসেস সায়ন্তনি নাগ”

রুমা ছবিগুলো দেখছে। পাশে ওই ছেলেদের মধ্যে একজন কাউকে ছবিগুলো বোঝাচ্ছিল। মিউসিক্যাল সিরিজ। বিভিন্ন সুন্দরী মহিলা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানান পোজে। সুন্দর শৈলী। কে বলে কলকাতায় চিত্রকরের অভাব? প্যারিসের পথে ছবি আঁকলেই শৈলী আর গ্রামের প্রতিভাবান অজ্ঞাত অখ্যাত শিল্পীদের মাটির চালাঘরে শিল্প-সাধনা কিছু নয়? ভ্যান গগও তো প্যারিসে বসেই গ্রামের ছবি এঁকেছেন। ট্যান্ডন ভালোই জানে। এদের জনসমক্ষে এনে সথবি অকশন হাউসের সঙ্গে ডিলে ট্যান্ডন কোটি কোটি কামায়। আর্ট অ্যাসেট। প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের মতো। বহু বিত্তশালী চড়া দামে ছবি কিনবে। যদিও দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্য, এরা সিকিভাগও পাবে না। ট্যান্ডন দশ গুণ অর্থে বিক্রি করবে। এরা জানতেও পারবে না। যা পাবে নতুন ক্যানভাস কেনায় খরচ হয়ে যাবে। কেউ নাম করে ফেললে কথাই নেই। খদ্দেররা তার ছবি কোটি টাকা নিলামে কিনবে। হায় রে পোড়া বাঙালি। আজও শিখল না, কী করে বিশ্বের দরবারে এদের পৌঁছে দিতে হয়। অথবা ভারতের অন্য প্রান্তে। কলকাতায় এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সেভাবে মিলল না। কোথায় দ্য ভিঞ্চি, ম্যাটিসে, রেনওয়া। গোলাম জাত এই করেই জীবন পার করে দেবে।

প্রত্যুত্তরে শর্বরী “নাইস টু মিট ইউ মিঃ চ্যাটার্জি। আর্ট ভালোবাসেন?”

“বৈকি। তবে ছবি আঁকতে পারি না। মাই প্যাশন ইজ ফোটোগ্রাফি”

“এনি পার্টিকুলার আস্পেক্ট?”

“নেচার। মফসসলের ছেলে তো। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে পাই”

দেবজিৎকে ডাকা মানে চিত্রশৈলী আর্ট গ্যালেরির প্রচার বাড়ানো। মিডিয়া স্টোরি করবে ট্যান্ডন জানে। প্রচারে বিক্রিও, সঙ্গে মুনাফা। ব্যবসার অঙ্ক বোঝে।

“দেখে তো মনে হয় না আপনি মফসসলের?”

“দেখে কতটুকুই বা বোঝা যায়?

চোখে অন্য ভাষা। দেবজিতের চোখ এড়ায়নি। ভেতরের উদ্বেগ চেপে কেতাদুরস্ত অভিনয় করে যাচ্ছে। ওর চোখে ভেতরের শর্বরী। আল্ট্রা-মর্ডান, কেতাদুরস্ত হলেও মাস্ক এঁটে নিজেকে পরিবেশন। অন্ধকার ঢাকছে মেক-আপের আড়ালে।

“দেখে বোঝা না গেলেও চোখ থাকলেই ভেতরটা আঁচ করা যায়”

জহুরির জহর পরীক্ষা। সরকারি আমলা নয়, যার উপস্থিতিতে মিডিয়ার ক্যামেরা ঝলসাবে, কাগজের হেড-লাইন। দেখছে মানুষ দেবজিৎকে। আড়াল করতে পারছে না ওর শ্যেনদৃষ্টি থেকে “কী দেখলেন?”

“থাক সে কথা। এসেছি ছবি দেখতে। আর্ট ভালোবাসেন?”

“বাসি বৈকি। হয়ত আপনার মতো বুঝি না”

“মানতে পারলাম না। ক্রিয়েটিভিটিকে বোঝার কী আছে? যা ভালো লাগল, মন ছুঁল তাই সত্যি। টেকনিক্যালি অ্যানালাইজ করে ভালো বোঝাব, মার্কেটিং হাতুড়ি পেটালেই মেনে নেবেন?”

অস্বীকার করা যায় না। বারবার রিড মাই লিপস্‌ মন্ত্রোচ্চারণ করলেই মানুষ অ্যাকসেপ্ট করে নেবে? বাঙালি অত বোকা নয়। যারা ভাবে তারা স্বপ্নরাজ্যে। ব্র্যান্ড তৈরি করলেও হারিয়ে যায়।

“ঠিকই বলেছেন। কনজিউমারিজমের যুগে আসলটা এভাবেই ব্যাকস্টেজে। মিঃ ট্যান্ডন অখ্যাত অপরিচিত আসলকেই তুলে আনতে চাইছেন। ইউ মে ডিফার, বাট দিস ইজ অলসো এ ফর্ম অফ সোশাল সার্ভিস”

দেবজিৎ মুচকি হাসল “নিশ্চয়ই। তাই তো এখানে”

লক্ষ করেনি, পাশে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনি কথাগুলো শুনছিল “আমারও এই মত। সেই জন্যই শর্বরীর প্রোপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। নিজে কিছু করতে না পারলেও অন্যের জন্য চেষ্টা করি”

দেবজিৎ মুচকি হেসে রুমার পাশে। ছবিগুলো দেখে পাশের দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে বলল “তুমি এঁকেছ?”

“হ্যাঁ স্যার”

“খুব ভালো হয়েছে। সরকার থেকে তানসেন ভবন তৈরি করছি। মে বি আই উইল কল ইউ ইন ফর সাম কনট্রিবিউশন” কার্ডটা এগিয়ে দিল “পরে যোগাযোগ করো”

দেবজিৎকে প্রণাম করল বিশ্বজিৎ। অভাবের সংসারে ছবি বিক্রির টাকায় বাজার খরচটুকু উঠবে। পেপারে রিভিউ বেরোলে একটু নাম। তাও কিছুদিনে লোকে ভুলে যাবে। সরকারি কনট্র্যাক্ট পেলে স্থায়ী রোজগারের সুযোগ আছে। ভিনসেন্ট ভ্যান গগ বড় শিল্পী হলেও, আজ মিলিয়ন ডলারে তাঁর ছবি নিলাম হলেও, দেনায় ডুবে অভাবে মারা গিয়েছিলেন। আজানা নয়। মরার পর কে পুরস্কার পেল, কত রোজগার হল, কী আসে যায়? জীবৎকালে যেটুকু পাওয়া, তাই নিয়েই বাঁচতে হবে।

ট্যান্ডন মিডিয়ার ক্যামেরায় বাইট দিচ্ছে। অন্য ক্যামেরা দেবজিতের বক্তব্য রেকর্ড করছে। টিভির সান্ধ্য আসরে ফলাও করে জানাবে। স্রষ্টা অজ্ঞাত রয়ে যাবে। প্রচার মিললেও তা কবে কে জানে? কত বিনিদ্র রাত কেটেছে এই সৃষ্টির পেছনে। পুরনো তুলির টান মুছে নতুন করে এঁকেছে। কত ওঠাপড়ার স্বপ্ন জড়িয়ে এর মধ্যে।

দেবজিৎ, রুমা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে শর্বরী এগিয়ে এল “ভালো লাগল আপনারা এলেন। অন্যদের এক্সিবিশনের সম্বন্ধে বললে খুশি হব” দেবজিৎকে বলল “দেখেও চেনা যায়। বুঝেছি, আপনি সবাই নন” মুচকি হাসল দেবজিৎ “যদি প্রয়োজন হয় চিনতে পারবেন তো?”

দেবজিৎ বিব্রত “চিনব না কেন? ফিল্মস্টার তো নই”

ওরা বেরিয়ে যেতেই গ্যালারির কোণে বসে পড়ল। মিডিয়া অনামি আর্টিস্টদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে। সায়ন্তনি শর্বরীর পাশে বসল "দেয়ার ইজ সামথিং ইন হিম। ইউ আর রাইট। হি ইজন্ট এভরিওয়ান। হোয়াট ইজ হি?"

"নো ক্লু" কথা বাড়াল না শর্বরী।

প্রসাধন ভেদ করে সায়ন্তনি অন্য শর্বরীকে দেখছে। যাকে বিবস্ত্র দেখেও আবিষ্কার করেনি। দৃপ্ত বলিষ্ঠ শর্বরী আজ প্রসাধনেও অনুভূতিটা আড়াল করতে পারছে না। সোসালাইট শর্বরী হারিয়ে গেছে। মুখে ইমোশন ভরা মানুষটার প্রতিচ্ছায়া।

অ্যাবরাপ্ট উত্তরে অবাক "হোয়াটজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ? ইউ লুক ওয়ারিড"

ফিসফিস করে বলল "ড্যু ইউ নো রনিত হ্যাস বিন ডায়গনজড অ্যাজ হ্যাভিং এডস?"

"না তো। শুনিনি"

"জাস্ট হার্ড ইট। রাতে অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে বেলভিউতে ভর্তি হলে ইন দ্য প্রসেস অফ রুটিন এক্সামিনেশন, এইচআইভি টেস্ট ওয়াজ পজিটিভ"

শিউরে উঠল সায়ন্তনি। ওর সঙ্গে সহবাস করেছে। ওকে ইনফেক্ট করেনি তো? হয়ত শর্বরীও তাই ভাবছে। বৈচিত্র্যের উচ্ছৃঙ্খলতা থাপ্পড় মারছে। ভ্যারাইটি আর নয়। শুধু বাঁচার ভাবনা। নব-সভ্যতা প্রগতিকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে। লাগামছাড়া আদিমতা থাপ্পড় মেরে জানান দিচ্ছে পরিণতি। আলেকজ্যান্ডারের আকাশচুম্বী স্বপ্ন পূর্বে এসে থমকেছিল। নেপোলিয়নের বিশ্বজয়ের নেশা চুরমার হয়ে অবশেষে সেন্ট হেলেনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। হিটলারের ইওরোপ জয়ের স্বপ্নও শেষ। কালপ্রবাহের ধারা থেকে কেউ বাদ যায়নি। রনিতও নয়। সায়ন্তনি শর্বরীও কী ছাড়া পাবে?

শর্বরী মুষড়ে পড়ল "কালকেই এলাইজা টেস্ট করাতে হবে। মরতে চাই না"

"আমিও বাঁচতে চাই"

"গড নোস ফ্রম হোয়ার হি কনট্র্যাক্টেড ইট?"

"চেনা সার্কেল নয়। মাস্ট বি হিস সাউথ-ইস্টার্ন রাঁদেভুস। ইটজ নট ইম্পরট্যান্ট হোয়ার হি কনট্র্যাক্টেড ফ্রম। হাউ মেনি হি হ্যাস ইনফেক্টেড" মুহূর্তে রনিত পর হয়ে গেল।

শর্বরী বলল "সেখানেই প্রবলেম। ইমপ্রম্পটু টেস্ট করাতে গেলে প্রবলেম হতে পারে। জানাজানি হলে সর্বনাশ। নাউ হ্যাভ টু বি সিলেক্টিভ অ্যাবাউট পার্টনার্স। দেবজিৎবাবুকে কেমন লাগল? হি ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান"

"ডেফিনিটলি হ্যাস চার্ম অফ হিস ওন। একটু অহঙ্কার আছে মনে হল"

"থাকতেই পারে। কন্সিডারিং হিজ পজিশন। আমার মনে হল না। হি ইজ ডিফারেন্ট। বাট হাউ। উইদাউট নোয়িং হিম ফারদার ডিফিকাল্ট টু জাজ"

সায়ন্তনি দেবজিৎকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি। কোথায় ছন্দের গরমিল। উপস্থিতি স্বীকার করলেও অস্বস্তি। যদি শর্বরীর আধিপত্য মানতে পারে, ওকে নয় কেন? স্বার্থ নেই বলেই কি? শর্বরীর আবেগকে আর নাড়াচাড়া করল না। এত করেছে। তাই রোজগার। বিনিময়ে না হয় একটু উষ্ণতাই। দেবজিৎ কি দিতে পারবে? আমলার টুঁটি সরকারি দপ্তরেই বাঁধা। সরকারি অনুমোদন পাওয়ানো ছাড়া আর কী-ই বা দেওয়ার ক্ষমতা?

"দেবজিৎবাবুর কথা ছাড়। ট্যান্ডন ছাড়া ফ্ল্যাটটা অন্য কোনও আর্ট ডিলারকে দিয়ে সারা বছর এক্সিবিশন করতে পারি?"

খেতে পেলে শুতে চায়। চাওয়ার শেষ নেই। শর্বরীর হঠাৎ এক্স-হাসব্যান্ড কৃষ্ণকলি বসুর কথা মনে পড়ল। পাড়ার কেষ্টদাকে বিয়ে করে একটা গ্যারেজই কিনে দিয়েছিল। আর কিছু কনট্যাক্টস। বাকিটা নিজেই করেছে। এই মেয়েটাকে ব্রেক দিয়েছে। ভবিষ্যৎও গড়ে দিতে হবে! ঝিনুকবাটি ধরে কী কাউকে কেউকেটা করা যায়? শুধু কেষ্টদা নয়, মৃদুল সেনগুপ্তকেও এভাবেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বানিয়েছে। মৃদুলদা স্বীকার করে না। বলে 'আই হ্যাড অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ হার। সো হোয়াট? সি ইনট্রোডিউসড মি টু ফিউ অফ হার ক্লায়েন্টস। দ্যাটস ইট। রেস্ট আই মেড ইট অ্যালোন'

প্রতিবাদ করেনি শর্বরী। মৃদুলদা যদি অবজ্ঞা করে খুশি হয়, হোক। তার কিচ্ছু আসে যায় না। সে স্বমহিমায়। মৃদুলদা অর নো মৃদুলদা।

শর্বরী চুপ দেখে সায়ন্তনি বলল "ইউ ডিডন্ট অ্যান্সার?"

"টু আর্লি টু কমেন্ট। লেটস সি"

স্বার্থপর এই মেয়েটাকে সহ্য হচ্ছে না। আক্ষেপ হচ্ছে, কেন এর সঙ্গে উন্মাদনা খুঁজতে গেছিল। কলকাতায় কী মেয়ের অভাব? তাও আবার শর্বরীর মতো সোশালাইটের জন্য। সব ছেড়ে কি না, এই কেলে অপদার্থ মেয়েটার মধ্যে উন্মাদনা খুঁজেছিল। যে নিজের সম্বন্ধে সিওর নয়, সে অন্যকে কী দিতে পারে। শর্বরীকেই বা কী দেবে? ঘাম মুছে উঠে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"নাউ এভরিথিং ইজ সেট। হ্যাভ টু গো। টেক কেয়ার সায়ন্তনি" ট্যান্ডনকে বলল "থ্যাংকস। হ্যাভ টু ড্যাশ অফ নাউ"

শর্বরী যাওয়ার পথে একদৃষ্টে চেয়ে সায়ন্তনি। বুঝতে পারল না, হঠাৎ কী হয়েছে? সি মাস্ট বি ওয়ারিড অ্যাট রনিতস এডস। লেট হার রিল্যাক্স উইথ এ কাপল অফ ড্রিংকস। সি উইল বি ফাইন। বাথরুমে ঢুকে হিসি। কালো মুখে আরেক প্রলেপ লিপস্টিক লাগিয়ে বেরিয়ে বলল “হাউ ইজ এভরিথিং গোয়িং মিঃ ট্যান্ডন?”

একত্রিশ

নন্দকুমারের হয়ে ডান দিকে গাড়িটা বাঁক নিতে পোস্টরগুলোর দেখে হাসি চাপতে পারল না ঐত্রিলা।

সায়ন্তনি বলল “আজও এগুলো চলে। 'দস্যি মেয়ের মালাবদল', ‘রসগোল্লার রক্তে সিঁদুরের লজ্জা'”

“রমরম করে চলে। বাংলা সিনেমার থেকেও বেশি। তফাত এখন স্বপনকুমারের মতো কেউ হেলিকপ্টারে যাত্রা করতে যায় না”

“অভয় বলত, যাত্রাতেই স্টারদের রমরমা। সিরিয়ালে কী-ই বা পায়?”

ডান দিকে কাঁথি। সোজা জাতীয় সড়ক হলদিয়ার দিকে। বাঁয়ে মহিষাদল হয়ে গেঁওখালি। কাঁথির রাস্তা জাতীয় সড়কের মতো চওড়া না হলেও মসৃণ, গর্ত প্রায় নেই। দু-ধারে সবুজ। দক্ষিণ বাংলায় উর্বর প্রকৃতির দান। তার মধ্যে তীব্র গতিতে ড্রাইভ সায়ন্তনির। স্টিয়ারিং হাতে পড়লে গতি স্বর্গ, গতি ধর্ম।

কলকাতার ঘিঞ্জিতে যা পাওয়া যায় না। মফস্সলের সবুজের আড়ালে গ্রামের চালাঘরের দাওয়ায় মুড়ি-চায়ের আন্তরিকতা। বাংলার সরল রূপ। বেরিয়ে পড়েছে ক্লান্ত দুই প্রাণ, মুক্তির আনন্দে সবুজের ব্যাপ্তিতে।

বাইরে তাকিয়ে ঐত্রিলা বলল “কী সুন্দর। তাই না?”

সায়ন্তনি হারান প্রাণ ফিরে পাচ্ছে বৈচিত্র্যের ছন্দে। ব্যথার ফাঁকে একটু আনন্দ। এই মুহূর্তে এটাই পাথেয়। ঐত্রিলার উপস্থিতিটাই বেসুরে ছন্দ “না এলে মিস্ করতাম”

কতদিন অভয়ের সঙ্গে এমনই সবুজে হারায়নি। একসঙ্গে ছুটি কাটানোর স্মৃতি। স্যুটিংয়ে মাঝে-মধ্যেই ওকে বাইরে যেতে হয়। ছুটি পেলে বাড়ি ছেড়ে বেরতে নিস্পৃহ। হলে বন্ধনটা দৃঢ় হত। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে দৈনন্দিন জীবনেই বৈচিত্র্য, স্থায়িত্ব। খোলা আকাশ মনটাকেও ভাসিয়ে দেয়। তবে স্থায়িত্বর ভিতটাই নড়ে গেছে। বন্ধুত্ব, বন্ধনের ছোঁয়া সায়ন্তনির মধ্যে। সায়ন্তনিও তো পায়নি। উন্মাদনায় রনিতের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছে দেহের খিদে মেটাতে। মনের অনুভূতি পরখ করার মানসিকতা ছিল না। উন্মাদনা থাকলেও আবেগশূন্য। দেহ ছিল, মন নয়। রনিতের খবর শোনার পর ভয়। তাকেও লুকিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। যদি ইনফেক্ট করে থাকে।

স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল “কদ্দুর?”

“কাঁথি থেকে ১৪ কিমি এগিয়ে চাউলখোলা। সেখান থেকে বাঁ দিকে”

“ড্যাশবোর্ডে ক্লাসিকের প্যাকেট আছে। একটা দাও তো”

সায়ন্তনি ড্রাইভিং হুইলে সাবলীল। খেয়াল রাখছে, হুট করে কোনও মুরগি বা ছাগল না এসে পড়ে। তাহলেই বিপত্তি। প্রচুর টাকা খসবে!

সিগারেটে ধরিয়ে বলল "তুমি খাও না?"

"কখনও খাইনি। তবে ইউজড্। অভয় খেত"

ধোঁয়াটা বাইরে ভাসিয়ে বলল "লাভ ড্রাইভিং উইথ দ্য মিউজিক"

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত" ঐত্রিলার গুনগুনানি কান এড়ায়নি।

"রবীন্দ্রনাথ ভালোবাস, তাই না?"

"ভী... ষ...ণ... ওর মধ্যেই জীবনের প্রতি মুহূর্তকে পাই"

"আমার মধ্যে নয়?"

চমকে উঠল ঐত্রিলা! রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সায়ন্তনি এল কোত্থেকে? বুঝতে পারল না। মার্কের কথা মনে পড়ল "ট্যাগোর ওয়াজ এ জিনিয়াস। নেভার সিন অ্যালাইক হিম ইন ওয়েস্ট। হি ক্যুড রাইট, স্কোর মিউজিক, পেইন্ট"

থামিয়ে ঐত্রিলা বলেছিল "অ্যান্ড থিংক অফ হিউম্যানিটি অ্যাজ এ হোল। ফিলসফার ইন ট্রুয়েস্ট সেন্স"

"উইশ আই ওয়াজ বর্ন ইন বেঙ্গল"

"ইউ উডন্ট হ্যাভ অ্যাচিভড্ দ্যাট ফার ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড"

"প্রব্যাবলি নট। বাট উড হ্যাভ ফাউন্ড মাই সোল, ইফ ওনলি আই ক্যুড রিড বেঙ্গলি"

"অ্যান্ড স্ট্রাগেল ইন্টারন্যাশনালি টু মেক ইওর মার্ক। ইন স্পাইট অফ আওয়ার স্পিরিচুয়াল ডেপথ ইটজ দ্য অ্যাংলো-স্যাক্সনস হু রান দ্য শো"

"টু সাম এক্সটেন্ট, ইয়েস"

ভালো লেগেছিল ঐত্রিলার স্পষ্টবাদিতা। অন্যরা হলে সাদা চামড়াকে তেল দিতেই তাল দিত। সি চোজ টু রিমেন ইন হার কনভিকশন, উইথ ওন ডিগনিটি। ইট ওয়াজ স্লোলি কার্ভিং টু রেসপেক্ট। ফর বেঙ্গল অ্যান্ড ঐত্রিলা।

"অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ কান্ট হ্যাভ ইট অল। ইউ উইন সামহোয়ার, লুজ এলসহোয়ার। ইকুয়েশন ইজ দ্য সেম। ইউ ওয়ন মেটিরিয়ালিস্টিক্যালি। উই স্পিরিচুয়ালি। স্কোরস ইভেন"

ঐত্রিলা জবাব না দিয়ে বাইরের সবুজের দিকে তাকিয়ে। চাউলখোলা থেকে রাস্তাটা ভালো নয়। সায়ন্তনির সুইফট গাড়ির ঝাঁকুনি বুঝিয়ে দিচ্ছে বাংলা আবার নিজ রূপে। এক কিমি পার হতে দশ মিনিট। ঝাঁকুনিতে

পেটে খিল ধরে যায়।

ক্রসিংয়ে পৌঁছে ঐত্রিলা বলল "সোজা। আগে বাঁ দিক দিয়ে সমুদ্র ঘেঁষে যেতে হত। এখন নতুন রাস্তা হয়েছে"

হোটেলগুলোর পেছন দিয়ে সমুদ্র পাড়ে পৌঁছতেই প্রশস্ত বিচ। ঢেউ পাড়ে এসে শিথিল। সূর্যের আলো নীলের মাঝে মুক্তো ছাড়াচ্ছে। দূরে একটা স্থির জাহাজ পাহারা দিচ্ছে আশ্রমের প্রহরীর মতো। ঐত্রিলা যদি দিগন্ত বিস্তৃত নীলে হারাতে পারত, সীমাহীনতায় অভয় সেনের ক্ষতটা জুড়ত। সস্তা লাগছে নিজেকে। অভয় সেন চাইল, বিয়ে হল। আবার যখন চাইল না, ভেঙে গেল। নারী স্বাধীনতার গালভরা বুলির মধ্যেও আস্তাকুড়ে। এতদিন স্বামী কন্যা সংসার পৃথিবী। এখন সময় হয়েছে নিজের মতো করে স্বাবলম্বী হওয়ার।

আগে রোজ ভ্যালি নাম ছিল। পঞ্জি স্ক্যামে নতুন নাম সান সিটি রিসর্ট। খারাপ নয়। দোতালার বারান্দা থেকেই সমুদ্র। সায়ন্তনি সানা বিচে চাইলেও সমুদ্র দেখা যায় না বলে ঐত্রিলা সায় দেয়েনি। সমুদ্রপাড়ে, যদি সমুদ্রই দেখা না গেল, তাহলে আসা কেন?

বাতাসে সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ থেকেই ভাসছে। ছোটবেলার হারানো গন্ধটা ফিরে পাচ্ছে। লালমাটি ভেজা শালফুলের গন্ধমাখা বর্ষা। সামনে চিরনতুন সাগর। চাঁদের আলোয় সাগরবেলার অদ্ভুত মায়াময় রূপ এই জগতের বাইরে নিয়ে গেছে ঐত্রিলাকে। সাদা বালি এখন আর ঠিক সাদা নয়। একটু ছাইরঙা রুপোলি। ঝলমলিয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়। দূরে কিছু লোকের আবছায়া সিল্যুয়েট। মন্দারমণির বিচে স্ট্রল করছে। ডান দিকে শঙ্করপুর। বাঁয়ে হলদি নদী পেরলেই নন্দীগ্রাম। মাঝে সাগরের ওপর আশ্চর্য রঙের খেলা। জীবন্ত। উঠছে পড়ছে নাচছে। ঢেউগুলো দামাল। চাঁদের কুচি গায়ে মেখে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। কাড়াকাড়ি করছে চাঁদের টুকরোগুলো নিয়ে। মাঝেমাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে।

বারান্দায় বসে মুগ্ধ ঐত্রিলা। এই কী পূর্ণ?

পুরনো ব্যথা মুচড়ে উঠছে। কীসের জানে না। অভয় সেন ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ নয়। গোপনে সিন্দুকে রাখা অতীতের অনুভূতি। কীসের ব্যথা? সাফল্য, ব্যর্থতা, একাকিত্ব? নাকি, মিঠে ব্যথার হাত ধরে এই একাকিত্বে নিজেকে নতুন করে পাওয়া। একবার মার্কের দাড়িওয়ালা মুখটা ভেসে উঠল। তারপর দাদুর। দাদুর পাশে খাটের ওপর পা দুলিয়ে তক্তি-নাড়ু খাওয়া। দাদুর মুখে বহুদিন আগে শোনা শ্লোকঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।।

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোয় মার্কের মুখ? কাজের সূত্রের বাইরে তার জীবনের সঙ্গে কোনও মিল নেই। কেমন করে মেলাবে দাদুর শ্লোকের সঙ্গে?

ভডকা কোক মিশিয়ে দিব্যি তাড়াতাড়ি গিলছে সায়ন্তনি। সামলাতে পারবে তো? সায়ন্তনি এখন জিনস-টপসে। উপচে পড়ছে উদ্ধত যৌবন। টপসের ফাঁক দিয়ে স্তন ঝলসাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে তাকাল মুখের দিকে। এত কাছ থেকে ওকে দেখেনি। পুরুষালি। পশ্চিমি সাজের উগ্র আধুনিকতা। সালোয়ার কামিজে ঐত্রিলার অবয়বটা বেমানান। ওর মুখের রুক্ষতায় অতৃপ্তির ছোঁয়া। তা তো ঐত্রিলারও। উগ্রতা ছাড়া দৃঢ়তা বাইরে প্রকাশ পায় না।

হেসে বলল "পুরো বোতলটাই আজ রাতে শেষ করবে?"

"করতেও পারি। দারুণ আনন্দ হচ্ছে"

শেষমেশ বমি না করে। হ্যাপা তার-ই। এই প্রথম, দেহের বাইরে অন্য কিছু পেয়েছে। রনিত, ট্যানিয়া, সুলগ্নার সঙ্গে দৈহিক আকর্ষণ ছিল। ঐত্রিলার শরীর টানছে না। সান্নিধ্য, নমনীয়তা? আগে দম্ভ, ঔদ্ধত্যে ভরা বুভুক্ষু নারীদেহে পুরুষ। এই প্রথম আবিষ্কার করেছে তার নারীত্বকে।

হকচকিয়ে ঐত্রিলা বলল "বেশি খেলে আনন্দটাই মাটি"

"তা বলে খাব না? আজ তো প্রাণ ভরে খাব"

সায়ন্তনি চৌকির ওপর পা তুলে দিয়েছে। খয়রি ট্রাউজারে ধুলো লাগলেও বোঝার উপায় নেই। হাতকাটা সাদা টপসের ফাঁক দিয়ে বসন্তের হাওয়া খেলে যাচ্ছে। প্রসাধনহীন মুখে কালো অবয়ব প্রকট। ঐত্রিলাও কলেজ জীবনে ট্রাউজার টপস পরত। অভয় আজও বলবে না ওকে উগ্র লাগত। চেহারা না মানসিকতায়, চলন-বলনে।

সায়ন্তনি জিজ্ঞেস করল "তোমার ভালো লাগছে না?"

"লাগছে বৈকি"

ভালোলাগাটা সান্নিধ্যের জন্য নয়। প্রকৃতির মধ্যে মেলে দেওয়ায়, সমুদ্রের ঘ্রাণে। ভডকায় অভয় সেনকে ভোলা। চোখ বুজল। অনুভব করছে নিজেকে। সামনে শূন্যতা, কোথাও পূর্ণতার স্বাদ। অভয়ের মুখ ভাসছে না। তাই তো চেয়েছিল। সায়ন্তনির মুখে আগ্রহ নেই। মেয়ের মুখ তো মনের কোণে খোদাই। ছোপ দাড়ি ভেসে মিলিয়ে গেল। মার্ক কী তার অস্তিত্বে থাকতে পারে? তবুও ওর খয়রি দাড়ি কেন বারবার ভাসছে? আগে কতবার দেখা হয়েছে। এভাবে কখনও ভাবেনি। আজ অভয় সেন নেই বলেই... মানুষটা বন্ধন ছেড়ে পাখা মেলেছে সমুদ্রপাড়ের হাওয়ায়। ঠাই খুঁজলেও, মার্কের সঙ্গে মেলাতে পারছে না।

"পট্যাটো চিপসের প্যাকেট তোমার ব্যাগে?" সায়ন্তনির কথায় ঘোর কাটল।

"হ্যাঁ। বাঁ দিকের খাপে" সায়ন্তনি চিপস আনতে চলে গেল।

আবার চোখ বুজল। বুঝতে পারছে না, বারবার মার্কের ছবি কেন? ভালোলাগা? যা এতদিন অনুভব করেনি। কলকাতার বাইরে সমুদ্রপাড়ে অবচেতনের ঘোরটা আত্মপ্রকাশ করছে। হয়ত ঠিক নয়। বিদেশি হতে পারে, কিন্তু সায়ন্তনির থেকে বাঙালি সংস্কৃতি বেশি বোঝে।

চিপসগুলো প্লেটে ঢেলে বলল "এভাবেই দুজনে বেরিয়ে পড়ব। তোমারও কেউ নেই, আমারও। একেবারে ঝাড়া হাত-পা"

অরণিকে লং টার্ম কেয়ারে গ্যারেজ করে, শর্বরীর উষ্ণতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে, রোজগারের পথ তৈরিতে নিশ্চিন্ত। রনিতের এডসের পর শর্বরীও জৈবিক ক্ষুধা থেকে সরে এসেছে। মানে রোজগারের পথ ছাড়া ইচ্ছে থাকলেও আর কিছু চাইতে পারবে না। সেদিনের শর্বরীর ব্যবহারে স্পষ্ট। ভয়, বাঁচার অবলম্বনের জন্য ঐত্রিলা। ভডকায় চুমুক। আরেকটা সিগারেট।

"কখনও সিগারেট খাওনি?"

"না। ইচ্ছে করেনি" ঐত্রিলা নিস্পৃহ।

"আগে বেশি খেতাম না। অরণির গন্ডগোলের পর থেকে বেড়ে গেছে। তোমার আপত্তি নেই তো?"

ঐত্রিলা হাসল "ইচ্ছে হলে খাবে। আমার কী বলার আছে?"

"অনেকে তো পছন্দ করে না"

"আমার কোনও প্রেজুডিস নেই" ঐত্রিলা চিপস্ তুলে নিল।

"কোকটা দেবে?"

গ্লাসটা শেষ করে আবার ভডকা ঢালছে। মরুক-গে। যত ইচ্ছে খাক। বমি করে ঘর না ভাসালেই হল।

ধোঁয়া ছেড়ে বলল "এতদিন কিছুই পাইনি। আজ অনেক কিছু পেয়ে গেছি। তাই সেলিব্রেশন"

"কী পেলে?"

"মন। ভালোবাসা। বাঁচার মন্ত্র"

নেশা জমে গেছে। মন্দারমণিপুরের বালুতটের চাঁদের আলোয় কী করে পেয়ে গেল? যা কলকাতা দিতে পারেনি। প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ করে গেল। সিডি প্লেয়ারটা থাকলে ভালো হত। যখন নেই, অন্ধকারে সমুদ্রের গর্জন-ই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক।

সায়ন্তনি সেদিকে তাকিয়ে বলল "আই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য এসেন্স অফ লাইফ। মাই লাভ"

ঐত্রিলা উত্তর দিল না। সন্দেহ হচ্ছে। নেশার ঘোরে বলছে, না মনের কথা? কোনও পুরুষের নাম তো বলেনি। না অন্য কিছু? মনে হতেই ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা। পুরুষহীন নারী কি বড় একা। যে কেউ ইঙ্গিত করতে পারে। তখনই মার্কের মুখটা আবার...

সায়ন্তনি ঐত্রিলার দিকে ফিরে বলল "ইয়েস। আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই লাভ। ইউ আর মাই লাভ। আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?"

চমকে উঠল। ভাবতেও পারেনি, বেড়াতে এসে এই বিপত্তি। আজ রাত ওর সঙ্গে এক-ই ঘরে। কী করবে? আর একটু খেলেই সায়ন্তনির চিন্তাধারা গুলিয়ে যাবে। আজকের কথাও ভুলে যাবে। কাল ঝরঝরে দিনের আলোয় এই আবেগ অবশিষ্ট থাকবে না। এক রাতের উন্মাদনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু যদি সত্যি হয়?

অন্ধকার আকাশে রক্তিম মেঘ। ওর দিকে না তাকিয়ে বলল "আমরা সবাই একা। একাই বাঁচতে হবে"

অন্ধকারকে ভরিয়ে কথা থামাতে গেয়ে উঠলঃ

মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই

সাগর বলে, পূর্নিমেতে, আমি তো আর নাই

কথাটা চাপা পড়ে গেলেও বুকভরা ভয় নিয়ে ফিরেছিল, আর নয়। এসব স্বল্প পরিচিত মহিলাদের সঙ্গে অবকাশ কাটানোর মানেই হয় না। এবার তাকেও পাথেয় খুঁজে নিতে হবে। যদি তাই হয়, তা কোনও পুরুষের হাত ধরেও।

বত্রিশ

গাঁজাওয়ালা বলল "উতনা দূর কেউ। নসদিক আও বেটি"

মনোলীনা গাঁজাওয়ালার কাছে সরে এল। আজ তার অগ্নিপরীক্ষা। গাঁজাওয়ালকে খুশি করতে পারলে সিনেমায় ব্রেক। সিরিয়ালে ক্লান্ত। অর্থহীন সংলাপ। দিনে তিন-চারটে এপিসোড স্যুট করালে রোজগারে ভাটা। এরা ব্যবসাদার। জানে, কম খরচে কাজ উশুল করতে। পেমেন্ট আট ঘণ্টা কাজের। থাকতে হবে। যতটা উসুল করা যায়। স্টুডিওতে গুলতানি নয়ত কাজ। আগে ফিতে কেটে কামানোর স্কোপ ছিল। এখন কেউকেটা না হলে পাতি সিরিয়াল অ্যাকট্রেসকে কেউ ডাকে না। যে ভাবেই হোক সিনেমার হিরোইন হতে হবে। তবে তো উপরি। ছবি হিট করলে কথাই নেই। কয়েক লাখ। মাস-মাইনের থেকে রোজগার, গ্ল্যামার অনেক।

অভয় এখানে আসার কথা জানে না। জানলে বাধা দিত। লাইনের খেলা ভালোই জানে। অভয়ের মুখ চেয়ে ঘেমো ভ্যাপসা গরমে স্বপ্লেতে হাপিয়া উঠেছে। ওর হাত ধরে হবে না। জিততে হবে, এগোতে হবে। অভয় ফিল্ম লাইনে কিছু করে দিতে পারবে না, নিজেয়েই যখন পারেনি। সিরিয়ালেই ওর যা কন্ট্যাক্ট। তাতে না সেলিব্রিটি, না বাজার দাম। চাকরির মন্দায় জুনিয়াররা বাজার ছেয়ে দিয়েছে। বেশি চাইলে ঘাড় ধাক্কা। সিরিয়াল চরিত্রের ওপর চলে না। উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক নয়। রিপ্লেসমেণ্ট মজুত।

গাঁজাওয়ালার পাশে বসতেই আঁতকে উঠল "ইধর নেহি, সামনে। কাঁহা হো লক্ষ্মীচরণ। একঠ টেপ লানা"

ঘাবড়ে গেল। টেপ চাইছে কেন? কম তো মানুষ দেখল না। মানুষ দেখতে এখানে আসেনি। ভুঁড়িওয়ালা গাঁজাওয়ালাকে পুরুষ বলে ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। অভয়ই সুপুরুষ। দেহসৌষ্ঠবে শুধু নয়। চলনে-বলনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তাধারায় অন্য। হিরো হল না কেন? এখন অবশ্য বয়স পার হয়ে গেছে। হলিউডের সঙ্গে টলিউডের এখানেই তফাত। সন কনরি, ক্লিন্ট ইস্টউড, রবার্ট রেডফোর্ড, রিচার্ড গিয়ারদের নিয়ে চিত্রনাট্য হয়। হিরো না হলেও গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। বলিউডেও অমিতাভ বচ্চন। দক্ষিণের টোকা গল্পে সময় কোথায় স্ক্রিপ্ট, চরিত্র নিয়ে ভাবার।

সংসারি অভয়ের প্রতি বরাবরই মোহ। সাহস পায়েনি। স্যুটিংয়ের ফাঁকে উন্নাসিকও। শিক্ষিত লোক তো ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি নেই। বুদ্ধিমানও। প্রডিউসাররা পরামর্শ নেয়। অঙ্ক কষেও দেয়। তাই আধিপত্য। দেহে মজার নয় ভালোই জানে। তাই এগোয়েনি।

স্যুটিং ফ্লোরে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল "অভয়দা, মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছ?"

হঠাত এরকম প্রশ্নে আবাক। আজকালকার মেয়ে। মধুসূদনের নাম জানে কি না সন্দেহ “কেন পড়ব না? হঠাৎ মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে কেন?”

“কাল রাতে পড়ছিলাম”

হেসে বলেছিল “আমাদের যুগে এসব পড়তাম। তোমাদের জেনারেশন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না”

“তাইতো এপিক সৃষ্টি করতে পরল না”

“গিন্নিদের ফ্যাঁচফ্যাঁচে গল্প দাও। ওটাই খায়। এপিক শুনিয়ে কী লাভ?”

মনোলীনা ইলিয়ড-ওডেসি পড়েছে কি না সন্দেহ। রামায়ন-মহাভারত সিরিয়ালে দেখে থাকতে পারে। সে কি না মেঘনাবধকাব্য পড়ছে! হয়ত যেটুকু দেখেছে, ভুল। সাংস্কৃতিক দিকটা সিরিয়ালে চাপা।

“বিদ্যাপতি পড়েছ?”

“হ্যাঁ...

এ সখী হামারি দুঃখেরো নাই ওর

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর

কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া

মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকি ফাটি যাওত ছাতিয়া”

আবাক হল। আগে গুরুত্ব দেয়নি। মেয়েটার অনেক কিছুই অজানা। সিরিয়ালের অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। আগে যখন নেমতন্ন খায়িয়েছে মনে তো হয়নি। ওর ভাগ্য ভালো। বিদ্যাপতির লাইন কটা সিরিয়ালের ডায়লগের মতো মুখস্ত করে বমি করল। বিদ্যাপতি পড়া ওর ধাতে নেই। রনিতের বাড়িতে, ওর ঠোঁটে শর্বরী চুমু খেয়ে বলেছিল “সব খেলারই উদ্দেশ্য আছে”। হ্যাঁ, সব খেলারই একটা উদ্দেশ্য আছে - মনের বা জীবনের। কথাটা হজম করেছিল। যে দেবতার যা পুজা। শিক্ষিত রুচিবান সুপুরুষ অভয় সেন নারী দেহে মজবে না ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে। তবুও মজাতে হবেই। প্রডিউসারদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার চেয়ে অভয়কে হাত করা ভালো। ওর দৌলতে বিনা দেহব্যয় প্রডিউসার পকেটে।

“তুমি বিদ্যাপতি পড়েছ?”

“রোজ বস্তাপচা সিরিয়াল করি বলে কি অন্য ইন্টারেস্ট থাকতে নেই”

“বুঝতে পারিনি”

বুঝতে পারনি। এবার পারছ তো। মাছ তাহলে জালে ফাঁসছে। মনোময়, ট্যানিয়া, শর্বরী রনিতের খেলায়, দেহের উন্মাদনা থাকলেও জীবনের নেই। সময় হয়েছে জীবনের খেলার। অভয়ের বিছানায় উরু ফাঁক করে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। জলপ্রপাতের শেষে তন্দ্রা এলেও ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। এখনও অনেক চলা বাকি। তা পাঁচুদার হাত ধরে গাঁজাওয়ালার আলিপুরের বাড়িতে। এখানেই চিত্রতারকা হওয়ার ভবিষ্যৎ।

মনোলীনার বোধগম্য হল না টেপ কেন? মালিক যা চায় লক্ষ্মীচরণ তাই কর ছে। তাকেও করতে হবে। আর কেউ এখানে থাকে? লক্ষ্মীচরণ ছাড়া কাউকে দেখেনি। ওপাশের ঘরে আলো। বিশাল দৈর্ঘের শ্যামলা, টাক ভর্তি গাঁজাওয়ালা, থ্রি-সিটার সোফা জুড়ে। মুখটা দেহ আন্দাজে ছোট। চোখটা মুখে ডুবে।

মনে পড়ল ছোটবেলার স্বপ্ন। রিচার্ড গিয়ারের মতো স্বামী। কলেজ জীবনে বাবা সম্বন্ধ এনেছিল। পাত্র রিচার্ড গিয়ার না হলেও মোটামুটি খারাপ দেখতে নয়। 'রি' অক্ষরেই নাম। রিতাংশু সেন।

মিষ্টি মুখে পুরে জিজ্ঞেস করেছিল "স্যান হোসেতে গিয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না তো?"

মাথা নেড়েছিল। পরেও বেশ কয়েকবার এসেছে। অনুমতি নিয়েই গল্প করেছে। বিয়েতে দোনা-মনা থাকলেও বাবার নির্দেশে ভালোভাবেই মিশেছে। সুপুরুষের সঙ্গে লাইসেন্সড্ মেশার এমন সুযোগ আসেনা। বিয়ে প্রায় ঠিক। মা পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স থেকে গয়নাও কিনছিল। মেয়ে তো। সাজিয়ে-গুছিয়ে বিদায় দিতে হবে।

একদিন হন্তদন্ত বাবা ঘরে ঢুকল "চিন্তায় পড়লাম। রজতের পিসি খবর এনেছে রিতাংশু নাকি কোন মহিলার সঙ্গে থাকে"

"বিয়ের আগে বিদেশ-বিভুঁয়ে ওরকম দু-একটা মেয়ে বন্ধু থাকতেই পারে" মা হীরের টুকরো সুপুরুষ আমেরিকায় প্রবাসী পাত্রকে হাতছাড়া করতে চায়নি।

বাবা আপত্তি জানিয়েছিল "মেয়ে বন্ধু নয়। একসঙ্গে থাকে"

"বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনো আমার রূপেগুণে লক্ষ্মী। ঠিক সামলে নেবে"

এত ভালো পাত্র হাতছাড়া করতে চায়নি। তবুও মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারে না। মা মনের অবস্থা আঁচ করে বলেছিল "ভালো করে খবর নাও। খবরটা ভুলও হতে পারে"

মনোলীনাকে ডেকে শার্টটা আলনায় ঝুলিয়ে বলেছিল "বিয়ে করবি?"

স্বপ্নের রাজপুত্তুর হাতছাড়া করতে চায়েনি। অন্যদিকে ভয়। বিদেশিনীর সঙ্গে ওখানে একলা কী করে পাঙ্গা লড়বে? ইচ্ছে থাকলেও সাহস পায়নি। স্কুলের বন্ধু মিতার কথা মনে হতেই শিউরে উঠল। ইংল্যান্ডের গ্রিমসবিতে চোখের ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর ওকে নেয় না। শেষমেষ ওর বাবাই পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্রিমসবিতে। সেখানে স্বামীর সঙ্গেক এক বিবস্ত্র শ্বেতাঙ্গিকে দেখে আবাক।

মিতাকে ধাতানি দিয়েছিল "না জানিয়ে হুট করে চলে এলে?"

"বাবাই টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিল। বউ তো"

"তোমাকে বউ বলে মানি না" শ্বেতাঙ্গির গলা জড়িয়ে বলেছিল "জেনি ইস মাই ওয়াইফ"

পৃথিবীটা ভেঙে পড়েছিল। বিবেক সংস্কারের আশ্রয়ে বলেছিল "অগ্নিসাক্ষী করা বউ"

“বিয়েটা মানি না। এই মুহূর্তে ভেঙে দিলাম” জেনিকে নিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছিল।

মিতার সে কি অবস্থা। বিদেশে স্বামী পরিত্যাগ করেছে। বাবার দেওয়া কিছু পাউন্ড সম্বল। রিটার্ন টিকিটও নেই।। ওদেশে আইডেন্টিটিও নেই। হারিয়েই যেত যদি না ডক্টরস্ কোয়ার্টরের সুপারভাইজার সহায় হত “ডোন্ট ওয়ারি মাই গার্ল। ইউ ক্যান স্টে ইন দিজ কোয়ার্টার আন্টিল ইউ সর্ট সামথিং আউট”

গ্রিমসবি হাসপাতালে ফ্লেবটমিস্ট। স্কানথর্পে বাচ্চাদের স্কুলে পড়ান। মিতা এখন ক্রলিতে ফ্ল্যাটও কিনেছে। বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই। শুনেছে নাইজেরিয়ান ডাক্তারকে বিয়ে করে অ্যামেরিকাতে। মনে হতেই ভয়ে কুঁকড়ে গেছিল। মিতার মতো ওর মনের জোর নেই। এত ধকল সামলাতে পারবে না।

“না বাবা থাক। ঝুটঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই”

“পাত্র হিসেবে কিন্তু ভালো”

“ঘর না হলে পাত্র দিয়ে কী হবে? না বাবা। ওখানে বিয়ে করব না। বলে দাও আমি রাজি নই”

গাঁজাওয়ালার সামনে মনে হল তখন কী ঝুঁকি নিলে ভালো হত? জীবনটাই ঝুঁকি। ফাটকাবাজির খেলা। মিতার যা হয়েছে, মনোলীনার নাও হতে পারত। জীবনটা অন্যরকমও হতে পারত। অতশত ভেবে কী হবে? যা আছে তার মধ্যেই করে নিতে হবে। শর্বরীর কথাটাই ঠিক 'সব খেলারই উদ্দেশ্য আছে’। মনোলীনারও উদ্দেশ্য এখন এটাই। অভয় সেন স্যুটিংয়ে ব্যাংকক। এই ফাঁকেই গুছিয়ে নিতে হবে ভবিষ্যৎ সিনেমা নামার স্বপ্ন।

টেপ হাতে গাঁজাওয়ালা “ইধর আও। হামারে সামনে”

কথামতো সামনে। মাথায় ঢুকছে না টেপ দিয়ে কী করবে? হুইস্কির গ্লাসটা টেবলে রেখে, টেপ দিয়ে ওর পেটের দৈর্ঘ্য মাপল। মাপুক। রোলটা চাই। বাংলা ছবির হিরোইন।

পেট, বুক, পাছা মাপা হল। ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স মাপা “বহৎ দুবলা”

রোলটা কী তবে হবে না? ঘাবড়ে গেল “বোলিয়ে তো য্যাদা খাকে ওয়েট গেন কর সকতা”

“নেহি, নেহি, উসকা জরতরৎ নে। মেরে পুরানা রেওয়াজ। হর লড়কি কো পহলে মাপ লেতা হুঁ”

হিরোইন হতে গেলে মুখ, দেহের প্রোফাইল অনেকে দেখতে চায়। এর আগে শোনেনি প্রডিউসার টেপ দিয়ে মাপঝোক করে। সাহস সঞ্চয় করে বলল “ফির ঠিক হুঁ?”

“কাপড়া পহেনে কয়েসে বলু?”

“পুরা মাপ লিজিয়ে। ফির বোলিয়ে অগলি ফিল্মকে লিয়ে কাফি ইয়া নেহি”

জেনেই এসেছে। শাড়িটা খুলে ফেলল। খয়রি সায়া, ব্লাউজ সোফায়। সাদা ব্রাও।

"কুছ নেহি হ্যায়। পাঁচু বোলা লড়কি খুবসুরৎ। হামকো দিখা কর কেয়া হোগা? ম্যায় তো রোজ লড়কি দেখতা। পাবলিক কো দিখা সাকোগে?"

"কেউ নেহি?"

বীতশ্রদ্ধ গাঁজাওয়ালা বলল "তুমহারা ছোটা নিপল দেখ্ কর কেয়া হোগা? কুছ নেহি। পাবলিককো দিখাও, অগর দেখে। হামারা কামাই উসি মে"

কী চাইছে? পাবলিকের সামনে উলঙ্গ নৃত্য? গোখেলের স্নাতকের রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। হিরোইন হতে চায়। আনকুত লোকটার সঙ্গে শুতেও রাজি। রুপোলী পর্দায় বিবস্ত্র নৃত্য করতে হবে কেন? যতই মুনাফা দিক। রাগে গা'টা রিরি করছে। মাংসের দোকানে বসারও সীমা আছে। উলঙ্গ মনোলীনা উল্টোদিকে।

হুইস্কিতে চুমুক দিল "লক্ষ্মীচরণ, বেটিকে লিয়ে একঠো বনাও"

লিকলিকে বিবস্ত্র দেহকে পরখ করল "পাঁচু বোলাথা লড়কি জবরদস্ত। সিরিফ হামে খুস করনে সে নেহি চলেগা, পাবলিক কো ভি। নেহি তো কেও রূপয়ে ফেঁকেগা?" ওর নারীত্বে আঘাত।

রাগে বাকর্ডিতে চুমুক। অভিনেত্রী সুলভ হাসি "ইসসে পাবলিক খুস নেহি হোগা? একবার মৌকা তো দিজিয়ে"

কোন জুয়াটা শ্রেয় - রিতাংশু সেনের অ্যামেরিকান বান্ধবীর সঙ্গে লড়া না এই লোকটাকে বাগে আনা? দুটোই জুয়া, হারজিতের খেলা। পরিণাম অজানা। হারজিৎ খেলার নিলামে। নিজেকে চড়িয়েছে দাঁওতে। কোথায় লাগে জানে না। শুধু জানে মাংসের হাটে পণ্য। জিতের খেলা কী শুধুই দেহ বিক্রি? সেটাতেও প্রস্তুত। কিন্তু শুধু গাঁজাওয়ালা নয়। বিবস্ত্র হয়ে বাজারে না নামলেই কী হার?

অকে বাকার্ডির নেশায় ফেলে গাঁজাওয়ালা বাথরুমে "পিও, জী ভরকে পিও। পিসাব করকে আতা হুঁ"

ভাবছে গাঁজাওয়ালার কাছে সমর্পণ, না প্রস্থান। বাথরুম থেকে ফিরে দেখল শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ পরে ফেলেছে। চুল আচড়াচ্ছে। আবাক তাকিয়ে "কেয়া হুয়া? কাপড়া পহেন লিয়া?"

শ্লেষ মেশানো সুরে মনোলীনা বলল "তো কেয়া করু? আপ তো নেহি লোঙ্গে। ফির ইধর কেও?"

"লেনা ইয়া নেহি লেনা, ও বাদ কি বাৎ। বৈঠো, দারু পিও, মস্তি কর"

"ফোকট মে মস্তি নেহি। কাম কে বাৎ কিজিয়ে"

ঘাবড়ে গেল গাঁজাওয়ালা। অনেক মেয়ে নিয়ে খেলেছে। এমন দেমাক আগে দেখেনি। আগে কাজকম্ম হোক, চেখে দেখা যাক, তারপর তো কাজের কথা। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে "রাত অভি বহত বাকি। জলদি কেয়া?"

মনোলীনার ভেতরের নারীটা জেগে উঠেছে। চিরুনিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে “আপকো খুস করনা মেরি জিমেদারি। খুস করনে চান্স মিলেগা?”

দেমাক দেখে জ্বলে উঠল। জাত ব্যবসাদার। কাজ না করেই ফল চাইছে। সাহস তো কম নয় “উতনা ছোটা লেকর পাবলিক কো কেয়া দোগে? পহেলে প্লাস্টিক সার্জেন সে বড়া করা লাও, ফির তুমহারে পিছে রূপয়ে ডালনে কা ইরাদা হোগা”

রাগে সারা দেহ জ্বলেছে। চটি পড়ে গাঁজাওয়ালাকে কটাক্ষ “ঢুর লাইয়ে আউর একঠো মিলি সাওয়ন্ত। মুঝে ফিল্ম নেহি চহিয়ে”

হিংস্র বাঘের মতো ক্ষেপে ঢকঢক পুরো হুইস্কি গিলে ফেলল “জিধর খুস যাও। ইয়াদ রখনা, ইয়ে ইন্ডাস্ট্রি মে তুমহারে লিয়ে কোই জগাহ নেহি”

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনে হল, হারজিতের খেলায়, সে আর নিজেকে বিক্রি করবে না। শর্বরীই ঠিক। এবার থেকে, শুধু একটাই খেলা। জেতার। সে খেলবে কারও হাত না ধরেই।

তেত্রিশ

ডায়াসে দেবজিৎ গম্ভীর স্বরে বলে যাচ্ছে "ইন দিস এজ অফ গ্লোবালাইজেশন..."

ঐত্রিলাই দেবজিৎকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ন্যাশনাল চেম্বারে লেকচার দিতে। ওর সেক্রেটারি মিঃ বিশ্বাসকে ফোন করে বলল "ওনার সঙ্গে যদি দেখা করা যায়"

"একটু ধরুন... কাল দুপুর দেড়টায়। ঐত্রিলা সেন? নীচে সিকিউরিটিকে বলা থাকবে"

দেড়টায় ঘরে ঢুকতেই চেয়ারে ইঙ্গিত "টপিকটা কী?"

"ইকনমিক ফিউচার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল"

"কতক্ষণ বলতে হবে?"

"আধ ঘণ্টা থেকে পয়াতাল্লিশ মিনিট"

"ফাইন। সেক্রেটারির কাছে ডিটেলস রেখে যান। উইল বি দেয়ার" ঐত্রিলার মনে হয়েছিল মুখ্য আমলা এইটুকু যে কথা বলেছে, তাই যথেষ্ট।

দেবজিৎ আড়ম্বরহীনভাবে বলছে "ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ হেডিং টুওয়ার্ডস্ গ্লোবালাইজেশন। মাল্টি ন্যাশনালদের ইনভেস্টমেন্ট, ইকনমিক গ্রোথ হচ্ছে। বাট এভরি প্রগ্রেস হ্যাস গট ইটস্ নেগেটিভ এফেক্টস্। উইথ দ্য মাল্টি ন্যাশনলস্ ইন, দ্য কমনার উইল বি নো হোয়ার। দ্য মোস্ট পোটেন্ট কম্পিটেন্ট নাউ ইন ওবলিভিয়ন উইল কাম টু দ্য ফোরফ্রন্ট। দেয়ার উইল বি অ্যান ইনক্রিজ ইন দেয়ার টেকহোম পে প্যাটার্ন ডিপেন্ডিং অন দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি। দেয়ার এক্সপার্টাইজ উইল বি সোল্ড ইন দ্য ইন্টারন্যাশনল মার্কেট অ্যাট অ্যান ইন্টারন্যাশনল প্রাইস। উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন ইকনমি বেসড অন দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি দেয়ার উইল বি এ কম্প্রিহেন্সিভ সোসিও-ইকনমিক অ্যান্ড কালচারাল আপলিফটমেন্ট। ইন দ্যাট প্রসেস, দ্য ল্যান্ড উইল বি সোল্ড আওয়ে টু দ্য মাল্টিন্যাশনালস্। জাস্ট লাইক দ্য ব্রিটিশ কংকার্ড ইন্ডিয়া ইন দ্য নেম অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি"

দেবজিৎ নিশ্চয়ই জানে কী বলছে। নইলে এত কনফিডেন্ট কী করে?সাংঘাতিক সত্য। বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না। সেটা যদি সত্যি হয়, ভাববার বিষয়। প্রগতির মুখে অবশ্যম্ভাবীটাকে তুলে ধরছে। পরিণতিটা ভাবো। অন্ধের মতো বিদেশি অনুকরণ নয়। প্রগতির, উন্নতির পথ, আদৌ নাও হতে পারে। বিক্রি হওয়ার সহজ কিস্তি।

লেকচার শেষ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। দেবজিৎ জবাব দিচ্ছে। ঐত্রিলার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, উন্নতিটা কোথায়? উত্তরটা তো দিল না। বার করতে হবে। কনফারেন্স রুমের বাইরে লাঞ্চ। দেবজিৎ মাংসে কামড় দিতেই ঐত্রিলা বলল "কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"ওহঃ আপনি!" ওকে আপাদমস্তক দেখল। সিল্কের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। বিনুনি করা চুল। হাল্কা লিপস্টিক "নিশ্চয়ই পারেন"

"আপনি বললেন প্রগ্রেসের সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি। রিয়েল প্রগ্রেস কোথায়?"

"আপনার মধ্যেই" দেবজিৎ সাবলীল "আপনারা ইকনমিস্ট। ইকনমির অঙ্কে বিচার করেন। আমি আমার মনের ইকনমি জানি"

"ঠিক বুঝলাম না"

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদদেবানু গ্রহহেতুকম।

মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।"

অবাক! ন্যাশনাল চেম্বারে সংস্কৃত শ্লোক। বুঝতেও পারছে না "আমি সংস্কৃত বুঝি না"

দাঁত দিয়ে হাড় থেকে মাংসটা ছাড়িয়ে বলল "শ্লোকটা আদি শঙ্করাচার্যর। বিবেকচূড়ামণি থেকে। মানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তি, সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আগ্রহ, জ্ঞানী সদগুরুর আশ্রয় লাভ, তিনটেই দুর্লভ"

"তাহলে ঈশ্বর ছাড়া কী কোনও প্রগতি নেই?"

"কোনওদিনও ছিল না। আজও নেই। পরেও হতে পারে না। মিথ্যে আস্ফালন ছাড়া। লেকচার দিতে বললেন। যা মনে হয় বলে দিলাম। প্রগতি নামক ব্যাঞ্জনার মানসিক আভরণ। সত্যি কোনও প্রগতি নেই। শুধু দু-দিনের হারজিত"

"আমরা যে এত মিটিং করছি, খবরের কাগজে ফলাও করে বেরচ্ছে, সবই মিথ্যে?"

"মিথ্যে নয়, জীবিকা। এসব মিটিং না হলে এতগুলো কর্মচারী খেয়ে-পরে বাঁচত? সব কিছু চাই - লেকচার, প্ল্যানিং, এগনোর স্বপ্ন। এটাই জীবন। কোথাও জিৎ কোথাও হার। রাম-রাবণের যুগ থেকে চলছে। পরেও চলবে"

"যদি তাই বিশ্বাস করেন গালভরা লেকচার দিলেন কেন?" দেবজিৎকে কটাক্ষ।

"রিফিল করে আসি" রিফিল করে ঐত্রিলার পাশে সোফায় "মাংসটা দারুণ। কোন কেটারার?"

"ভবানীপুরের ছোট কেটারার। ভালো রান্না করে। এই শ্লোকের মানেটাও বুঝলাম না"

"ভাষার ওপর অধিকার, শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় চাতুর্য, কাব্য অলংকারে পাণ্ডিত্য, বিদ্বানদের ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে, মুক্তিলাভের নয়। যা শুনতে ডেকেছেন, শুনিয়ে দিলাম। এসব

প্রগতিই নয়”

“মানে কোনও অর্থ নেই?”

“থাকবে না কেন? নিশচয়ই আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য। সবাই এই খেলাই খেলছে। আপনারাই বা বাদ কেন? হার জিতের, এগোনর, পিছিয়ে পড়ার খেলা। তারই গালভরা নাম অগ্রগতি। তারই মাপকাঠিতে প্রগতি, মিথ্যে মোহে। সত্যিকারের প্রগতিও নয়, শান্তিও নয়। না হলে, মুক্তি হবে কোত্থেকে?”

ঐত্রিলা বুঝতে পারছিল না। ওকে ইকনমিক ফিউচার সম্বন্ধে বলতে ডেকেছে। তাকে সরিয়ে, মানুষের ফিউচার নিয়ে বলে যাচ্ছে। এর আগে কখনও কোনও আমলাকে এভাবে বলতে শোনেনি।

বিচ্ছেদের পর দিশাহীন গোলোকধাঁধায়। মন্দারমণিপুরে সায়ন্তনির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পূর্ণিমার আলোয় অনুভব করেছে নতুন কোন পথের দিশার আবশ্যকতা। বুঝেতে না পারলেও এটা বুঝেছিল, সায়ন্তনির হাত ধরে আসবে না। পুরুষের হাত ধরে হলেও তা মুক্তির নাও হতে পারে।

“তাহলে মুক্তি কোথায়?”

মাংসটা শেষ। রুমা আজকাল খাওয়া নিয়ে বেশ কড়াকড়ি করছে “বয়স হয়েছে। এখন খাওয়া দাওয়া বুঝেসুঝে করতে হবে। খাওয়াটা কমিয়ে দাও” পাঁপড়ে কামড় দিয়ে বলল “মুক্তি হারজিতের খেলা থেকে বেরনো। জেতা-হারার বাইরে। চাওয়া-পাওয়াকে সরালেই শান্তি। বাঁচা নিজের জন্যে, নিজের পৃথিবীতে, অনুভূতিকে পাথেয় করে। তখন বাইরের এই দাপাদাপি গৌণ। প্রগতি যুগের হাত ধরেই আসবে। আমরা সেই খেলার পেরেক বা স্ক্রু। টায়ার পাংচার করতে না পারলে কিসসু আসে যায় না”

ডেসার্ট আনতে গিয়ে চেম্বার সেক্রেটারি ব্যানার্জিদা প্রেসিডেন্ট স্বামীনাথন ওকে ঘিরে ধরতেই সরে এল। আর হয়ত এভাবে কথা বলার সুযোগ হবে না। দেবজিতের কথা ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। এ তো মুনি-ঋষিদের কথা।ঐত্রিলা মাধ্যমিক দেবে। পরীক্ষার চিন্তায় ঘুমোতে পারছে না। দাদু হাত ধরে নিউ আলিপুরে গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ে গেছিল। দেহমন জুড়ে চাওয়া।

গুরুদেব বলেছিল “চাওয়াটা ছেড়ে দে। দেখবি সব পেয়ে গেছিস”

আজ যেন দেবজিতের মুখে তারই প্রতিধ্বনি। দেবজিৎ ধর্মসাধক গুরুদেব নয়, আমলা। রক্ত-মাংসের মানুষ। সে যদি ভাবতে পারে, ঐত্রিলাই বা পারবে না কেন? পাথেয় চিনতে মন্দিরের দরকার নেই। ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ারও নয়। সময়, দেশ পাল্টে যায়। কালস্রোতের প্রবাহে বহিঃপ্রকাশও। যা শাশ্বত, চিরন্তন, তার সার বদলায় না। যুগ-যুগান্তেরর বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রকাশ।

দেবজিৎও প্রকাশ করেছে আজকের পটভূমিতে। যা বলেছে, কোনও কালের, যুগের নয়। চিরন্তন সত্য। শোনা থাকলেও, বোঝার সৌভাগ্য হয়নি। আজ দেবজিতের সান্নিধ্যে পরিষ্কার। ওকে বাঁচার মধ্যেই খুঁজে

নিতে হবে এগনোর পথ। দেবজিৎ ধ্রুবতারাটা দেখিয়েছে। শুধু নিজের ছাঁচে লাঞ্চটাইমের সারকে ছেঁকে নিতে হবে। তাতেই বাঁচার সার্থকতা।

চৌত্রিশ

দেবজিতের মুখটা বারবার ভেসে উঠছে। চেষ্টা করেও সরিয়ে ফেলতে পারছে না। স্ত্রী-কন্যা-সংসার নিয়ে মধ্যবয়স্ক। তার কতটুকু রোল বুঝতে পারছে না অথচ তার অস্তিত্বকে গ্রাস না করেও ছেয়ে ফেলেছে। প্রৌঢ়ের প্রতি ভালোবাসা? না কি কল্পনার মানুষকে কাছ থেকে দেখার মধ্যে অজান্তে সঁপে দেওয়া? ভালোলাগা, ভালোবাসা তো বয়সের পরিমাপে আবদ্ধ নয়। ভালোবাসলে স্বপ্নের মায়াজালে বকের মতো উড়তে চায় পার্থিব হিসেবের বাইরে। মিঠে অনুভূতির মায়াপুরীতে। সেখানেই বিদিশা। ভালো লাগার পরিণতি আবশ্যিক, এমন তো নয়। মুহূর্তটাই আনন্দের। ছোটবেলার মিষ্টি অনুভূতিটা ফিরে আসছে। সুবিমলদাকে প্রথম দেখার, ওর জন্য বুক কাঁপার মিঠে ছন্দ। অস্তিত্ব ঘিরে পরপুরুষ। প্রথম যৌবনের ভালোবাসা ভোলা যায়?

বিদিশাও পারেনি। এত বছরে কত পুরুষ এসেছে। ভালোবাসতে চেয়েছে। অথচ বিদিশা অনুভূতিহীন। লিঙ্গ নিয়ে খেললেও মনের গভীরে ছোঁয়েনি। গঙ্গার পাড়ে, ভিক্টোরিয়ার মাঠে ঝালমুড়ি খাওয়া। ঘরে ফিরে চোখ বুজলেও তার ছবিটা ভাসে না। শুধুই পুরুষ। মানুষ নয়।

দেবজিৎ কী কল-কাঠি নেড়েছে জানে না। কিছুদিনেই আধারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ছবি, স্ক্যান শেষে আধার। ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বিদিশার ফোনে বিস্মিত হয়নি।

"বিদিশা। বিদিশা মুখোপাধ্যায়। চিনতে পারছেন?"

"কেমন আছ?"

"ধন্যবাদ জানাতে ফোন করলাম। আপনার জন্য, আধার কার্ড এত তাড়াতাড়ি পেলাম। শনিবার ফ্রি? দেখা করতে চাই"

"শনিবার হবে না। কলকাতায় থাকব না। খড়গপুরে মিটিং আছে। রবিবার ফিরব"

"বেশ। পরে কোনও একদিন..."

ফোন নামিয়ে মনে হল সুযোগ কাজে লাগল না। অথচ দেখা করতে মন উতলা। ভেতরের নিভে যাওয়া প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুবিমলদা ফিরে আসবে না। দেবজিতের মতো সুপুরুষকে দেখতে, কাছ থেকে অনুভব করতে পারবে। বাড়িতে সম্ভব নয়।

উইকেন্ড অফ। ব্যাগ গোছাতে দেখে মা জিজ্ঞেস করল "কোথাও বেরবি?"

"হ্যাঁ, মা। কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছি। ভাবছি কোথাও বেরিয়ে আসি"

"কোথায়?"

"এখনও ভাবিনি। কোথাও একটা..."

সুন্দরী উচ্চ-শিক্ষিত বাউন্ডুলে মেয়েটাকে সংসারের বাঁধতে পারল না এটাই দুঃখ। সে আশা ক্রমশ ক্ষীণ। বয়স বাড়ছে। বুড়ো বয়সে মেয়েটাকে কে দেখবে এই নিয়েই চিন্তা। নাতি-নাতনির মুখ দেখলে শান্তি পেত।

"যেখানে খুশি যা। যা খুশি ক্র্। কিছু বলব না। শুধু বিয়ে কর"

"তাতে তোমার কী?"

"মরার আগে শান্তি পাব"

উত্তরের অপেক্ষা না করে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোলাঘাটের শের-ই-পাঞ্জাবে বসে তরকা-রুটি। খাওয়া নিয়ে সচেতন হলেও বেরলে খাওয়ার হিড়িক বেড়ে যায়। নানান লোক দেখাতেই আনন্দ। কেউ ফিরে ফিরে তাকালে দামি মনে হয়। এখনও সৌন্দর্যে ভাটা পড়েনি। এই বয়সেও পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে।

এক ভদ্রমহিলা সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলল "ডাক্তারবাবু যে। ভালো আছেন?" পেশেন্ট বোধহয় "চিনতে পারছেন? আমার ব্রেস্ট রিডাকশন করেছিলেন"

ভাসা ভাসা মনে পড়ছে। বছর তিনেক আগে "চন্দনা সেন। তাই না?"

"কী সৌভাগ্য! এতদিন পরেও নামটা মনে রেখেছেন। ভালো আছেন তো? এদিকে কোথায়?"

"খড়গপুরে মেডিক্যাল ক্যাম্পে"

"অপারেশনের পর ঘাড়ের পিঠের ব্যাথাটা কমে গেছে। ভালো থাকবেন" মিষ্টি হেসে চলে গেল।

সারা দুপুর খড়গপুর মার্কেটে। দেবজিৎ সত্যি খড়গপুরে এসেছে তো? নইলে আসাটাই বিফল। সাড়ে-পাঁচটায় দেবজিৎকে ফোন "এখনও খড়গপুরে? হঠাৎ মেডিক্যাল ক্যাম্পে খড়গপুর আসতে হল"

ডিএমদের পরামর্শ দিচ্ছে দেবজিৎ। বাইরে খড়গপুরের পুলিস সুপার।

বিদিশাকে বলল "কোথায় উঠেছ?"

"হোটেল খুঁজতে হবে। অন্যরা বাসে এসেছিল। এইমাত্র বেরিয়ে গেল। ড্রাইভ করে রাতে যাব না। কাল সকালে"

"আমার সার্কিট হাউসে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেও। একসঙ্গে ডিনার খাব। রাস্তা চিনতে পারবে তো?"

"কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। ছ'টা হয়ে যাবে। দেরি হবে না তো? নইলে রাস্তায় গাড়িতে"

"ঠিক টাইমে পৌঁছে যাব। কাজ শেষ। সার্কিট হাউসে বলে রাখব। অসুবিধা হবে না" ফোনটা কেটে দিল।

গোধূলির আলো খড়গপুরের পশ্চিম আকাশে দিগন্তের অন্ধকারে হারাবার আগে রক্তিম আভায় ভরিয়ে দিয়েছে 'গাড়িধূলি' শহর। বারান্দার ডেক চেয়ারে পা ছড়িয়ে দেবজিৎ সেদিকে চেয়ে চা খাচ্ছিল। একগাদা লোক অন্য সময় থাকলেও আজ সবাইকে বারণ করে দিয়েছে। একা থাকতে চায়। প্রকৃতিকে উপভোগ করতে। বিদিশার গাড়িটা গাড়ি বারান্দায় ঢুকতেই ওর পূর্ণ অবয়বটা আলো-আঁধারিতে সিল্যুট। নীল জিনস, সাদা-লাল টপসে নীল ফুল। অগোছালো চুল।

ওকে দেখে অর্ডার "মেমসাহেবের জন্য আরেকটা চা"

চেয়ার টেনে বসে বিদিশা বলল "অসুবিধা হয়নি। ট্র্যাফিক জ্যামে দেরি হয়ে গেল"

"হঠাৎ ক্যাম্পে?"

"আগেই ঠিক ছিল। আমার আসার কথা ছিল না। হঠাৎ ডিএমএস অনুরোধ করল" হেসে উত্তর।

কালো লেদার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বার করে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি ফ্রেমবন্দি করতে তৎপর। ওকে ছবি তুলতে দেখে ওর নিকন ডি৯০টা নিয়ে এল। অনেক শট ফ্রেমে বন্দি করে ফেলেছে। সঙ্গে দেবজিতের ছবিও। যখন ক্যামেরাটাকে শাটার প্রায়রিটি মোডে অ্যাডজাস্ট করছে বিদিশা ওর ন্যাচারাল মুডের ছবি তুলছে। বুঝতে পারলেও ছবি তুলতে ব্যস্ত। শেষ হতেই বিদিশা জিজ্ঞেস করল "আপনার ছবি তোলার শখ জানতাম না। অনেক ছবি তোলা আপনার?"

"অনেক নয়। কয়েকটা। যেখানে যাই, তুলি। নেচারই পছন্দ"

"আমারও। ওই জন্যই বাউন্ডুলে। ওর মধ্যেই জীবনকে খুঁজে পাই"

দেবজিৎ ব্যাগে ক্যামেরাটা রাখতে যাচ্ছিল। তার আগেই বিদিশার কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

বিদিশা মুচকি হাসল "মল্লিকা শেরাওয়াতের মতো তো চেহারা। আমার ছবি তুলে কী হবে?"

"কী গুণগান শুনলে খুশি হবে? তোমার সৌন্দর্যের স্তাবকতা? ফ্ল্যাটারির মধ্যে আমি নেই"

ঢোক গিলল। এর আগে কেউ বলেনি। বিদিশা স্তাবকতা নিয়েই বড় হয়েছে। জীবন কাটিয়েছে। ওটা মজ্জায়। তাকে ধুলোয়ে মিশিয়ে দিল। চাঁচাছোলা দেবজিৎ। গোঁ দ্বিগুণ। ও সবাই নয় আগেই বুঝেছে। কিন্তু কী, বুঝতে পারছে না। এমন কোনও পুরুষ আছে যে মহিলার সৌন্দর্যে গলবে না? দেখা যাক ওর দৌড় কত দূর।

"মোটেই শুনতে চাইনি"

"ছবি তুলছি কারণ ভালোবাসি। তোমার প্রোফাইল সুন্দর, ফোটোজেনিক। সাধারণকে সুন্দর কারার মধ্যেও ফোটোগ্রাফির কৃতিত্ব। সেটাই শেখার চেষ্টা করছি"

"আপনার কীসে আগ্রহ নেই?"

“পরনিন্দা-পরচর্চা, র‍্যাট রেস, আমিত্বের অহংকারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই”

“কারণ আপনি সাকসেসফুল”

“তার মানেই বুঝি না। মাস-মাইনের চাকরি। ফুরিয়ে গেলে কেউ পুঁছবে না। যারা সেলাম করছে, তারা আমাকে করছে না। পোজিশনকে করছে। যেদিন করবে না, সেদিনও সেই মানুষটাই। এসব ভূষণ, আভরণ। অন্যরা যা নিয়ে মশগুল। এর বাইরের নিরাভরণ মানুষটাই আসল”

বিদিশার বেশ মজা লাগছে। উসকে দেওয়ার জন্য বলল “আভরণটা সরিয়ে ন্যাংটো মানুষটাকে দেখতে চান না?”

“চাই বৈকি। সেটাই খুঁজছি। জামাকাপড় খোলা নয়। ভেতরটা”

কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। দেবজিৎ বেয়ারাকে অর্ডার দিতে ডেকেছে “চিকেন পকোড়া না পেঁয়াজি?”

খাদ্য-রসিকও। খেতে, খাওয়াতেও ভালোবাসে।

“যেটা সুবিধা”

“তুমি যা খেতে চাও। চিকেন পকোড়া... হোটেল পেলে?”

“খোঁজার সময় হয়নি। কোথাও একটা শুয়ে পড়ব”

“এখানে থাকতে পার। অনেক ঘর। অসুবিধে হবে না”

স্বপ্ন হাতের মুঠোয়। তার জন্যেই খড়গপুরে। দেবজিতের কথায় মোহাচ্ছন্ন। অথচ বুঝতে পারছে না। দেবজিৎ অনুরূপদা, অরণি, অনির্বাণ নয়।

ইতস্তত করে বলল “আপনার অসুবিধা হবে। এখানে কত লোক”

“একটুও না। অনেক ঘর। যেখানে খুশি থাকতে পার”

সম্মতিসুচক মাথা নাড়ায়, দেহরক্ষীকে ইঙ্গিত। জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে গাড়ি পার্ক করে রাখতে।

সূর্য আজকের মতো বিদায় নিয়েছে। দূরে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। অন্ধকার আকাশে একফালি মেঘের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের উঁকিঝুকি আঁধারের বুক ভেদ করে মায়াবি আলোয় প্লাবিত করেছে। মায়বী পসরা সাজিয়ে অলীক কল্পনার সুরকে বাস্তবের রঙে মেশাতে। সব ভুলে মুহূর্তকে বরণ করতে।

পাশাপাশি বসে অনুভব, আবেগ, উপলব্ধি। সংসারের মায়াজালে চাওয়া, ভোগ, আকাঙ্ক্ষা। পার্থিব চেনা-জানা স্বপ্ন। নিয়ম, সমাজ, দায়বদ্ধতা। সেখানে অনুভূতিও লাগামে। তবুও সেই বন্ধনেই সিকিউরিটি। বিভিন্ন ভাষায় তার অভিব্যক্তি। ভালোবাসা, সংসার, জীবন, বেঁচে থাকা। একদিন সেই সংজ্ঞাগুলো গোলমাল হলেই দিশেহারা। মনকে হাতড়াতে গিয়ে দেখা ওটা অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। যেখানে হিসেব-নিকেশ

নেই। ভালোবাসা শুধু ভালোবাসার জন্যই। তার অতীত নেই। ভবিষ্যৎ নেই। মনের গভীরে অপরিচিত রাগ। আসল মানুষটার মনের ছন্দ।

দেবজিতের কৌতূহলেরও কারণ নেই। ফিরে গেছে ছোটবেলার প্রেমে। পরিণতি না থাকলেই বা মুহূর্তটা ঈশ্বরের দান। নষ্ট করতে চায় না।

বেয়ারা টেবলে হুইস্কি রেখে গেল। দেবজিৎ ঢেলে বলল "খাও?"

মাথা নাড়ল। গ্লাসটা এগিয়ে দিল। আশ্চর্য লাগছে। অফিসে যার সঙ্গে দেখা করতে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সে হুইস্কি এগিয়ে দিচ্ছে। তার প্রেমে পড়ে গেছে? পড়তেই পারে। সে তো কম আকর্ষণীয় নয়। রূপ, যৌবন, শিক্ষা সমন্বিত। উপেক্ষা করা শক্ত।

হুইস্কি নিয়ে ঠোঁটের ওপর জিভটা বোলাচ্ছে। দেবজিতের চোখ এড়ায়নি। মেয়েটা বড্ড বাচ্চা। কেউ শিখিয়েও দেয়েনি অভিসার কীভাবে করতে হয়। বিদিশা এতদিন প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছে। এবার চায় দেবজিৎ আঁকড়ে ধরে তাকে চুমু খাক। আদরে দেহ জুড়ে প্রত্যঙ্গগুলো ভরে দিক। বাধা না দিয়ে সঁপে দেবে। তার চাওয়া পূর্ণ হবে। সুপ্ত কাম রক্তমাংসের পুরুষ চাইছে। নারীর সম্পূর্ণতা। তার চাওয়া-পাওয়া দেহের খিদে যৌবনের কামনা কদ্দিন অস্বীকার করবে? মনের খিদেও এতদিন অপূর্ণ। আজ নিজেকে সঁপে দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ পুরুষের বাহুডোরে।

দেবজিৎ অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আওড়াচ্ছেঃ

দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে
আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরী হারা
এপারের ভালোবাসা। বিরহ স্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রি শেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে

"এত ভালো আবৃত্তি করেন জানতাম না। আপনার কীসের বিরহ?"

"বিরহ সব মানুষের আছে। আমারটা কোনও মহিলার প্রতি নয়, পাওয়ার প্রতি"

বিদিশা ভেবেছিল ও কোনও ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস শোনাবে। না বুঝে জিজ্ঞেস করল "আপনার পাওয়া কীসে?"

"জানি না। তোমরা যে অর্থে ভাব, তা নয়। নিজেকে"

বুঝতে পারল না। তার কাছে পাওয়া মানে মনের বা দেহের "বুঝলাম না। কোন পাওয়ার কথা বলছেন?"

“নিজেকে পাওয়া। ঈশ্বরকে পাওয়া”

ফিলসফিক্যাল দিকে এগোচ্ছে দেখে বলল “মানুষকেই পেলাম না। ঈশ্বর দূর অস্ত”

দেবজিৎ ফিরে বলল “বিয়ে করনি কেন?”

“মনের মতো কাউকে পাইনি”

“বাড়িতে আর কে আছে?”

“মা, বাবা। দাদা ইংল্যান্ডে। ব্রিটিশ বউ, দুটো বাচ্চা। দু-তিন বছরে একবার আসে”

“প্রেম করনি?”

“ছোটবেলায় একবার। করেও কিছু পাইনি। তারপর ইচ্ছে হয়নি”

বেয়ারা জিজ্ঞেস করল “স্যার, কটার সময় খাবেন?”

“সাড়ে নটা”

“রুমা বৌদির সঙ্গে প্রেম?”

“প্রেসিডেন্সি কলেজ জীবন থেকেই। তারপর বিয়ে”

নিস্তব্ধতা। দেবজিৎ আকাশের দিকে চেয়ে। বিদিশা কিছু বলতে চাইছিল। ওর মুখ দেখে থেমে বলল “চেঞ্জ করে আসি”

ঘরটায় নেহাত টু পিস সোফা, সেন্টর টেবল, দুটো খাট, ড্রেসিং টেবল, আলমারি, আলনা। শুকনো বাথরুমে উঁকি মারল। বেসিন, আয়না, গিজার, কল, বালতি-মগ। শাওয়ারের নীচে বসার হুক্কা। দরজা ভেজিয়ে, জিনস-টপস আলনায়। ব্রা প্যান্টিতে আয়নার সামনে। ভুঁড়িটা কী বেড়েছে, হিপে মেদ? ব্রায়ের নীচে থেকে স্তন দুটো তুলে ধরল। ঝুলে গেছে? ডান হাত প্যান্টির ফাঁকে। ভিজে ঠেকছে। ঠিকই আছে। এখনও কোনও পুরুষকে যৌবন দিয়ে ধরাশায়ী করতে পারে। আজ দেবজিৎকে চাইছে। হোক বয়সে বড়, বিবাহিত, কলেজে পড়া মেয়ের বাবা। তার মন ছুঁয়ে গেছে। কিছুই পাওয়ার না হলেও মুহূর্তটাই বা কম কীসের? সব পাওয়ার পরিণতি থাকতে হবে এমন তো মানে নেই। স্নান করতে বাথরুমে।

কত রাত কে জানে? খাওয়া শেষে বেয়ারারা মশারি টাঙিয়ে, জলের গ্লাস বোতল রেখে কোয়াটারসে চলে গেছে। দেবজিতের মাস্টার স্যুটের সোফায় ওরা দুজনে। হুইস্কির নেশার মাদকতা শরীর থেকে মাথায়। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে দেবজিৎ। বোস স্টিরিওতে মালকোষ। বিদিশার দেহে কামনা। অপূর্ণ চহিদার পূর্ণতা খুঁজছে। দেহের খিদেটা মরেনি। নারীত্ব নতুন ভাবে জেগে উঠেছে। পুরুষকে আলিঙ্গন করে পূর্ণতা চায়।

“আমাকে ভালো লাগে না?”

“নিশ্চয়ই লাগে” না তাকিয়েই উত্তর দিল।

সোফা ছেড়ে নাইটির দড়ি শিথিল করে দিল। আলো-আঁধারিতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গোলাপি নাইটির ফাঁক দিয়ে স্তন উকি মারছে। সোফার হাতলে ঝুঁকে বলল “কতটা?”

বিদিশার দ্রুত ঘন ঘন শ্বাস শুনতে পাচ্ছে। পারফিউমের গন্ধ বিদিশার গায়ের গন্ধে মিশে। ওর চাওয়া বুঝলেও নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ।

“বললেন না তো কতটা?” জবাব নেই। এখানে কেউ নেই। জানতেও পারবে না। দ্বিধা কেন? “চুপ করে আছেন কেন? আপনার চাওয়া নেই?”

“কেন থাকবে না?”

নাকটা ঠেকাল দেবজিতের গালে “ভালো লাগছে না?” দেবজিৎ চুপ। সরে বসল। বিদিশা ঝুঁকে অর্ধ-উন্মুক্ত স্তনটা কাঁধে ঠেকাল “তবে সরে যাচ্ছেন?”

“নিজের চেয়ারে বস”

“না” বিদিশা দৃঢ়।

দেবজিৎ ভাবলেশহীন “ছেলেমানুষি করো না”

“মোটেই করছি না। যথেষ্ট বয়স হয়েছে”

“এরকম করছ কেন?”

“আমি আপনাকে চাই। ভীষণভাবে। বোঝেন না?”

সোফার হাতল থেকে উঠে দেহটাকে মেলে দিল ওর সামনে। নাইটির দড়ি আলগা। ব্রা ছাড়া আবছায়া সুডৌল স্তন দেখতে পাচ্ছে। আলো-আঁধারিতে সি থ্রু আবরণে দেখার অন্য মদকতা। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকারের কারণ নেই। উত্তর দিল না। দেখছে, কদ্দুর এগোতে চায়। বিদিশার ভেতরে ভালোবাসার, কাছে পাওয়ার, ইন্দ্রিয়কে শান্ত করার আগুন। হুইস্কির ঘোরে, উত্তেজনায়, মুখটা লাল। দেবজিৎকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে চাই। সঁপে দিতে চায় ওর কাছে। ভাসতে চায় কাম স্রোতে। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আনতেই, ঠেলে সরিয়ে দিল।

নিখিল ব্যানার্জির আলাপ শেষ। এখন ঝালা। গত তিনতাল।

“কী হল সরিয়ে দিলেন?”

“ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বোস” দেবজিৎ দৃঢ়।

“না” আজ কোনও বাধাই মানবে না। এতদিন পর যখন দেহের বাঁধ ভেঙেছে নেভানো না পর্যন্ত শান্তি, মুক্তি, পরিত্রাণ নেই।

“কী করছ? আমি তোমার থেকে কত বড়”

“তো কী হয়েছে? ভালোবাসার সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক?”

“বউ আছে। মেয়ে আছে। আমাকে ভালোবেসে কী পাবে?”

দেবজিতের পাশের সোফায় “ভালোবেসে কে কবে কী পেয়েছে? ভালোবাসা শুধু, ভালোবাসার জন্যই। চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের টেনে আনছেন কেন?” হাত বোলাতে লাগল ওর হাতে। চাপ দিল। আরও একটু। জোরে আঁকড়ে ধরল।

দেবজিৎ থমকাল। মিথ্যে বলেনি। যুক্তি অস্বীকার করতে পারছে না “মানলাম আমায় ভালোবাসো। ওপাশের চেয়ারে বসেও তো ভালোবাসা যায়”

“না, যায় না। দেহ ছেড়ে ভালোবাসা অসম্পূর্ণ। আপনাকে দেহে-মনে চাই”

নিজেই অবাক। এর আগে তো নতজানু হয়ে ভিক্ষে চায়নি। দেবজিৎ কী তার সত্ত্বাকে গ্রাস করেছে? আগেরটা হয়ত প্রেম ছিল না। এই প্রথম। কোথায় নিয়ে চলেছে নিয়তি? সঁপে দিয়েছে অচেনা ভাগ্যে। গভীরতম অনুভূতিতে। পাশ ফিরে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট। মুহূর্তে মন ভরে গেল অজানা পূর্ণতায়।

বিদিশাকে ঠেলে উঠে পড়ল। দৃঢ় গম্ভীরভাবে বলল “অনেক রাত হয়েছে, ঘরে যাও”

ওর হাতের ধাক্কায় খেপে উঠল। একে সুন্দরী, শিক্ষিত, তায় ভরাট যৌবন। প্রত্যাখ্যান মানা কঠিন। জাপটে ধরল দেবজিৎকে। এক ঝটকায় ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

রাগে, ক্ষোভে, আক্রোশে ফেটে পড়ল বিদিশা “ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন কেন জানেন? বিকস ইউ আর ইমপোটেন্ট”

পৌরুষকে কষে থাপ্পড়। ইমপোটেন্ট! মাই ফুট। বাচ্চাটা পায়দা হল কী করে? প্রত্যাখ্যানের রাগে খেপে গেছে। ওর হাত নামিয়ে আনল পাজামা ঢাকা পুরুষাঙ্গে।

“ইমপোটেন্ট! দেখ ইমপোটেন্ট কি না। এটা পেলেই সব পেয়ে যাবে? জীবন পূর্ণ হয়ে যাবে? আর কিছুই চাওয়ার নেই? তোমার সঙ্গে শুলেই কী পূর্ণ নারী হয়ে যাবে? একটা রাতের উন্মাদনা শান্তি এনে দেবে?”

লজ্জায়, অপমানে থমকে গেল বিদিশা। ইরেকশনে হাত দিয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই দেবজিৎও পুরদস্তুর পুরুষ। তবে কেন এভাবে প্রত্যাখ্যান?

শাসন করল “সোফায় বস। পারসেপশনটা তোমার মতো বুদ্ধিমতীর কাছে আশা করেছিলাম। আমার সঙ্গে শুয়ে তুমি কী নিয়ে যাবে? একটা মুহূর্ত। ক'দিনের জন্য? কিছুদিন পরেই ভুলে যাবে। তারপর কী নিয়ে বাঁচবে? স্মৃতি না সাত মিনিটের উত্তেজনা? সেই শূন্যতায় সব পেয়ে যাবে?”

সোফায় মাথা নীচু বিদিশার “না”

"তবে? কেন মুহূর্তের জন্য জীবনটাকে দাঁওতে চড়াবে? জীবনটা অনেক বড়। অন্য দিকগুলো দেখতে শেখ। ফ্র্যাঙ্ক কাফকার মেটামরফোসিস পড়েছ?"

"না" অবাক ওর দিকে চেয়ে।

"তার সেনট্রাল ক্যারেক্টর গ্রেগর সামসা। হঠাৎ একদিন মানুষ থেকে জেলি ফিস হয়ে গেল। কী পালটাল?"

"তার চেহারাটা"

"আপাতভাবে তাই। চেহারার সঙ্গে পাশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষটা কিন্তু পাল্টায়নি। একই থেকে গেছে। আমার সঙ্গে শুলে তুমিও পালটাবে না। শুধু তোমার সম্বন্ধে ধারণাটা পাল্টে যাবে। আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে। তুচ্ছ কিছুক্ষণের আনন্দের জন্য, ভালোবাসাকে ছোট করে দেবে? মুহূর্তটা হারিয়ে গেলে কী নিয়ে বাঁচবে? আমিও তো হারিয়ে যাব"

"আজ রাতের পর বাঁচব কী নিয়ে? বিরহ, না পাওয়ার দুঃখ?"

বিদিশা অভিভূত তাকিয়ে "তোমারা ভাব, মুহূর্তে কিছু পেলেই সব পাওয়া। এই পাওয়ার পর আরেকটা, তারপর আরেকটা, চলতেই থাকে। একটা শেষ হয়ে আরেক চাহিদা। সামায়িক জিত। যদিও তা চিরস্থায়ী নয়। ত্যাগেই আসল ভোগ। ছোটখাটো পাওয়াটা চিরকালের"

দেখছে অন্য দেবজিৎদাকে। লোকটা কোন পৃথিবীর? যার বউ বাচ্চা, ইরেকশন সব-ই অন্যদের মতো। তাদের মধ্যেও আলাদা। কথা নেই। বুকে অসহ্য আলোড়ন। দেবজিৎদার প্রত্যাখান না ওর অক্ষমতাকে দেখিয়ে দেওয়া? ভাবত খুব চালাক। এখন ঘূর্ণিঝড়ে দিশাহীন। নোঙর, মোহনার খোঁজে।

"আজকের পাওয়া চিরকাল থাকে না। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায়। যত আঁকড়াবার চেষ্টা করবে, তত হারিয়ে যাবে। তোমাদের চিন্তা কত স্থূল। মুহূর্তের জিৎ তো পরের মুহূর্তের হারও হতে পারে। এই ছোট হারজিতের গণ্ডিতে বাঁধা কেন? এর বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। তাকে দেখতে শেখো। এই ছোটখাটো পাওয়াকে চিরদিনের, চিরকালের রূপ দিতে। ভোগে নয়, ত্যাগে"

"সাধুদের সাধনার পৃথিবীতে তো আমি নেই"

"কে বলেছে ঈশ্বর পেতে বনে-জঙ্গলে তপস্যা করতে হবে? ঈশ্বর সব জায়গাতেই, সবার মধ্যে, সবখানে। তোমার দুঃখ লাগছে করতে দিলাম না বলে। অহং-এ লেগেছে। তাই ভাবছ হার। নিজেকে যদি হারজিতের পৃথিবী থেকে সরিয়ে আনতে পার, দেখবে দুঃখ লাগবে না। নিজেকে ভুলে ত্যাগ করতে পারলেই দেখবে সব কিছুই আনন্দ শান্তির। আজ-কালের গণ্ডির সীমা পেরিয়ে চিরদিনের, চিরকালের"

এক অন্য দেবজিৎ। এক অন্য মানুষ আগে দেখেনি। জীবনে শান্তির কথায় চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে বাঁচার রসদ। অনন্য এক দিক। না চেনা ধ্রুবতারা।খড়গপুরে এসেছিল দেবজিৎকে ভালোবাসতে। বুকে জড়িয়ে, চাওয়াকে পূর্ণ করতে। যে জন্যে এসেছিল, পায়নি। তার মধ্যেই নতুন জীবনের দীক্ষা। আর কীই বা চাইতে পারে? কাঁদছে। দুঃখের না আনন্দের? নিজেকে খুঁজে পাওয়ায় চোখে জল। আগামীর বাঁচার নৈবেদ্যে বিদিশার অভিষেক। এখন থেকে মনের রানি। পুরনোকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনের আলো দেখতে পাচ্ছে। না-চেনা ধ্রুবতারাটা।

ঘরের দিকে যেতে বলল "এসেছিলাম আপনাকে ভালোবাসতে। বেরিয়ে যাচ্ছি জীবনকে ভালোবেসে"

বুকে জমে ওঠা একরাশ কান্না ঢোক গিলে, ওর দিকে না তাকিয়ে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। বিছানায় এপাশ ওপাশ ছটফট করেছে। দুঃখে, রাগে, অসম্পূর্ণতায়। দেবজিৎ চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে আসল বিদিশাকে।

উঠতে দেরি হয়েছিল। চোখ কচলাতেই অনুভব করল নিজের বিছানায় নেই। খড়গপুরে। মনে পড়ল কাল রাতে দেবজিৎদার কথা। মনে হতেই অনুশোচনায় মনটা ভরে গেল। এ মা! কী করতে যাচ্ছিল সে। ছিঃ ছিঃ। হাউসকোট জড়িয়ে বাইরে "দেবজিৎদা… দেবজিৎদা..."

গলার আওয়াজে কেয়ারটেকার বেরিয়ে এল "সাহেব ভোরবেলায় চলে গেছেন। চা খাবেন মেমসাহেব?"

অন্যমনস্ক মাথা নাড়ল। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে দেবজিতের কাল রাতের কথাগুলো। গাটা এলিয়ে দিল বারান্দার চেয়ারে। ভেতরে তীব্র আলোড়ন। মনে হচ্ছে নিজেকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে। আবারও কী ছোট্ট খুকির মতো জীবন শুরু করা যায় না? যেখানে সুবিমলদা, অনুরূপদা, অরণি নেই, অনির্বাণ নেই। শুধু আছে দেবজিৎদা।

কেয়ারটেকার কাপটা সামনের টেবলে নামিয়ে বলল "ক'চামচ চিনি দেব মেমসাহেব?"

"এক"

কাপটা এগিয়ে একটা খাম ওকে দিয়ে বলল "সাহেব আপনার জন্য এটা দিয়ে গেছেন"

কেয়ারটেকার চলে গেছে। চুমুক দিয়ে খামটা খুলল। ছোট্ট চিরকূট। দেবজিৎদার হাতে লেখা কাল রাতের শ্লোকটাঃ

ঈশাবাস্যমিদম সর্বং ইয়াৎকানচ জগত্তাম জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুনিজতা মা গৃধঃ কস্য সিদ ধনম ।।

ফ্যালফ্যাল করে চিরকুটের দিকে চেয়ে। বুকের চাপা কান্না চোখে কয়েক ফোঁটা মুক্ত। লেখার শব্দগুলো ঝাপসা। শব্দের ছন্দে ফুটে উঠছে একটা সম্পূর্ণ মানুষের পূর্ণ অবয়ব। শ্লোকের প্রয়োজন নেই। তার মধ্যে

ভেসে উঠছে একটা মুখ, একটা আত্মা। দেবজিৎদার। লোকটাই যেন শব্দের বাইরে অনুভূতির সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর অবয়ব দিয়েছে। সে আর কেউ নয়। আমাদের পাশেরই এক রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ।

এ যুগের দেবজিৎ।

পঁয়ত্রিশ

“চিনতে পারছেন?”

দেবজিৎ অবাক। শর্বরী বসুকে এখানে দেখবে আশা করেনি। মাঝে মধ্যে রবিবার এখানে আসে। চুপচাপ স্তোত্রপাঠ শোনে।

“কেন চিনব না? পার্টিতে, পরে আর্ট এক্সিবিশনে। ভুলিনি। আপনি এখানে?”

স্বভাবসুলভ কৌতূহল। শর্বরী লেক কালীবাড়িতে। হিসেবের অঙ্ক গোলমাল হয়ে চেনা ছকের বাইরে গেলেই প্রথম আলাপের টান বেড়ে যায়। পার্টিতে মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়নি। শর্বরী মনে করতেই পারে মাল খেয়ে ভাট বকছে। অনেকেই যা করে। ফিলসফি উগরে পরের দিন ভুলে যায়। তাই এড়িয়ে গেছিল।

“মন খারাপ হলে মাঝেমধ্যে আসি। ভালো লাগে”

জাঁকজমক পোশাক, প্রলেপহীন আধুনিকাতা ছাড়া হাল্কা নীল টাঙ্গাইল। ঈশ্বর খুঁজতে খোলস পরানো কথা অবান্তর। অনুভূতি, আবেগ, শ্লোক মনকে শান্তির পথে সাহায্য করে সমস্যা ভুলতে। দেবজিতের দেখা শর্বরীর সঙ্গে কালীবাড়িতে, উপস্থিতিটা খাপ খাচ্ছে না। তাই কৌতূহল। পার্টিতে হুইস্কি হাতে তারাখচিত জ্যোৎস্নায় মনে হয়েছিল আবেগপ্রবণ। ট্যান্ডনের এক্সিবিশনে মনে হয়ছিল সোশালাইট হলেও স্বতন্ত্র। লেক কালীবাড়ির সঙ্গে মিলছে না।

“মন খারাপ হলে এখানে কেন?”

“শান্তি পাই” শাড়ি ঠিক করে বলল।

“বোঝাটাই পাওয়া”

হকচকিয়ে গেল শর্বরী। মুনি-ঋষিদের মতো কথা হলেও দেবজিৎ বর্তমানের। এলিসা নেগেটিভ এলেও চোখ খুলে দিয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন না করলে রনিতের মতো তারও হতে পারে। মরতে চায় না, বাবার মতো অপঘাতে চলেও যেতে চায় না। হুইস্কি, ক্লাব পার্টিতে শান্তি নেই। কী নিয়ে বাঁচবে? সব দেখা হলেও দাগ কাটল না। ওরা বলে, ঈশ্বরে সমর্পণ করলেই শান্তি। দেখাই যাক।

“তাড়া আছে? না থাকলে কোথাও বসতাম”

“রবিবারের বাজার তাড়া নেই। চলুন লেক ক্লাবে”

ক্লাবের সোফায় বসে দেবজিৎ জিজ্ঞেস করল “কী খাবেন?”

“পেঁয়াজি”

হকচকিয়ে গেল দেবজিৎ “এত কিছু থাকতে পেঁয়াজি?”

শর্বরী হাসল “করছে। মাংস ভালো লাগে না"

“আপনি কী প্রায়ই আসেন?”

“সময় পেলে। ভালো লাগে। বাইরের হই-হট্টগোল থেকে দূরে। শান্তি। আপনিও যার খোঁজে”

“ছোটার মধ্যে ঈশ্বর পাওয়া যায় না”

“কিন্তু ছোটা ছাড়া তো বাঁচাও যায় না”

“তার শেষ আছে। জিতবেন কিংবা হারবেন। নিজেকে তৈরি করতে হয়। তাঁর আশীর্বাদ পেতে গেলে চাওয়া ছেড়ে বেরতে হবে। নইলে ধরা দেবে কেন?”

“আপনি পেরেছেন? পোজিশন, যশ সবের পেছনেই ছুটছেন”

“ছুটিনি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এসে গেছে। না এলেও কিছু যায় আসত না। আমিওই অনেকদিন থেকেই খেলার বাইরে। নাম পোজিশন শুধু আভরণ মাত্র। আমি নেই। চিফ সেক্রেটারি না হলে কথা বলতেন না?”

“নিশ্চয়ই বলতাম। মানুষটা ভালো বলেই”

“কী করে বুঝলেন?”

“এতটা বয়সে কিছু তো দেখেছি”

“মানুষটাকে কিন্তু আজকের সমাজ দর দেয় না। কেবল ভুষণ দেখে। সেটাই দুর্ভ্যাগ্য” দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লেটটা এগিয়ে বলল “নিন, আপনার পেঁয়াজি”

পেঁয়াজি চিবিয়ে শর্বরী বলল “অত সহজ? সব ছেড়ে বাঁচা অত সহজ নয়”

দেবজিৎ পেঁয়াজি মুখে ফেলে “চেষ্টা না করেই বলছেন। প্রিফর্মড আইডিয়া। সাধুবাবারা তপস্যা করে। সাধারণ মানুষ নাম, যশ, টাকার পেছনে ছোটে। কনসেপ্টটাই প্রিফর্মড। আদতে সত্যি নয়”

শর্বরীর মনে হল মিথ্যে বলছে না। কোথাও লেখা নেই ঈশ্বর পেতে সাধুবাবা হতে হবে।

দেবজিৎ বলল “ঈশ্বর মনের ব্যাপার। বনে জঙ্গলে বা আশ্রমে থাকার ওপর নির্ভর করে না। হারজিতের দৌড় থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই শান্তি”

অদ্ভুত লাগছে। পার্টিতেই মনে হয়েছিল অন্যদের থেকে আলাদা। এখন মনে হচ্ছে আগে তো এরকম শোনেনি। জীবনের সত্যগুলো কোনও ভণিতা না করেই বলতে পারে “সব ছেড়েই যদি দিলাম, বাঁচব কী নিয়ে?”

“আপনার স্বচ্ছতা নিয়ে”

“ঠিক বুঝলাম না” শর্বরীর গুলিয়ে যাচ্ছে। অস্বীকার করতে পারছে না। মেনেও নিতে পারছে না।

"জিতলেও উল্লাসের কিছু নেই। হারলেও দুঃখের কিছু নেই। হলে ভালো। নইলে কিছু আসে যায় না। ইম্পরট্যান্ট হারজিতের বাইরে বেরিয়ে আসা। বাঁচা নিজের বিশ্বাসে"

এতদিন শুধু নিজের চাওয়া নিয়েই বেঁচেছে। পেয়েওছে। আজ তার শেষে চাওয়া-পাওয়া ধোঁয়াশায়। অন্ধকারে আলো খুঁজছে। সারাজীবন পড়ে। দেবজিৎ অন্ধকারে ধ্রুবতারা। ক্লাবের গদিতে বসে নতুন করে বাঁচার দিশা দেখাচ্ছে। নতুন পথের সন্ধান। ও যা বলছে মানলে শান্তি পেত। কী করে মানবে এই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সাজেশন। সেই স্তরেই পৌঁছয়নি "আপনি কোন পৃথিবীর?"

"এই পৃথিবীর। আপনি যা, আমিও তাই"

এর পরে কী বলবে ভেবে পেল না। দেবজিৎ যেখানে, সে তো পৌঁছতে পারছে না। অসহায় শর্বরী কলকাতার রানি হয়েও পরাজিত। দেবজিৎ হারিয়ে দেয়নি। ভেতরের মানুষটাকে বিকশিত করে তার বাইরের আমির সামনে মেলে দিয়েছে। সেখানেই তার পরাজয়। নিজের কাছে। এভাবে তো ভাবেনি। ছোটবেলা থেকেই ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের কমতি ছিল না। ভোগও করেছে। অন্যের জীবনও তৈরি করে দিয়েছে। এক নেশায় ভুলে, মেতে থেকেছে। বুঝতে পারছে মারিজুয়ানার চেয়েও মারাত্মক। এই নেশাই, ভেতরের আমিকে বাইরের আমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। লক্ষই করেনি অজ্ঞাতে ভেতরের আমিটা হারিয়ে গেছে। শুধু এতদিন মজেছিল বাইরের আমির মধ্যে। অর্গি, সেক্স, রনিত, সায়ন্তনি - সব কিছুই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আশায়। রনিতের এডস্ লাগাম টেনেছে।

দেবজিৎ সেই ভেতরের আমির নেভা দীপ আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার আলোয় নতুন করে দেখছে অন্তরের আমিকে। ক্লাবে বসে তাকে যেখানে নিয়ে যেতে পেরেছে, কেউ পারেনি। কোনও সিদ্ধ পুরুষ নয়। তার মতোই মানুষ!

"হতেই পারে না। আগে দেখিনি"

"সবাই আমারই মতো। নিজেকে ভালো করে দেখেননি। আমি উপলক্ষ মাত্র"

"হয়ত তাই। না হলে অনেক শেখা বাকি থেকে যেত। লেক কালীবাড়িতে এলাম বলেই"

উত্তর না দিয়ে পেঁয়াজি মুখে বলল "মশলা পাঁপড় খাবেন? দারুণ খেতে"

"সেদিন মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে গিয়েও বলেননি। বলেছিলেন পরে বলবেন"

"কী হবে, আমার কথা শুনে?"

"তবুও... শুনতে ইচ্ছে করছে"

"মৃত্যু শুরু-ও নয়, শেষ-ও নয়। জাস্ট ট্র্যাঞ্জিশন ফেজ। বুড়ো হলে মৃত্যু, সবার জানা। জীবনের একটা পর্ব। এতে হারাবার কিছু নেই, পাওয়ারও নয়। হবারও নয়, না হবার-ও নয়ই। এখানে জিত-ও নেই, হার-

ও নেই। বিভীষিকাও বলব না। মৃত্যু নিজের মতো আসুক, থাক, যাক। আমিও আমার মতো আসি, থাকি, যাই। কাউকে নিতেও বলছি না। না নিতেও নয়”

শর্বরী চুপ। পেঁয়াজি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল নেই। খাওয়ার থেকে অন্য এক পৃথিবীতে। দেবজিতের কথাগুলো একেবারে যে বুঝতে পারছে না, তাও নয়। যেন হালকা কুয়াশায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা। নেই, আবার আছেও। একরাশ কুয়াশায় অন্ধকারের বুক চিরে দোয়েলের গান। ওর কথা, ভাবনা, চিন্তা মন জুড়ে বুদ্ধি, বিবেক চেতনায়। আধো-অন্ধকারে, স্বপ্ন-বাস্তবের মায়াঘেরা শুধু একজনের মুখ। হাসি-কান্না, দুঃখ-আনন্দ, ভালোবাসা-ঘৃণাগুলো মিলেমিশে মানুষটির বুকে মুখ লুকতে চাইছে। স্বামী, প্রেমিকের নয়। দেবজিতের। অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। ওকে পার্থিব সম্পর্কে জড়িয়ে নামাতে চায় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চাইছে ওকে। একই সঙ্গে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ দূরে সরাতে বদ্ধপরিকর।

কম বয়সে কৃষ্ণকলি বসুর প্রেমে পড়েছিল। তারপর বহুবছর পার হয়ে গেছে। অনেক পুরুষ এসেছে। ভোগ করেছে, ভোগ দিয়েছে। এই মানুষটাই মনে নাড়া দিয়ে গেল। পাওয়া বা ভালোবাসা নয়। শুধু একটা অনুভূতি। যা বুঝলে তাঁকে চেনা যায়। সে যেন ক্ষীণ হলেও চিনতে পারছে এই অন্য মানুষটিকে। এই চেনা, বোঝা, তার আগামীর বাঁচার মন্ত্র। কিছুক্ষণ আগে ভাবছিল, বাঁচবে কী নিয়ে? এখন রসদ পেয়ে গেছে। চলার অঙ্গীকার।

এ ছাড়া কোনও গাতি নেই।

এ ছাড়া কোনও পথও নেই।

ছত্রিশ

মার্ক। মার্ক জেফারসন। মার্ক যে সেদিন ফ্লোটেলে এমন কাণ্ড করে বসবে বুঝতে পারেনি। আগে কতবার দেখা, কথা, খাওয়াও হয়েছে। কখনও তো বোঝেনি। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারেই সীমাবদ্ধ। এবার অন্যরকম।

মার্কই চেয়েছিল "দেয়ারজ এ নিউ হোটেল অন দ্য রিভার। লেটস গো ফর এ ক্যান্ডেললাইট ডিনার"

গঙ্গাবক্ষে ফ্লটেলের ব্রিজেস রেস্টুরেন্টের ডেকে মোমবাতির আলো-আঁধারিতে হোয়াইট ওয়াইনে চুমুক। ঐত্রিলা মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা একফালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে। মেঘটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কালো আকাশে দু-একটা তারাও। তারা গোনার বয়স হয়ত নেই। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে জলের কলধ্বনি মন্দ লাগছে না। তার প্রতিবেদন মার্কের মুখে। ফর্সা লম্বা, চাপা দাড়ি, রিমলেস চশমা, সাদা শার্ট প্যান্ট, মধ্য চল্লিশের মার্ককে কেউ সুপুরুষ বলবে না। যদিও চলনে বলনে পৌরুষ প্রকট। মোমবাতির আলোয় মার্কের দিকে চেয়ে।

মার্ক হঠাৎ উঠে ডেকের ওপর নতজানু। ডান হাত এগিয়ে বলল "উইল ইউ ম্যারি মি?"

চমকাবারই কথা। আগেরবার যখন এসেছিল, তখনই শুনেছিল "উই আর ইন সেপারেশন। সুন দ্য ডিভোর্স উইল বি কমপ্লিট"

"হোয়াট অ্যাবাউট দ্য চিল্ডরেন?"

"দে হ্যাভ সেটেল্ড ইন দেয়ার ওন ওয়ার্ল্ড। এমি ইজ গোয়িং স্টেডি উইথ রিচার্ড। প্ল্যানিং টু গেট ম্যারেড সুন"

ওদেশে এটা এমন কোনও ব্যাপারই নয়। আকছার হচ্ছে। তখন কথাটার তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অভয় যাওয়ার পর অনুভব করছে সেই বিশ্বায়ন এখন এদেশেও। সম্পর্কটা একটা বর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুর খেলনার মতো তাকে আঁকড়ে অলীক মায়াজালে বাঁচা।

মার্কের চোখের দিকে তাকাল। একবার। আবার একবার। আবার। সেই মুহূর্তে মনে হল সে সম্পূর্ণ নারী। অভয় সেনের পরে সায়ন্তনি ক্ষণিকের। ভবিষ্যৎ তো হতে পারে না। পুরুষকে নিয়ে যদি ভবিষ্যৎই হয়, মার্ক হলে ক্ষতি কী?

মার্কের হাতে হাত চেপে চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করল "আই উইল" আকাশে তারা জ্বলছে কি না দেখেনি। চাঁদ মেঘের ফাঁক দিয়ে কতটা উঁকি দিয়েছে বুঝতে চায়নি। চোখ বন্ধ করে অনুভব করল নতুন

সিম্ফনি। বিথভেনের মুনলিট সোনাটার রেশ। হার-জিতের লড়াইয়ের বাইরে। আবার দৃঢ় ফিসফিস "আই উইল মার্ক"

ডেকে ভর দিয়ে চেয়ারে বসল মার্ক। লস এঞ্জেলসে অনেকবার ভেবেছে ওকে নিয়ে। ওর স্বামী বাচ্চার কথা ভেবেই আশাকে সংযত করেছে। এর কোনও পরিণাম নেই। শুধু মধুর স্মৃতি। এবার কলকাতায় বিমর্ষ ঐত্রিলাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি ছন্দের অভাব। অ্যামেরিকান মার্ক নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল "সামথিং ইজ রং। হোয়াটজ ইট?"

"মাই হাসব্যান্ড লেফট মি"

"অল অফ এ সাডেন?"

"ইয়েস। সাডেনলি ফর এ ইয়ঙ্গার চিক"

"গুড লুকিং?" চাপা দাড়ির ফাঁকে হাসি।

"স্কিন অ্যান্ড বোনস। এ স্মল স্ক্রিন অ্যাক্ট্রেস"

"অলমোস্ট ফরগট। হি ওয়াজ ইন দ্য স্মল স্ক্রিন। ডিভোর্সড্ নাউ?"

"প্রসিডিংস ইন দ্য পাইপলাইন। উড বি ওভার সুন। বাই মিউচুয়াল কনসেন্ট" গঙ্গার মৃদুমন্দ কলধ্বনির দিকে তাকিয়ে।

তখন কিছু না বললেও রাতে পার্ক হোটেলের স্যুইটে কথাটা নিয়ে ভেবেছে। অভয় সেনকে নিয়ে নয়। ঐত্রিলা আর ওর মেয়র কথা। ছেলে-মেয়েরা দূরে চলে যাওয়ার পর নিজেও একা। ঘর সংসার খুঁজছিল। বাঁচার স্পৃহা। সুইমিং পুলওয়ালা প্রাসাদ খাঁ খাঁ। নন ফর কম্প্যানি। আরেকটা বিদেশি বিয়ে করলে সেও যে এমির মতো গুডবাই করবে না, কীসের গ্যারান্টি? জৈবিক ক্ষুধার থেকেও নিঃসঙ্গতা গ্রাস করছে। বারবার ভারতে এসে দেখেছে বেঙ্গলি লেডিস আর গুড হোমমেকার্স। ঐত্রিলাকে বরাবারই ভালো লাগত। সিম্পল হোমলি গার্ল। ওর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না বলেই 'লেট হার বি হ্যাপি' এভাবেই সান্ত্বনা দিয়েছে নিজেকে। ওর ডিভোর্সে আশার আলো। সব কিছুরই একটা সময় আছে। নাউ অর নেভার। প্রব্যাবলি দিস ইজ দ্য টাইম। তাই শেষমেশ বলেই ফেলেছে।

চেয়ারে বসে বলল "আই উইল টেক কেয়ার অফ ইওর ডটার। ইজ সি স্টিল ইন আসানসোল?"

"ইয়েস"

"উইল সি কাম টু স্টেটস উইথ মি?"

"ডোন্ট নো। প্রেজিয়ুম আফটার হার একজ্যামস ইট উডন্ট বি এ প্রবলেম। আইল আস্ক" মনে হল মেয়ের আপত্তি থাকবে না।

কলকাতা আর ঐত্রিলাকে আকর্ষণ করে না। উচ্চবিত্ত সমাজে ডিভোর্স নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে ডিভোর্স মানে শুধু স্বামী হারানোই নয়, গোটা সমাজকে হারানো। এখন কাজের বাইরে নিঃসঙ্গ টিভি দেখা বা সায়ন্তনির সঙ্গে বেরিয়ে আসা। সেটা বাঁচা হতে পারে না। সায়ন্তনির মধ্যে অধিকারবোধ প্রবল। আশা করছে মানেই হতাশা। সেটাই ভয়ের। অনেক হয়েছে। আর নয়। আশা-হতাশার দোলাচলে থাকতে চায় না।

স্টেকে কামড় দিয়ে মার্ক বলল "আর ইউ শিওর?"

ঐত্রিলা ওয়াইনে চুমুক দিল "প্রিটি মাচ সো। হোয়াট এলস্ ইজ লেফট্ হিয়ার এক্সেপ্ট মাই ডটার? সি কুড পারসিউ হার হায়ার স্টাডিস দেয়ার"

গঙ্গার বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে। দূরে ওপাড়ে রামকেস্টপুর ঘাটের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। অন্ধকারে ঢেউয়ের ওঠাপড়া। বাঁ দিকের সাজানো স্টেট ব্যাঙ্কের আলোর রোশনাই। কেবল অতীতের কৃত্রিমতা, যেখানে ঐত্রিলা আর নেই। অভয় মনোলীনার সঙ্গে আপাত সুখের বাসরে। মধ্যবিত্ত রুচির ঐত্রিলার ভাবার ইচ্ছেও নেই। রামকেস্টপুর ঘাটের আলোয় খুঁজে পাচ্ছে আগামীর দিশা। এখন আর কোলাহল নয়। নিভৃতে শান্তির পথ খোঁজা। যার পাশে চুপচাপ অনুভবে জীবন কাটানো যায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মার্ক জেফারসন বোধহয় সেই ঠিকানা। সে যদি ঐত্রিলাকে চিনে থাকে, এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা আশা করতে পারে? ওই ঢিমে আলোই আগামীর ধ্রুবতারা। স্ট্র্যান্ড রোডের ধারে নব-সজ্জিত কলকাতা নয়।

"হোয়াই অল অফ এ সাডেন?"

"ইটজ নট অ্যাট দ্য স্পার অফ দ্য মোমেন্ট। ফ্যান্সিড ইউ। বাট ইউ ওয়ার ম্যারেড। সো রিফ্রেন্ড ফ্রম এক্সপ্রেসিং মাই ফিলিংস। ট্রেসারড ইট উইদাউট এ রে অফ হোপ"

"অ্যান্ড নাউ, অ্যাজ আই অ্যাম গোয়িং থ্রু মাই ডিভোর্স, ইউ থট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু এক্সপ্রেস?"

মার্ক ওয়াইনে চুমুক দিল "নাউ অর নেভার"

দাদু দিদা বেঁচে নেই। বাবা-মাকে জানাতেই হবে। ঐত্রিলা সুখী হলে, ওরাও খুশি হবে। এখন দিল্লি যাওয়া আর বিদেশ যাওয়া এক। উন্নততর ধ্রুবতারার খোঁজে সেও পাড়ি দেবে। কলকাতায় মোহ নেই। এখন শুধুই ধ্রুবতারা। হারজিতের বাইরেই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মার্কের উত্তরে বলল "ইয়েস, নাউ অর নেভার। মে বি দ্য রিদিমস্ অফ মেলাঙ্কলি উইল একো অ্যাট দ্য বসম অফ আওয়ার সোল"

"পোয়েটিক। আরেন্ট ইউ?"

"ডোন্ট নো। হোয়াদার ইউ ওয়েস্টার্ন পিপল উড আন্ডরস্ট্যান্ড। উই ইস্টার্ন পিপল ড্যু এভরিথিং উইথ আওয়ার সোল। ক্যান ইউ ক্লিং টু মি?"

ঘাবড়ে গেল মার্ক "ইফ আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফিলসফি, উডন্ট হ্যাভ অ্যাপ্রোচড ইউ। ইট ক্যুড হ্যাভ বিন এনি গার্ল ফ্রম আওয়ার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড"

ঠিক বলছে। নইলে সাগর পার হয়ে রাজকন্যার খোঁজে আসত না। পশ্চিমে অ্যাচিভমেন্টের বাইরে প্রাসাদের নিঃসঙ্গতা মার্ক উপলব্ধি করেছে। ওকে পাশে পেলেই মন পূর্ণতা পাবে।

এখানে ঈশ্বর আরাধনায় মূর্তি লাগে। পরমাত্মাকে জীবাত্মায় দেখতে। মার্ককেও সেই গভীরে পৌঁছতে পুবের রাজকন্যের হাত ধরতে হবে। যা দেখা যায় না, তাকে বুঝতেও পারে না। যা ছোঁয়া যায় না, তাকে কেমন করে অনুভব করবে? মাইট বি হোল্ডিং দ্য হ্যান্ডস্ অফ দিস গার্ল হি ক্যান ফ্যাদম হিজ ইনার সেলফ। মন বলছিল, মে বি নয়, শিওর।

"ক্যুড ফিগার দ্যাট। ইউ ওয়েস্টার্ন পিপল আর সো ভিজিল্যান্ট অ্যাবাউট এভরিথিং ইউ ড্যু" লিপস্টিকের ফাঁকে হাসির ঝলক চোখ এড়ায়নি।

এমি যাওয়ার পর অনেকেই এসেছে। হি হ্যাড টু স্যাটিসফাই হিস ডিসায়ারস। বাট ওনলি প্লাউ দেয়ার ক্রেভিসেস ফর দ্য অর্গ্যাজম। অ্যানাদার পিস অফ মিট, উইদাউট সোল হুম হি ক্যুড ক্লিং "নাউ ইউ নো। ইট ওয়াজন্ট অ্যাট দ্য স্পার অফ দ্য মোমেন্ট"

"ডিডন্ট থিংক ইট ওয়াজ। জাস্ট জোকিং। হ্যাভিং নোন ইউ ফর এ হোয়াইল ইউ উডন্ট হ্যাভ কাম আউট জাস্ট লাইক দ্যাট। ক্যুডন্ট হ্যাভ বিন অ্যাট এ বেটার টাইম" স্টেকটা কাটল "সিওর মার্ক?"

"অ্যাবসলিউটলি। নট ফর ফান, বাট টুগেদারনেস"

ঐত্রিলার মনে হল ঈশ্বরই পাঠিয়েছে। টেক লাইফ অ্যাজ ইট কামস্। সেদিন রাতে ভডকার নেশায় সায়ন্তনির আবেগ জড়িত কণ্ঠস্বর "আমাকে ছেড়ে যাবে না তো" ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। পানীয়র মাদকতায় আবেগের আতিশয্য নয়। আলো-আঁধারিতে ওর মুখে ভালোবাসার আভা। একটা মেয়ে বন্ধু হতে পারে, প্রেমিকা নয়। সেভাবে বড় হয়নি।

বলেছিল "আমরা সবাই একা। একাই বাঁচতে হবে"

নেশার ঘোরে বললেও, নেশা নয়। কথাচ্ছলে বললেও, কথা নয়। মনের কথা অনুভব করতেই ভয়। তাকে জীবন খুঁজে নিতে হবে। এই মহিলা তার বাঁচার পথ নয়। ফেরত এসে যখন দিশাহীন, আলোর নিশানা খুঁজছে, তখনই মার্কের প্রপোজাল।

"হোয়াই মি? শিওর ওয়েস্টার্ন গার্লস্ আর বেটার ইন বেড"

“ওনলি ইন বেড। নট আদারওয়াইজ। নট লুকিং ফর বেড পার্টনার এত্রি। লুকিং ফর দ্য সোল”

“অ্যান্ড ইউ থিংক, ইউ কুড গেট দ্যাট ফ্রম মি?”

“ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ হ্যাভ”

“অ্যান্ড হোয়াট ড্যু আই হ্যাভ?”

“এ সোল হুইচ ক্যান ফিল বিয়ন্ড”

“রাই। আদার ডে মেট এ জেন্টেলম্যান দেবজিৎ। ইনসিডেন্টালি হি ইজ দ্য প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি। এ হাই অফিশিয়াল ইন দ্য গর্ভনমেন্ট। হোয়াট হি ওয়াজ টকিং ইজ রেলেভ্যান্ট টু ইওর আইডিয়াস”

“হোয়াট ডিড হি সে?”

“ডোন্ট রিমেম্বার দ্য এক্সজ্যাক্ট ভার্সেস অফ আদি শঙ্করাচার্য। ইট মিনস্ গিফট্ অফ দ্য গ্যাব, দ্য কেপেবিলিটি টু ডেফাইন এ সাইন্স অর থিওরি, দ্য ফ্ল্যামবয়েন্স অফ ওয়ার্ডস্ অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স অফ মেটিরিয়ালিজম মাইট বি অ্যান অ্যাকসেসরি টু ওয়ে অফ লিভিং, বাট বাই নো মিনস্ দ্য এন্ড”

“দেন হোয়ার ইজ দ্যাট এন্ড?”

“ইন দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ সোল। সাবমিশন টু অলমাইটি”

“আই নো, ইটজ হিয়ার আই উইল আল্টিমেটলি ফাইন্ড দ্য এসেন্স অফ মাই ডেস্টিনি”

“থ্রু মি? মাস্ট বি আউট অফ ইওর মাইন্ড”

“আই অ্যাম নট। আই অ্যাম নো ফুল। আই হ্যাভ সিন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইট কান্ট বি লাইফ ইজ মিয়ারলি এ ওয়ে অফ লিভিং। ইফ সো, হোয়াই দেন দিস ইন্টেন্স থ্রবিং এক্সপেক্টেশন আউট অফ লাইফ? মাস্ট হ্যাভ এ ডেফিনিট ডেস্টিনি সামহোয়ার”

স্টেকের শেষ অংশটা মুখে পুরল “নো ক্লু। দিস ম্যান হ্যাজ শোন মি দ্য ওয়ে। রেস্ট ফর মি টু এক্সপ্লোর”

“লেট মি হোল্ড ইওর হ্যান্ড অ্যান্ড ট্রেড দ্য পাথ ফর দ্য আন্সার”

দূরে কোথায় একটা সাইরেন বেজে উঠল। কোনও লঞ্চ ছাড়বে। সেই ভেঁপু শুনে মার্কের মনে হল, শব্দটা নিছক এক গন্তব্য থেকে আর একে পাড়ির সংকেত। গভীরে সিম্ফনির স্কোর। যার প্রথম সুর পেয়ে গেছে। এবার বাকিটা রচনা করতে হবে।

ঐত্রিলার হাতটা হাতে নিল “বিলিভ মি এত্রি, ইট ইজন্ট সেক্স, হুইচ ইজ ইজিলি অ্যাভেলেবল। গন থ্রু দ্যাট ফেইজ। লুকিং ফর সামথিং এলস। সামথিং আউটসাইড দিস মান্ডেন এভিভারস অফ এক্সিসটেন্স। দ্য ডেস্টিনি অফ মাই বিইং”

চেয়ার ছেড়ে ডেকের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। দূরে মেঘটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ বেরিয়ে আসছে। হয়ত সেখানে কোনও পাগল মুনলিট সোনাটা বাজচ্ছে না, হয়ত কোনও মাঝি গলা ফাটিয়ে গানও গাইছে না। ফ্লোটেলের ডেকের ওপর সু-সজ্জিত স্টেট ব্যাঙ্কের আলোটা সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। তবু সেই বিশাল অন্ধকারে প্রবীণ চাঁদ মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে হাসছে, ভরিয়ে দিচ্ছে ঐত্রিলার দাঁড়িয়ে থাকা স্যিলুট।

নাই বা পেছন ফিরে তাকাল আলোকিত স্টেট ব্যাঙ্কের দিকে। ওরা বুঝবে না। ওরা মার্কদের পা চেটে, ওদের অনুকরণ করে সার্থকতা খুঁজবে। ওদের দুনিয়ায় ওরা থাকুক। সেখানে অভয় সেন, মনোলীনা উজ্জ্বল নক্ষত্র। ঐত্রিলার জায়গা নেই। ওর জায়গা মার্কের পাশে। যে সব দেশ ঘুরে, আজ ঐত্রিলাকে চায়। মনের ঠিকানা খুঁজতে। তার জীবনে অনুরণন। তাকে পেতে হবে দেবজিতের শ্লোকের রেশ ধরেই।

সাঁইত্রিশ

এত রক্ত দেখে চমকে উঠেছিল বিদিশা। মুহূর্তেই বুঝতে পারল কাঁচা হাতের কাজ। ভেসেলটা আধা কাটা। তাই ব্লিডিং বেশি। ইর্মাজেন্সির সীমিত আলোয় এত রক্তের মধ্যে কিছুই বোঝা যাবে না। দেখা অর্থহীন। অপারেশন থিয়েটারেই দেখে করতে হবে। সময় নষ্টে পেশেন্টের কষ্ট বাড়ানো।

সায়ন্তনির হাতটা ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে বলল "হাত কাটলেন কী দিয়ে?"

উত্তরটা জানা। ছুরি দিয়ে। তবুও পেশেন্টের কনফার্মেশনের জন্য। সায়ন্তনি নির্বাক সিলিংয়ে চেয়ে।

"অপারেশন থিয়েটারে ড্যামেজ রিপেয়ার করতে হবে"

"কী লাভ?" ফ্যাল ফ্যাল চোখ। বাঁচার অর্থ নেই। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার আলোয় নতুন আশা ভেঙে চুরমার।

হাতটা ড্রিপ স্ট্যান্ডে ঝোলাল "আর কে আছে বাড়িতে?"

"কেউ নেই। আমার কেউ নেই" বিড়বিড় আওড়ানোর মধ্যে চোখে জল। কালো মুখটা রক্তক্ষরণে ফ্যাকাসে। ঠোঁটের ফাঁকের কথাগুলো বোঝা যাছে না। তবু অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার আগে জানা প্রয়োজন।

"আপনার স্বামী?"

"নেই। কেউ নেই"

বিয়ে করেননি?" সিঁদুর চোখ এড়ায়নি। জবাব নেই "কী নাম আপনার স্বামীর?"

অস্পষ্ট ফিসফিস করে বলল "অরণি নাগ"

ছ্যাঁত করে উঠল বিদিশার বুকটা। এই কী তবে অরণির স্ত্রী? নামটা মিলে যাচ্ছে। এ দশা কেন? অরণির কাছ থেকে শুনে ধারণা হয়েছিল, সায়ন্তনি আত্মহত্যা করার মেয়ে নয়। যে মেয়ে অনেক ছেলের সঙ্গে অর্গিতে তৃপ্তি পায়, সে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? হিসেবটা মিলছে না। যারা লাজুক, তারাই মানসিক ভারসম্যহীনতার শিকার। শুনেছিল সায়ন্তনি লাজুক প্রকৃতির নয়। উগ্র আধুনিকা।

"অরণি নাগ?"

সম্মতির মাথা নাড়ল। তার জীবনটাই আগাছার মতো। আজও দিশাহীন। নোঙর খুঁজছিল। একটা আশ্রয়। তারই খোঁজে গিয়ে থাপ্পড়। কেলেভূত সোসালাইট মা বাবাকে হাসিল করেই ক্ষান্ত। সুপুরুষ স্বামী। গর্ব করার বৈকি। তার বাইরের দুনিয়াকে সময় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। মেয়েটা শুধু সম্ভোগের আধার। সুপুরুষ

বাবাকে বন্দি করার নিশ্চিত বন্ধন। মানুষটাকে পায়নি। বাবা যে খুব পবিত্র, তাও নয়। সুপুরুষ, উচ্চশিক্ষিত, সামাজিক প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তির দিকে বউরা একটু-আধটু ছুকছুক করবে না, ভাবাও ভুল। ব্যস্ত স্বামী সময় দিতে অপারগ হলে অন্য সুপুরুষের দিকে ঢলবে, এটাই ভবিতব্য। যৌবন, আর্থিক সচ্ছলতা, রঙিন ফোয়ারা সব-ই ছিল। ছিল না শুধু, স্বাভাবিক কৈশোর, মায়ের কোলে শুয়ে রাজপুত্তুরের গল্প। সন্ধেতে পড়া। রাতে মায়ের ঘুমপাড়ানি গান। ছিল না নতুন দিশার স্বপ্ন। অর্থ, ভোগ, প্রাচুর্য থাকলেও প্রাণ ছিল না সায়ন্তনির জন্য।

তাই মন খুঁজতে হাটে সায়ন্তনি। দেহ দিয়ে মন। নারীর সৌন্দর্য মায়ের জিনসে নেই। তাই সৌন্দর্যের ঘাটতি উরুদ্বয়ের উন্মোচনেই পূরণ। মায়ের পথে। কাজে লাগাতে পারলে কালীশেখরের মতো কিছু। জুটেও গেল। কিন্তু গাঁটছাড়া বাধাতেই লন্ডভন্ড। সায়ন্তনিকে মানসিকভাবে খুব সুস্থ লাগছে না। মনের কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত হাতের টেন্ডন, নার্ভ রিপেয়ার। ওকে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে অপারেশনের তোড়জোড়।

ট্রলিতে সায়ন্তনির মনে হল যখনই কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়, ভাগ্য ছিনিয়ে নেয়। জিতেও, হেরে যায়। মন্দারমণিপুরের স্মৃতি আঁকড়ে অজান্তেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। ঘর, আশ্রয়। দুই পরাজিত প্রাণের বাঁচার বন্ধন।

ঐত্রিলাকে ফোন করতে বলেছিল "আসবে? এস"

আতিথিয়তার কোনও ত্রুটি করেনি। চা জলখাবার। কুশল সংবাদ। সায়ন্তনি তো চা-জলখাবার খেতে যায়নি। গেছিল ভালোবসার কথা জানাতে।

"ভালোই হল, আজ এলে। নইলে আমাকেই যেতে হত"

"আমাকে মনে পড়ছিল?"

"ভীষণভাবে। বিয়ে করছি। নেমতন্ন করতে যেতেই হত"

আকাশটা ভেঙে পড়েছিল সায়ন্তনির। সপাটে থাপ্পড়।

"হুট করে বিয়ে?"

"কিছুই ঠিক ছিল না। সেদিন মার্ক হ্লোটেলে ডিনারে ডেকেছিল। হঠাৎ প্রপোজ করল। না বলতে পারলাম না"

"মার্ক কে?"

"অ্যামেরিকান, ডিভোর্সি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে কাজ করে। কাজের সূত্রে মাঝেমধ্যে কলকতায় আসত। আলাপ-পরিচয় ছিল। কিন্তু হুট করে প্রোপোজ করবে, বুঝতেও পারিনি" ঐত্রিলার মুখে প্রসন্নতার ঝিলিক।

"প্রোপোজ করল আর রাজি হয়ে গেলে?"

“কেন হব না। আমাকেও তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। মোরওভার উই থিংক অ্যালাইক। সেম ওয়েভলেংথ”

“ফরেনারকে বিয়ে করবে। তোমার মেয়ে?”

“মাধ্যমিক হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে অ্যামেরিকায় থাকবে”

সব তাহলে ঠিক। দুঃখে ব্যথায় মোচড়। আর তো বলা যাবে না ‘তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।’ ছেলে হলে চেষ্টা করা যেত। ঐত্রিলাকে ভালোবাসা কেউ মানবে না। ঐত্রিলাও।

“দু’উইক পরে আইটিসি সোনারে রিসেপশন। তোমার আসা চাই। বাই দ্য ওয়ে হাউ ইজ ইওর হাবি?”

“পাগল হয়ে গেছে। লং টার্ম মেন্টাল কেয়ার হোমে”

“সরি টু হিয়ার দ্যাট”

উঠে পড়ল সায়ন্তনি। অনুকম্পা, সহানুভুতি চায় না। প্রাণভরা ভালোবাসা চায়। যা তার সত্যকে ভুলিয়ে বাঁচার প্রেরণা দেবে। ভডকা, ঘুমের বড়ি দরকার হবে না। জীবনের তালগোল পাকানো ঠাট্টাগুলো চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। সে পালাতে চায়। বাঁচতে চায়। মনে পড়ল আকাশের পশ্চিম কোনার শেষ তারাটার কথা। তার কথা। তার মতো হাজারও হতভাগ্য শিশুর কথা। অচিনপুরের সোনার কাঠি চাই। চাই বাঁচার উপায়। মাঝরাতের দুঃস্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে পারছে না। নেশার ঘোরে ভুলে থাকতে চায় না। পালাতে চায়। দূরে, বহুদূরে, অলীক স্বপ্নের মায়াবী আনন্দের মায়াপুরীতে। চিরনিদ্রার দেশে। ইতিহাসের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পর্দার আড়ালে।

“ম্যাডাম চলুন। অপারেশন থিয়েটারে” নার্সের কথায় ফিরে তাকাল।

বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। ফ্ল্যাপ সরাতেই কয়েকটা সুপারফিশিয়ল টেন্ডন কাটা দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না, কিচেন নাইফের কাজ। মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভ ঠিক আছে। কেটেছে শুধু পামারিস লঙ্গাস আর রেডিয়াল আর্টারি। রেডিয়াল আর্টারির মাইক্রোভ্যাস্কুলার অ্যানাস্টমসিস করতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। সায়ন্তনি আত্মহত্যা করতে গেল কেন? অরণি করলে আশ্চর্য হত না। কাল ডাঃ জগদীশ রামকে রেফার করতে হবে।

ডাক্তারদের কাজটা থ্যংকলেস। সারারাত আপ্রাণ চেষ্টায় পেশেন্টকে ভালো করা। অথচ পান থেকে চুন খসলেই মিডিয়া-সমাজের কোপ। এত ব্যবসা কেন্দ্রিক যে, ন্যায়-অন্যায় বোধগুলোতেও স্বার্থের গন্ধ। বোকা পাবলিক নেপথ্য কাহিনি না বুঝে নেত্য শুরু করে শূলে চড়িয়ে দেয়। যারা খাওয়াচ্ছে তারা তো টিআরপি আর বিজ্ঞাপনের জন্যেই করছে, বুঝতেও পারে না।

সকালের রাউন্ডে দেখল, সায়ন্তনি জানলা দিয়ে খোলা মাঠে উদাসীন চেয়ে।

ভুবনমোহিনী হাসি “কেমন আছেন? বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি। একটা আর্টারি, দুটো টেন্ডন। ছ’সপ্তাহে ফিট”

কোনও উত্তর নেই। মানসিক অবসাদে জর্জরিত বিদিশার বুঝতে অসুবিধা হল না। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে নার্সকে বলল “দু’কাপ কফি দিতে বল”

সায়ন্তনির সঙ্গে গল্প করতে চায়। ও শুধু একজন পেশেন্ট নয়, মানুষও। বুঝতে হবে। জানতে হবে। নইলে আবার ঘটবে।

“সুইসাইড কেন? জীবনটা বাঁচার জন্য, মরার নয়”

চায়ে চুমুক দিল সায়ন্তনি “বেঁচে কী হবে?”

“হঠাৎ মরতে ইচ্ছে কেন?” বিদিশার আন্তরিকতায় একটু আশ্বাস। ঐত্রিলার হঠাৎ বিয়ের সিদ্ধান্তে আঘাতের ওপর মলম।

বেশ খেলছিল ট্যানিয়া, সুলগ্নাকে নিয়ে। হঠাৎ ঐত্রিলাকে ভালোবেসে ফেলবে বুঝতে পারেনি। অবচেতনে আশ্রয় খুঁজছিল। ঐত্রিলা দিতে সক্ষম হয়েছিল। মন্দারমণিপুরে দেহের ঊর্ধ্বে মনের ছোঁয়ায় আসক্তি। একাকিত্বের অবলম্বন, বন্ধন। তার হঠাৎ ভাঙনে টালমাটাল।

“অরণি পাগল হয়ে গেছে। লং টার্ম মেন্টাল হাসপাতালে”

বিদিশার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তার জন্য নিশ্চয়ই নয়। চাপা উদ্বেগ ঢেকে বলল “অরণি কে?”

“আমার স্বামী”

“ছেলে মেয়ে?”

“নেই”

দুঃখী মহিলা। মায়া হল। আঘাত নিতে পারেনি বলেই হুট করে এ কাজ।

“বাড়িতে আর কে কে আছে?”

“কেউ নেই। আমি একা। বাবা-মা অন্য জায়গায় থাকে”

“হাতের প্লাস্টার নিয়ে একা সামলাতে পারবেন না। কাউকে থাকতে হবে”

“কেউ নেই। মায়ের অত সময় নেই। দেখি, যদি কিছুদিন বাবার ওখানে থাকতে পারি”

“জীবনে তো খারাপ-ভালো আছে। এভাবে মুষড়ে পড়লে চলে?”

“খারাপের পর খারাপ যাচ্ছে”

সায়ন্তনির লাগামহীন জীবনযাত্রার কথা তো ও জানে। অরণির থেকে তারই ঈঙ্গিত পেয়েছিল। উচ্ছ্বল জীবন শান্তি দিতে পারে না। তবুও তার পেছনেই লোকে ছোটে। স্বর্গ খোঁজে। নেশা কাটলে ক্রুর বাস্তব

মর্মান্তিক। দুঃস্বপ্নের পাতালপুরী।

বিদিশা সান্ত্বনা দিল “খারাপের পর ভালোই আসে। ভেঙে পড়লে চলে”

“এসব জ্ঞানের কথা। মিথ্যে দিয়ে কী হবে? আমার আগ্রহ নেই”

বিদিশা বোঝাতে পারছে না, না কি সায়ন্তনি বুঝতে চাইছে না। অরণির পাগল হওয়ার পেছনে ওর আঘাত নয়ত? দোষী লাগছে। আগে দেবজিৎদার সঙ্গে দেখা হলে অরণির প্রতি এত নিষ্ঠুর হত না। তাই সায়ন্তনির প্রতি অনুকম্পা। ওকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হবে। এখন মনে হচ্ছে একা পারবে না। দেবজিৎদাকে চাই। দেবজিৎদা কী আসবে? দেখাই যাক।

বাবা ভিসিটিং হাওয়ার্সে এল। মা আসেনি “তোর মাসির শরীর খারাপ। তাই ওখানে”

রাগে গা'টা জ্বলে উঠল। বাবা মিথ্যে বলছে। কদ্দিন এভাবে আড়াল করবে। ঝাঁঝিয়ে উঠল “কদ্দিন এই লুকোচুরি বাপি? তোমার জন্যই আজ এই হাল”

“আমার জন্য যদি হয়, আজ থেকে তোর দায়িত্ব আমার। হাসপাতাল থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবি”

“না” সায়ন্তনির প্রতিবাদ।

“এ হাতে রান্না করবি কী করে? স্নান করবি কী করে? অনেক পাগলামো করেছিস। আগে সুস্থ হ। তারপর যা খুশি করিস”

সায়ন্তনি চুপ। এখন এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভালো লাগুক, চাই না লাগুক মেনে নিতে হবে। সে অসহায়।

বাবা চেয়ার টেনে বসে বলল “অরণিকে জানিয়েছি। কী রকম ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইল। বুঝল কি না বুঝলাম না”

অরণির ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। শুনতেও চায় না ওর রিঅ্যাকশন। ওকে জীবন থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এখন চাই একজন বলিষ্ঠ পুরুষ, যে তার ভার নিতে পারবে। হারানো জীবনটা আবার নতুন করে সাজাতে পারবে। এবার আর কর্তৃত্ব নয়। উড়ন্ত জীবনের স্টিয়ারিং অন্য কারও হাতে। আগাছার মতো জীবনকে রাস্তায় ফেলতে পারবে। সব কিছু ভুলে, সময় হয়েছে নিজের দিকে তাকাবার। নিজেকে সঁপে দেওয়ার। যা বিয়ের পরেই করা উচিত ছিল। কিন্তু করেনি। মা তো শিখিয়ে দেয়নি।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বলল “কিছু বললি না”

“লইয়ারকে বল ডিভোর্সের বন্দোবস্ত করতে। এ বোঝা বইতে পারব না”

“ছেলেটা কোথায় যাবে?”

“জাহান্নামে যাক। আমার কী?”

বাবার ভীষণ অসহায় লাগল। মাকে বললে হাই হাই করে উঠবে ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ এক্ষুনি ডিভোর্স দিয়ে দাও।’ আজ যদি দীপান্বিতা থাকত। সৎ পরামর্শ দিতে পারত। সায়ন্তনি স্বাভাবিক ভাবে বড় হত। আধুনিক না হতে পারে, সাবেকি মহিলা মেয়েকে জীবনে শান্তির মন্ত্র শেখাত। জাঁকজমক না থাকুক, ঘরোয়া বিচার-বুদ্ধির অভাব ছিল না। অজান্তে মেয়ে দ্বীপান্বিতাকে ছাড়ার নির্বুদ্ধিতায় থাপ্পড় মারছে। একাই এখন সামলাতে হবে “সে কথা পরে ভাবা যাবে। অনেক সময় আছে”

বিদিশা ভাবেনি দেবজিৎদা রাজি হবে। এত বড় আমলা। তার কোথায় সময় কোন হাসপাতালে কোন মহিলা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে, তাকে সময় দেওয়ার? তবুও বলল, আসবে। বিদিশার মনে হল রাজি হয়েছে শুধুমাত্র বিদিশার জন্য। ওর প্রেমে পড়েনি সেই রাতেই বুঝেছিল। ফিরে এসে মনে হয়েছিল, প্রেম নয়, অন্য কিছু। কী আজও বুঝে উঠতে পারেনি। যার ভিত্তিতে ওর কোথাও জায়গা করে নিয়েছে।

দেবজিৎ ঢুকতেই সায়ন্তনি বলল “আপনাকে আমি চিনি। মিঃ ট্যান্ডনের আর্ট এক্সিবিশনে এসেছিলেন আমার বাড়িতে। শর্বরী বসু মারফত আলাপ হয়েছিল”

মুখটা চেনা হলেও দেবজিৎ প্লেস করতে পারছিল না। বৈচিত্র্য না থাকলে মনে রাখার কারণ নেই। উল্টোদিকের চেয়ারে বসল “বিদিশা বলল আপনি ভীষণ ভেঙে পড়েছেন”

সায়ন্তনি চুপ। দেবজিৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করছে কোথা থেকে শুরু করবে। চাহনিতে ওকে বোঝার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিক নয়, অস্থির। মেয়েটার মনে অশান্তির ঝড় “জীবনটাকে এত আঁকড়াতে চাইছেন কেন? ছেড়ে দিন। লেট ইট টেক ইটস্ ওন কোর্স”

“তা কী সম্ভব। হয় নাকি?”

“কেন হয় না?”

“আপনার ক্ষেত্রে হয়ত। কারণ আপনি এস্ট্যাবলিশড। আমি তো আপনার মতো কেউকেটা নই”

“ঠিক বুঝলাম না। কেউকেটা হওয়ার সঙ্গে জীবনকে আঁকড়ে ধরার কী সম্পর্ক? আপনি হেরেও জিততে চাইছেন। ছুটতে চাইছেন। কদ্দূর এগোবেন?”

“সবাই যদ্দূর এগিয়ে যায়”

“সব সময় তো জেতা যায় না”

“তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নইলে জীবনটাই শেষ”

“কে বলেছে জেতা-হারার মধ্যেই জীবন? এর বাইরেও জীবন আছে। নিজের জন্য বাঁচা। নাই বা খেলায় মাতলেন। ছোট্ট জীবনকে নিজের মতো করে ভোগ করে নিন, এর বাইরে”

“আপনি দেখি মুনি-ঋষিদের মতো কথা বলছেন”

“মুনি-ঋষিরা বললেও মিথ্যে বলে না তো। চাওয়া ছেড়ে দিন। হারজিতের খেলায় যাবেন না। দেখবেন পাওয়াটা আপনিই এসে ধরা দিয়েছে। এই দৌড় আপনাকে দুঃখ ছাড়া কিছুই দিচ্ছে না। তবে কেন তাকে আঁকড়ে বাঁচতে চান?”

“কে বলল আমি দুঃখকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। সুখকে নয়”

“সুখ কোথায় জানেন?”

বিদিশা আবাক হয়ে শুনছে দেবজিৎদার কথা। একেই সে বিছানায় নিতে মরিয়া হয়ে খড়গপুরে ছুটেছিল। লজ্জা করছে। অন্য কেউ হলে এর পরেও দেবজিৎদার সামনে মুখ দেখাতে পারত না। বিদিশা কাপুরুষ নয়। ভুল করেছে। দেবজিৎদাই তা শুধরে রানির আসন দিয়েছে। মনের রানি।

থমকাল সায়ন্তনি। সুখটা কোথায় সত্যি কী জানে? দেবজিৎ তাকে কোথায় ঠেলে ফেলেছে। লড়তে লড়তে ক্লান্ত। যেখানেই কর্তৃত্ব করতে গেছে, সেখান থেকেই ছিটকে পড়েছে। এবার সমর্পণ। কোথাও কারও কাছে।

অসহিষ্ণু সায়ন্তনি বলল “জানি না”

“যখন জানেন না, ছেড়ে দিন। খোঁজা ছেড়ে দিন। দেখবেন সুখ আপনারই কোলে”

দেবজিৎ উঠে পড়ল। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে পৌরাহিত্য করতে হবে। আর দেরি করা সম্ভব নয়।

সায়ন্তনির সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম কোনও পুরুষ তাকে কয়েক মিনিটেই ধরাশায়ী করতে পেরেছে। সেই তো আদর্শ পুরুষ। তার কাছেই শান্তি।

দেবজিতের সঙ্গে বিদিশাকে বেরিয়ে যেতে দেখে মনে হল ওদের সম্পর্ক কী?

আটত্রিশ

যেন ঝড়। অভয় সেন শুটিংয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই একটার পর একটা ফোন। 'আজকে আপনাকে আসতে হবে না' বা 'শুটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে' অথবা 'মিঃ দাশগুপ্ত বলেছেন আপনাকে আর প্রয়োজন নেই। অন্যজনকে ঠিক করেছি'

ফোন তুলে মনোলীনা প্রতিবাদ করতে চাইলে চিৎকার চেঁচামেচি হতে পারে। জানে তাতে বিশেষ কোনও ফল হবে না। সময় যখন খারাপ যায়, মুখ লুকিয়ে ঘরে থাকাই ভালো। প্রতিবাদ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কারও হাত আছে। গাঁজাওয়ালা বলেছিল 'ইয়ে ইন্ডাস্ট্রি মে তুমহারে লিয়ে কোই জগাহ নেহি।' আজ উঠে-পড়ে লেগেছে সেটা প্রমাণে। সবই সময়ের খেল। এখন মরবার সময়। পাশে কেউ বাঁচাবার নেই। নাইটি ঠিক করে সিগারেট ধরাল। এমনিতে সিগারেট খায় না। ড্রিঙ্ক করলে বা উত্তেজিত হলে খেয়ে ফেলে। নেহাত সকাল। নইলে মাল খেয়ে ভুলে থাকত। মোবাইলে নির্ভীক সমন্বয় মঞ্চের ভাস্কর ভাওয়ালের নম্বর খুঁজছে। নামটা গালভারী হলেও আদৌ মঞ্চ-টঞ্চ নয়। মধ্যবিত্তদের এসকর্ট এজেন্সি।

বছর খানেক আগে। তখন মনোলীনার রমরমা বাজার। পার্ক হোটেলের লবিতে ধুধরিয়ার অপেক্ষায়। হঠাৎ সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, সাদামাটা মফসসলে চেহারার এক যুবক সামনে "ম্যাডাম, আমায় চিনবেন না। আমার নাম ভাস্কর ভাওয়াল। একটা এজেন্সি চালাই"

মনে হয়নি, এ পার্ক হোটেলের কোনও ক্লায়েন্ট।

"বাড়ি পশ্চিম দিনাজপুরে। বাবা প্যারালাইজড। মা বেশি লেখাপড়া করেনি। বোন দুটো স্কুলে। আমি বাংলায় এমএ। অনেক চাকরির চেষ্টা করেও পাইনি। পার্টি-পলিটিক্স করি না। ওখানের সাহায্যও নেই। শেষমেশ একটা এজেন্সি খুলি"

কার্ডটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল "কীসের এজেন্সি?"

আমতা আমতা করে বলেছিল "বড়লোকদের যেমন এসকর্ট সার্ভিস, গরিবদের জন্যও সেরকম একটা। ওদের রেস্ত আছে, অ্যাড দিতে পারে। আমার তো নেই। তাই লোকমুখে। সংসার তো চালাতে হবে"

অসহিষ্ণু হলেও অভদ্রতা করতে চায়নি "আমি কী ভাবে?"

"সিরিয়ালে তো অনেক গরিব ঘরের মেয়েরা আসে। তারাও কিছু কামাতে চায়। তাদের সাহায্য করতে পারি। আপনার অনেক মহলে চেনা। যদি কয়েকটা ক্লয়েন্ট দেন। অবশ্য এর জন্য উপযুক্ত কমিশন দেব"

রাগে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েছেলের দালাল। সাহস তো কম নয় তার কাছে কমিশন কষছে। সিরিয়ালে এত নাম। হিরোইনও হতে পারে। সাহস তো কম নয়। উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

পেছনে থেকে ভাস্করের উক্তি "সব সময় একরকম যায় না। রাগ করবেন না ম্যাডাম। প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ করবেন"

আজ অর্থের কতটা প্রয়োজন, জানে না। কিন্তু অর্থ-যশ-প্রতিপত্তির নেশায় পেয়েছে। গাঁজাওয়ালার থাপ্পড়টা তার জেদটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে জিততেই হবে। গাঁজাওয়ালা হাত ধুয়ে লেগেছে, ওকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে হাটাতে। ঝগাড়াঝাটি, কনট্যাক্ট ট্যাপ করে হয়ত কয়েকটা সিরিয়াল বাগাতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না। যে টাকা খসায়, সেই কথা বলে। যদি সেটাই আধিপত্যের হাতিয়ার, তবে সে কেন সেখানে উত্তীর্ণ করতে পারবে না। তাহলেই সম্রাজ্ঞী। এখন রোল হাসিল নয়। সেই ঠিক করবে কোন রোলে কে।

ফোন করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল এক পুরুষ কণ্ঠ "কে?"

"সিরিয়ালের মনোলীনা। বছর খানেক আগে পার্ক হোটেলে দেখা। ভাস্কর ভাওয়াল?"

"এতদিনে মনে পড়ল?" কণ্ঠে আন্তরিকতা। পশ্চিম দিনাজপুরের শিক্ষিত। নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। পাবলিক রিলেশনই সম্বল।

"দেখা করতে চাই"

"কবে ফ্রি?"

"আজকে। সম্ভব?" নরম স্বর।

"চলুন কোথাও বসি। আনন্দপালির সিআইটি কাফেতে একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। ঠিক সাড়ে বারটা" ফোন কেটে দিল।

ঈশ্বর যখন সব পথ বন্ধ করে দেয় একটাই খোলা থাকে। এগোনর পথ। ভালো কি মন্দ, জেতা কি হারা সময়ই বলে দেবে। এত প্রতিরোধের মধ্যেও পথ খুঁজে পেয়েছে সেটাই বড়।

সিআইটি কাফেতে পৌঁছল বারোটা-পঁচিশে। সিরিয়ালের মেয়েরা এখানে আসে না। ওকে দেখে বেয়ারাও হকচকিয়ে গেল। সাড়ে-বারোটার ভাস্কর এল। মনোলীনা চিনতে পারেনি। পার্ক হোটেলে এক মুহূর্তের জন্য দেখা। ছোট পর্দার মনোলীনাকে চিনতে ভুল হয়নি।

উল্টোদিকের সোফায় চাপ দাড়ি, হাল্কা নীল ট্রাউজার চেক শার্টের তরুণ বলল "ভাস্কর ভাওয়াল। বোধহয় চেহারাটা ভুলে গেছেন। চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?"

মিষ্টি হেসে মনোলীনা বলল "এ পাড়াটা চেনা। সিরিয়ালের আগে রোলের আশায় নিতাই বসুর ওখানে প্রায়শই আসতাম। ওনার জন্যই আমার প্রথম ব্রেক। এখন অবশ্য আসা হয় না। জায়গাটা চেনা"

মেনু কার্ড এগিয়ে বলল "কী খাবেন?"

"দুপুরে খাই না। সুপ আর স্যালাড বলে দিন"

"ব্যস, এইটুকুই! অভিনয়ের জন্য বডি ফিট রাখছেন?" ঠাট্টা করল।

"এর বেশি খেতে পারি না। খেলেই বমি হয়ে যায়"

ভাস্করের মনে হল মনোলীনা কোনও সেলিব্রিটি নয়। পরিচিত। দম্ভ, অহংকার চুরমার। রনিত গতি করতে পারত। কিন্তু ওর এডসের খবরে আর কাছে যেতে চায় না। নিজের জ্বালার মধ্যে রনিতের এডসের জ্বালা সামলানো কঠিন হবে। শর্বরীকেও বলতে পারত। শর্বরীর কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হতে মন চায়নি। অহংকে ওই দুনিয়ায় নামাতে চায় না। গাঁজাওয়ালার সঙ্গে নিভৃতে লটঘট এক। সকলের সামনে পরাজয় স্বীকার করা আরেক। যা করার, নিজেই করবে।

"কী করতে পারি?"

"আপনার এজেন্সিতে কাজ করতে চাই। কমিশন বেসিসে নয়। পার্টনার হিসেবে"

হকচকিয়ে ভাস্কর বলল "মানে?"

"আপনার এজেন্সির নাম নির্ভীক সমন্বয় মঞ্চটা সেকেলে। এখন পর্যন্ত কেটার করেন লোয়ার মিডল আর মিডল ক্লাসদের। যদি জয়েন করি ওটা আপার মিডল ক্লাস ও বড়োলোকদেরও কেটার করবে"

"কিন্তু ম্যাডাম, অত টাকা তো আমার নেই"

"টাকাটা পরের কথা। পাবলিসিটির জন্য টাকা ছাড়াও কন্ট্যাক্ট, নেটওয়ার্ক লাগে। আমার আছে। তবে নামটা সেকেলে"

"কী নাম হবে?"

"প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট। সাহেবিয়ানার ছোঁয়া থাকতে হবে। তবে একটা শর্ত আছে"

"কী শর্ত?"

"পার্টনারশিপ ফিফটি-ফিফটি। রাজি?"

দুম করে এতটা এগ্রেসিভ বিজনেস প্রোপোজাল আসবে বুঝতে পারেনি। কথা শুনে মনে হচ্ছে সি মিনস বিজনেস। কমিশনে কাজ করবে না পরিষ্কার। ফিফটি-ফিফটির কমেও নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন্যে হয়ে ঘুরেছে চাকরির আশায়। জুটল কই? মফসসলের ছেলে। কলকাতায় তেমন কন্ট্যাক্টস নেই। যখন বোনেদের পড়ার খরচ প্রায় বন্ধ হতে বসেছে এক বন্ধু এ পথের সন্ধান দিল।

“দালালি। তাও আবার মেয়েছেলের... বলছিস কী?”

“ওসব তোদের নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ভূষণ। খেতে পাচ্ছিস না, বোনের স্কুলের মাইনে দিতে পারছিস না, বাবার চিকিৎসা বন্ধ, এখনও আদর্শের তকমা এঁটে বসে থাকবি? সংসার চালাতে কেউ সাহায্য করেছে? ওভাবে দেখছিস কেন? বিজনেস হিসেবে দেখ”

“মেয়েছেলের দালালির বিজনেস?”

“কোন বিজনেস বিশুদ্ধ? সবই এক। গালভরা নাম যাই থাক, ইটজ এ ওয়ে অফ মেকিং মানি। এই ওয়েটা বেশিরভাগই স্বচ্ছ নয়। বাইরে থেকে যা দেখছিস অতটা সিম্পল নয়”

কথাটা নিয়ে ভেবেছিল। সত্যি তো। আদর্শ নিয়ে বসে অভাবের সংসারে কে খাওয়াবে? ‘নীতি’ ‘দুর্নীতি’ শব্দগুলো আপেক্ষিক। সব কিছুরই সময়, দেশ, কাল, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার হয়। যেটা স্বচ্ছ মনে দ্বিধাহীনভাবে করতে পারবে, সেটাই নীতি। বাঁচার পথ। এক অপরিচিত দুনিয়ায় পদক্ষেপ। কোনও মেয়েকে জোর করে এ পথে আনেনি। যারা স্বেচ্ছায়, বেশিরভাগই আর্থিক অনটনে আসতে চেয়েছে, তাদেরই এক্সট্রা ইনকামের পথ দেখিয়েছে।

মনোলীনা জিজ্ঞেস করল “রাজি?”

“রাজি” ইতস্তত করছে।

“তাহলে কোম্পানিকে রেজিস্টার করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর। ডিন নম্বর...”

“ডিন নম্বর কী?”

“ডায়েরক্টরস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর”

“রেজিস্ট্রেশনে কী বিজনেস?”

“এন্টারটেনমেন্ট। রেজিস্ট্রেশন না থাকলে পুলিসি ঝামেলা, ট্যাক্সের ঝামেলা হতে পারে”

ওয়ানটন সুপে চুমুক দিল “এন্টারটেনমেন্ট মানে মেয়ে সাপ্লাই?”

“তা কেন? সিরিয়াল, টেলিফিল্ম প্রডিউস করব। অল ফর্মস অফ এন্টারটেনমেন্ট। মেয়ে সাপ্লাইটাও তো একটা ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট”

সেন্স আছে। অফিশিয়াল হলে কাজ করতে অনেক সুবিধে। এমন কিছু বলছে না যা করা যায় না। মফসসলের মধ্যবিত্ত চিন্তার বাইরে। অভাবে বড় কিছু ভাবার আর্থিক সম্বলও নেই, সাহসও পায়নি। কত কিছু করা যায় কনট্যাক্টস, পাবলিসিটি থাকলে। মনোলীনা পার্টনার হলে নির্ভীক সমন্বয় মঞ্চ প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট হতে কতক্ষণ? ওর কথায় এগোনোর, করে দেখানোর, জেতার স্বপ্ন। ছোটার স্বপ্নে দীক্ষিত

করছে। যে স্বপ্নের মায়াজালে তার জীবন, তাকে অস্বীকার করে কী করে? সেই পথই তার জানা। সেই পথেই এগোতে হবে।

"অনেক স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ম্যাডাম। সামলাতে পারব?"

"মধ্যবিত্ত মানসিকতার এটাই সমাধি। গণ্ডির বাইরে চিন্তা করতে পারেন না। যখন স্কুলে কলেজে ভাবতেও পেরেছি সিনেমা-সিরিয়াল করব? স্বপ্নটাকে গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলে, ওটা যেমন মরে যায় আপনিও তেমনি মরে যাবেন"

হঠাৎ আজ এ প্রোপোজাল কেন? সিরিয়াল-সিনেমায় পড়তি... আর্থিক দিকটা এই এক বছরে ভেবেছে। তাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

দ্বিধাগ্রস্ত ভাস্কর "ম্যাডাম, আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শেষমেশ ডোবাবেন না তো? পাশে থাকবেন? স্বপ্ন দেখতে পারি। তাকে সামলাতে পারব কি না জানি না"

ঝাঁঝিয়ে মনোলীনা বলল "দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য নয়? আমি হারার খেলা খেলি না, জেতার খেলি"

মনোলীনার চোখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। ঠাট্টা করতে আসেনি। সি মিনস বিজনেস। ঈশ্বর যখন পাঠিয়েছে, তাকে বরণ করে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কী হবে, কী হবে না, অতশত ভেবে লাভ নেই। যা হওয়ার তা তো হবেই।

"বেশ। শুরু করা যাক"

ভবানীপুরে ঘর ভাড়া নিয়ে শুরু প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট। অফিস, ফোন, দারোয়ান কাম ক্লিনার। মনোলীনার অনেক কাজ। মিডিয়া, স্পন্সর, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা, ক্লায়েন্টদের প্রশ্নের জবাব। মেয়েদের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মেডিক্যাল। শেষ কবে এলিসা টেস্ট? অনেক সময় এলিসা টেস্টের কপিও ফ্যাক্স করে পাঠাতে হয়। মুখের কথা আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না।

মনোলীনা যে সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে কোণঠাসা, অভয় ভালোভাবেই জানে। কানাঘুষায় শুনেছে গাঁজাওয়ালার সঙ্গে গন্ডগোলে বিপত্তি। বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই মনোলীনার প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। ঘরের মেয়ে বাজারে। যতই কেরিয়ারের পাথেয় হোক না কেন। মেনে নিতে পারত না। গাঁজাওয়ালাকে দূরে সরিয়ে ঘরের মেয়ের ইমেজটাই তুলে ধরেছে। শুটিং-এ বেরলে মনোলীনা কোথায় যায় অত ভাবার সময় নেই। সারাদিনের ক্লান্তির পর বাড়ি ফিরে ওর হাতের চা। ঐত্রিলা তো কাজ নিয়েই মেতে

থাকত। অনেক সময় বেশ দেরি করেই ফিরত পাঁচতারা হোটেলে সেমিনার শেষে। মুখে না বললেও, বিরক্ত হত।

একদিন বলেও ছিল “এত দেরি করলে ঘর সামলায় কে?”

জবাব না দিলেও পরোক্ষ বিরক্তি ঐত্রিলার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অভয় সেন ঐত্রিলার চাকরিটা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেনি। এড়িয়ে গেছে ঐত্রিলা।মনোলীনা যে তাকে সিরিয়ালের ব্যাপারে তদারকি করতে বলেনি, ইন্ডাস্ট্রিতে কোণঠাসা হওয়ায় ঘ্যানঘ্যান করেনি, এটাই বাঁচোয়া। মেয়েটার মাথা থেকে হয়ত কেরিয়ারের ভূত নেমেছে। শেষমেশ সংসারে মন বসিয়েছে। আবার নতুন বিবাহিত জীবন শুরু করতে পারবে মনের মানুষকে নিয়ে। ভালোবাসার সংসারের অপূর্ণ খোয়াব অবশেষে পূর্ণ হতে চলেছে।

উনচল্লিশ

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আবার শূন্যতা। না পারল মরতে, না পারছে বাঁচতে। সায়ন্তনির চারিদিকে শুধু অন্ধকার। একে একে সবাই তাদের নিজের পৃথিবীতে। ট্যানিয়া, সুলগ্না এবং শেষ পর্যন্ত ঐন্দ্রিলাও। কারও সময় নেই ওর জন্য। রনিতকে নিয়ে ফূর্তি করবে সে গুড়ে বালি। ওর ত্রিসীমানায় মানেই মৃত্যুকে ডেকে আনা। অরণি এখন ক্রনিক ডিপ্রেশনে। রইল কে? বাচ্চাও নেই যাকে আঁকড়ে বাঁচার রসদ পেতে পারে।

দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় অনেক জ্ঞান দিয়ে গেল। বিপাকে পড়লে অমন অনেকেই দেয়। শাড়ি খুলে যদি দেবজিতের সামনে দঁড়ায় জ্ঞান হাওয়া হয়ে যাবে। জ্ঞান হজম করতে পারছে না। ওসব ফুকো ভদ্রতা সহ্য হয় না। এই লোকটার মুখোশ ছিঁড়ে আসল মানুষটাকে নাঙ্গা করতে হবে সবার সামনে। ‘চাওয়া ছেড়ে দাও। হারজিতের খেলায় যেও না’... ন্যাকা। মুনি-ঋষিদের মতো বড় বড় কথা। কেন বাবা - এখান থেকে কেটে পড়ো। হিমালয় গিয়ে থাকো না। তা তো পারবে না। এসি ঘরে বসে বড় বড় বুকনি। দুনিয়ায় সব থেকে সস্তা ফ্রি জ্ঞান। ভণ্ডামিটা মানতে পারছে না। ওকে মাটিতে ফেলে দেখাতে হবে কত ধানে কত চাল।

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে ব্যথা। ঝোলালেই বেড়ে যায়। ডাঃ বিদিশা মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেছে হাতটা সব সময় তুলে রাখতে। তা কী সম্ভব? কাজ করতে গেলে তো নামাতেই হবে।

মা বলেছিল, আরও কিছুদিন থাকতে। যে ক'দিন প্লাস্টার ছিল, না বলতে পারেনি। তারপর আর থাকতে চায়নি। ওই মহিলার জন্যই তো তার এই পরিণতি। ছোটবেলায় ওকে যদি স্বভাবিক জীবন দিত, নিজের ধুনের বাইরে সংসারে মন দিত, হিসেবটা অন্যরকম হত। একমাত্র এই কেলে-কুচ্ছিত চেহারা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। বাবার আদলে হলে কোথা থেকে কোথায়।

কর্মটা নিজের হাতে থাকলেও, জন্মটা নয়। জন্মই কর্মের ভিত্তি। শর্বরী বসুকে ফোন “কেমন আছ?”

“হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে?”

“তুমি জানলে কী করে আমি হাসপাতালে?”

“খবর বাতাসে ভাসে। হঠাৎ এমন করতে গেলে কেন?”

“সে কথা থাক। তোমার খবর কী?”

“ওই আর কী... দিনগত পাপক্ষয়”

খাটে শরীর ঢেলে দিয়ে বলল “তোমার মনে আছে এক্সিবিশনে এক ভদ্রলোক এসেছিল, দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়”

“কেন থাকবে না? কিছুদিন আগেও দেখা হয়েছিল। অদ্ভুত মানুষ”

“তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে?”

“ওরা আমলা মানুষ। অত সহজে ধরা যায়?”

দেবজিতের সঙ্গে কিছুটা নিবিড়তার মধ্যে অন্য কাউকে টানতে চায় না। সায়ন্তনির সঙ্গে ওর মানসিকতার বিশাল ব্যবধান। বলে লাভ নেই। বুঝবে না।

সায়ন্তনি নাছোড়বান্দা “কোনওভাবে সম্ভব নয়?” সন্তর্পণে দেবজিতের সঙ্গে লেডি ফ্লোরেন্সে দেখা হওয়া এড়িয়ে গেল।

সায়ন্তনির আগ্রহ দেখে বলল “এক কাজ কর। মিঃ ট্যান্ডনকে বলে আবার একটা এক্সিবিশন অর্গ্যানাইজ করতে পার। দেবজিৎবাবুকে গেস্ট-ইন-চিফ করে আনলেই হয়। হঠাৎ ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ কেন?”

প্রশ্নটা আসবে আন্দাজ করেছিল “সেদিন লোকটাকে বুঝতে পারিনি। পরে ভেবে দেখলাম, লোকটার সঙ্গে কথা বললে হয়ত এই অবস্থায় মানসিক উন্নতি হতে পারে”

“যেভাবে বললাম, কর”

“বাই দ্য ওয়ে, হাউ ইজ রনিত?”

“কোপিং। হাসপাতাল ডাক্তার সব করছে। মেন্টালি একেবারে ভেঙে পড়েছে। একবার খোঁজ নিলে পার”

“কী হবে নিয়ে? ইফ হি ওয়ান্টস সেক্স, কান্ট গো ফর ইট। বেটার টু কিপ আওয়ে ফ্রম হিম”

শর্বরী ফোনটা কেটে দিল। এই মহিলা কী নিজের বাইরে আর কিছু দেখতে শিখেছে? শিখলে শান্তি পেত। সুইসাইড করার চেষ্টা করত না। যে এতদিনে বোঝেনি, তাকে কী আর শর্বরী বোঝাতে পারবে? সে ক্ষমতা নেই। এক যদি দেবজিৎবাবু পারে। দ্য গার্ল ইজ নট অফ স্টেবল মাইন্ড। এখন আফসোস হচ্ছে কেন এই মেয়েটার আঙুলের কাছে অন্তরদ্বার সঁপে দিয়েছিল। চিনতে পারেনি মেয়েটাকে। সেক্সে অরুচি নেই। কিন্তু ধান্দাবাজির সেক্সে রীতিমতো আপত্তি। বেশ্যার থেকেও অধম। বেশ্যাদেরও ক্লাস আছে। যা করে, সোজাসুজি, রুজি-রোজগারের জন্য পেটের তাগিদে। এই সভ্য উগ্র-আধুনিকাদের কোনও ক্লাসেই ফেলা যায় না। এদের একটাই ক্লাস। ধান্দার, নেওয়ার। খালি লোটা। কেবলই জেতা। ভাবে অন্যরা বোকা। উপকার করলে ভাবে কত চালাক। কৌশলে ধান্দা উশুল। ভেবেও দেখে না, পাওয়ার মধ্যে শান্তির চেয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক বেশি। ও কিছু পাওয়ার আশায় করে না। করলে তৃপ্তি পায়। বাবাও কত লোকের জন্য করত। সেও, বাবার পথে। সায়ন্তনির মতো মূর্খ মেয়েগুলো এটাকে বোকামি ভাবে। বোকাটা কে নিজেরাই জানে না।

লেক ক্লাবে দেবজিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই অদ্ভুত পরিবর্তন। এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের অশান্তি বাড়ানো ছাড়া আর কিছু হয় না। ভোগটা ছেড়ে দিতে পেরেছে, এমন নয়। তবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখতে শিখেছে। নিস্পৃহ এসব ছোটখাটো ব্যাপারে। সোশালাইট শর্বরী বসু আনসোশাল হয়নি। কিন্তু সমাজের বন্ধন থেকে নিজেকে হাল্কা করতে পেরেছে।

এবার কোনও প্রেস কভারেজ নেই। আড়ম্বর নেই। মিঃ ট্যান্ডনও নেই। দুবাই গেছে আর্ট ডিলে। এই তো মৌকা। দেবজিৎ প্রথমে রাজি হয়নি।

সায়ন্তনির আবদার “আসবেন না?”

আর্ট এক্সিবিশন ওপেন আমার কাজ নয়। বরং কোনও সেলিব্রিটিকে ডাকুন। খুশি হবে। নিজেদের দর বাড়বে। ওদের ডাকলে ভালো মিডিয়া কভারেজও মিলবে”

“মিডিয়া কভারেজ দরকার নেই। দরকার আপনাকে। লেডি ফ্লোরেন্সে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। আমার জীবন পালটে দিয়েছেন। না এলে, সত্যি দুঃখ পাব”

মেয়েটাকে আঘাত দিতে চায়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল। ওর অযাচিত কোনও অহং নেই।

সন্ধেবেলা যখন এল, এক্সিবিশন সুনসান। মিঃ ট্যান্ডন না থাকায় তেমন প্রচারও হয়নি। আর্টিস্টগুলোও আনকোরা, নতুন।

দেবজিৎ একাই ঢুকে বলল “একেবারে ফাঁকা যে। কী উদ্বোধন করব?”

“আগেরবারের মতো তেমন লোক হয়নি। মিঃ ট্যান্ডন নেই বলে অনেকেই আসেনি” পাতলা বুটিকের শারারায় গরমে ঘামছে।

দেবজিৎ বলল “এভাবে ওপেন করার মানে হয় না। এত করে বললেন, তাই এলাম। বসে চা খেয়ে চলে যাব”

“ভেতরের ঘরে আসুন। সোফা আছে”

সোফায় বসতে সায়ন্তনি বলল “চা তো নেই। ওয়াইন আছে, খাবেন?”

“না” দেবজিৎ কখনও অচেনা মহলে এসব খায় না “ওয়াইন খান না, না আমার দেওয়া ওয়াইন খাবেন না?”

“দুটোই নয়। আমি পাবলিক অনুষ্ঠানে ওয়াইন খাই না”

“পাবলিক অনুষ্ঠান ভাবছেন কেন? বাড়ির আমন্ত্রণ বলেই মনে করুন”

“আপনার সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা নেই, যে বাড়িতেও ওয়াইন খাব। কেমন আছেন?”

“ভালো নেই। একেবারে নেই”

“কেন? আবার কী হল?”

“আপনি লেডি ফ্লোরেন্স থেকে চলে যাওয়ার পর সব কেমন পালটে গেল”

“ভালোই তো। পালটালেই মঙ্গল”

“তারপর তো আপনার দেখা পেলাম না। আপনারা আমলা। আমাদের মতো তুচ্ছ নগণ্য লোকেদের জন্য সময় কোথায়?”

“আপনি তুচ্ছ নগণ্য কে বলল? তাই যদি ভাবতাম, এলামই বা কেন?”

“সে আপনার দয়া”

“আমি কে যে কাউকে দয়া করার যোগ্যতা আছে?”

“সেটা আপনার বিনয়। যোগ্যতা অবশ্যই আছে। সবাইকে করেন। আমায় করতে পারেন না?”

দেবজিৎ ঠিক বুঝতে পারছে না, ও কী বলতে চাইছে। এক্সিবিশন ওপেন করতে এসেছে। দয়া-দাক্ষিণ্যের কী আছে? কিছু বলতে যাচ্ছিল। পাশের ঘরের ছেলেটা উঁকি মেরে বলল “আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না দিদিমণি। এক্সিবিশন বন্ধ করে দিই”

“আপনি একটু বসুন। আসছি”

ছেলেটি চলে যেতে, বাইরের দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে বলল “নাঃ এবার এক্সিবিশনটা ঠিক জমল না। মিঃ ট্যান্ডন না থাকাতে এবার সেরকম লোকও হয়নি” উল্টদিকের সোফায় বসল।

দেবজিৎ লক্ষ করল, পায়ের ওপর পা তোলায় গাঘরার অনেকখানি সরে গেছে। নির্লোম উরুর নীচের অংশ উকি মারছে। ওর শালীনতায় বাধে অচেনা মহিলাকে জামা ঠিক করে নিতে বলতে। মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

“আপনাকে কী দিয়ে যে আতিথেয়তা করব”

“কিচ্ছু করতে হবে না” চোখ তুলতেই দেখল, সায়ন্তনি জিভটা ঠোঁটের ওপর বোলাচ্ছে। আগে লক্ষ করেনি ওর টপসের দুটো বোতাম খোলা। আগে তো ছিল না। উদ্ধত স্তন। খুলে যেতেই পারে।

ছেলেটাকে বিদায় করে প্রস্তুত হয়েছে অতিথি আপ্যায়নে। আজ আসল পুরুষের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। সে দেবজিৎকেই এখন চায়। কতদিন দেহ উপভোগ করেনি। উদ্ধত পুরুষ চাই। ঐত্রিলা আঘাত দিতে পারে। কারণ সে নারী। নারীরাই নারীর মন বোঝে না। একজন পুরুষ বুঝবে। এমন একজন যার কাছে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারবে। ভাঙা জীবনকে জোড়া লাগাতে।

উঠে পড়ে বলল “আপনি যখন ওয়াইন খাবেন না, একটু কিছু নিয়ে আসি। একটু বসুন”

কিচেনে ঢুকে গেল। দেবজিতের ইচ্ছে করছিল উঠে পড়ে। কিছু খেয়ে না গেলে মেয়েটা দুঃখ পাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে রইল।

ফিশ-ফ্রাই, মিষ্টির প্লেট নামিয়ে বলল "এত কষ্ট করে এসেছেন। একটু মিষ্টিমুখ না করলে দুঃখ পাব"

ঝুঁকতেই টপসের ওপর দিয়ে ব্রায়ের ঝিলিক। দেবজিৎের ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। না পারছে উঠেতে, না পারছে বসে ওর উপচে পড়া স্তনের দিকে তাকাতে। মহিলা কী বুঝতে পারছে না ওর অস্বস্তি? একটা ফিশ-ফ্রাই মুখে পুরে উঠে পড়ল।

"চলি। খুব ভালো লাগল। ভালো থাকুন"

পথ আগলে সায়ন্তনি "এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন?"

"হ্যাঁ। অন্য কাজ আছে"

দরজায় পথ আগলিয়ে শারারার বন্ধন আলগা। মাটিতে হাঁটুর কাছে। ছিঃ ছিঃ। এ কোন অকুলে। বিদিশাকে বিশ্বাস করেছিল। এই মেয়েটাকেও। দৃঢ় ভাবে বলল "পথ ছাড়ুন"

টপসটা খুলে ফেলল "আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে চাই"

"কী পাগলামো করছেন? যেতে দিন"

"আমাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কিন্তু আমি চিৎকার করব। আমায় রেপ করার চেষ্টা করেছেন। কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না"

ততক্ষণে ব্রা খুলে ফেলেছে। উদ্ধত স্তন হাওয়ায়। দেবজিতের তাকাবার কোনও ইচ্ছে নেই। মেয়েটাকে বোঝাবারও। শুধু এখান থেকে বেরোতে চায়।আবার দৃঢ় ভাবে বলল "পথ ছাড়ুন। আপনার মাথার ঠিক নেই"

"আপনার মাথার ঠিক নেই। জলজ্যান্ত মেয়ে জামা খুলে আপনার সামনে। আর আপনি গায়ে হাত না দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান? আপনি মানুষ না পাগল? আমাকে পাগল বলছেন"

এ মেয়ে তো সাংঘাতিক। বিদিশার ওপর রাগ হচ্ছে। এ কোন ফ্যাসাদে ফেলেছে। বিদিশার কী দোষ? মানসিকভাবে ঠিক নয় বলেই তাকে লেডি ফ্লোরেন্সে নিয়ে গেছিল। সে-ই না বুঝে ফাঁদে পা দিয়েছে। ভেবেছিল মেয়েটা সত্যি সত্যি পালটে গেছে। সহানুভূতিই কাল। এখনও সম্পূর্ণভাবে মানুষ চেনেনি। মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসই টালমাটাল। উদ্ধত কালো স্তন দেখে বমি পাচ্ছে। যৌবনের আবেদন নেই। শুধু ঘৃণা। সব মেয়েই কী মনে করে বিবস্ত্র হলেই পুরুষরা আকৃষ্ট হবে? ওরই ভুল। দম্ভ নিয়ে না থাকলে এমন জাঁতাকলে পড়তেই পারে।

দৃঢ় স্বরে বলল "সরে যাও। যেতে দাও"

এক হাত দরজার ফ্রেমে, অন্য হাত ঘন চুলে। আকর্ষণ করতে চায়। যদি মজে।

মাথায় রাগ চেপে গেল। ওর দিকে এগিয়ে গেল। সায়ন্তনি ভাবল শেষমেশ মজেছে। কয়েক মুহূর্ত। সপাটে গালে চড়। মাথা ঘুরে টাল সামলানর আগেই দেবজিৎ দরজা খুলে বাইরে। ফিরেও তাকাল না।

এত জোরে থাপ্পড় আগে কখনও খায়নি। রাগে, দুঃখে, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল। দেবজিৎ নাগালের বাইরে। মুখ্য আমলার বিরুদ্ধে রেপের ডায়রি? সে সাহস নেই সায়ন্তনির।

চল্লিশ

জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই আড়মোড়া ভাঙল বিদিশা। দোয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকাল। সাড়ে পাঁচটা। রবিবারে এত সকালে এর আগে কখনও উঠেছে কি না, জানে না। ছুটির দিন। মানে আর একটু ঘুমোবার অবকাশ। হাত পা ছড়িয়ে ঘুপটি মেরে শুয়ে থাকার দিন। সংসার নেই যে সকালে উঠেই হেঁশেল ঠেলতে হবে। ফুল টাইম কাজের লোক মিরা মাসি বেড-টি দিয়ে ঘুম ভাঙায় "দিদিমণি, চা"

আজ কেউ ডাকেনি। এত সকালে মিরা মাসি ওঠে না। জানলার বাইরের প্রশস্ত মাঠ, খোলা আকাশের দিকে চাইল। সবুজ ঘাসের ওপাশে একটা পুকুর। দূরে দেবদারু গাছের সারি। মনেই হয় না এটা কলকাতা। পুবের এই খোলা আকাশটা একটুকরো খুপরির নিলামে ভরাট হয়নি। শহুরে কংক্রিটের আবর্জনা এখনও বৈষ্ণবঘাটার এপাশে তেমন ভাবে জাঁক বাঁধেনি। যদ্দিন বাইপাসে জায়গা, উত্তর কলকাতার মতো গায়ে-গা লাগিয়ে বাড়ি উঠবে না। এখন রাজারহাট উপনগরীর দিকেই কনস্ট্রাকশনের হিড়িক। অনেকদিনের ইচ্ছে একটা ছোট্ট বাড়ি করে। রাজারহাটের লটারিতে অ্যাপ্লাই করেছিল। লাগেনি। লটারিতে না লাগলে বাজারি দামে কেনা স্বপ্নের অতীত।

রাতে জানলার মোটা পর্দাটা টানতে ভুলে গেছিল। তাই সূর্যের আলো চোখে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেছে। এসি চালিয়ে ঘুমোনোর চেয়ে চারতালার এই ফ্ল্যাটের নির্মল দক্ষিণা বাতাসের মৃদুমন্দ বিচরণ অনেক ভালো। কৃত্রিমতা নেই। আছে প্রকৃতির ঘ্রাণ। জীবনের ছন্দ। অনেকদিন পরে আজ ভীষণ ঝরঝরে। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, না কি দেবজিৎ তাকে জীবনের অন্য মাত্রা দেখিয়েছে বলে, জানে না। তবুও ভালো লাগছে। রাগ, দুঃখ, না পাওয়া, যন্ত্রণাকে পেছনে ফেলে আবার নতুন করে জীবনকে দেখা।

মেঘের কোল ঘেঁষে উকি মারা সূর্যর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল দেবজিতের মুখে শোনা শ্লোক :

ওঁ জবাকুশুমসংকাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম

ধ্যানতারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম।

দারুণ শ্লোক বলে দেবজিৎদা। মন ভরে যায়। হাসি পেল এই লোকটাকেই সে রাতে বিছানায় টানতে গেছিল। কী বোকাই না সে। চিনতেই পারেনি। লোকটা অন্য মার্গে। তাকে দেহের উষ্ণতায় জয়ের ভূত চেপেছিল। ভাবত চালাক। নতুন করে চিনছে। দেবজিৎদা তার ভেতরে নেভা জ্ঞানের প্রদীপ নতুনভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর বাইরে কেউ দেখতে শেখায়নি। দেবজিৎদাই প্রথম পুরুষ, যে পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার

বাইরে, নিজেকে মনের আয়নায় নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে। পুজোবাড়ির শুদ্ধতা, পবিত্রতায়। সকালের সূর্যের মতো তার শরীরটাও পবিত্র হয়ে গেছে। হালকা ঝরঝরে লাগছে।

দেবজিৎদার ওপর একটুও রাগ হচ্ছে না। ওর থাপ্পড়টা নতুন মাত্রা টেনে দিয়েছে। এই লোকটার ওপর রাগ করা যায় না, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা যায়। আধ্যাত্মিক মানুষ না হলেও মনের গুরু বলে মেনে নেওয়া যায়। ভালোবাসা শ্রদ্ধার যুগলবন্দিতে সে যেন হারানো ধ্রুবতারা খুঁজে পেয়েছে। অনেকদিন ধরে খোঁজা মানুষটাকে সম্পর্কের মায়াজালে বন্দি করা বাতুলতা। অনুভূতিতেই তার ব্যাপ্তি। সত্তার মধ্যে অনুভব।

মিরা মাসি ঘরে ঢুকে আশ্চর্য "দিদিমণি, কী হল? আজ এত সকালে উঠে পড়েছ? রোব্বারে এত সকালে উঠতে দেখিনি তো আগে"

চায়ের কাপটা নিয়ে হাসল "তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেছে"

"তোমাকে আজ ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে গো"

"নতুন কোনও পাত্র পেলে বুঝি?" ঠাট্টা করল।

"তোমার কী পাত্রের অভাব? একবার খালি বল, বাড়ির বাইরে লাইন লেগে যাবে"

"কেন মাসি? বেশ তো আছি। কেন ঝোলাতে চাও"

"তোমাকে ঝোলাবে এ সাধ্য কার"

মিরা মাসি বেরিয়ে গেল। কত বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। বিদিশার প্রতি স্নেহে ভরপুর। সে সত্যি সত্যি ঝুলেছে। তার মনের কাছে। এক সাধারণ মানুষের কাছে। যে বাঁচার নৈবেদ্য সাজিয়ে নতুন আশায় দীক্ষিত করেছে। তার স্বপ্নের পুরুষ। মনের মানুষ। তাকে ধরতে চায় না। তাকে পাথেয় করে বাঁচতে চায়।

মোবাইলটা বেজে উঠল। এত সকালে, কে? বোতাম টিপতেই দেবজিৎদার কণ্ঠস্বর "গুড মর্নিং। ঘুম ভাঙালাম?"

কেঁপে উঠল বুকটা "একেবারেই নয়। আকাশের দিকে চেয়ে চা খাচ্ছি"

"জান কি ঝামেলায় ফেলেছিলে। একটু হলেই রেপ কেসে ফেঁসে যেতাম"

ভয়ে কেঁপে উঠল "কেন, কী হল?"

"ওই যে মহিলা, যার কাছে লেডি ফ্লোরেন্সে নিয়ে গেছিলে, সি ইজ মেন্টালি আনসাউন্ড"

"দেখা হল কোথায়?"

"আমাকে আর্ট এক্সিবিশন ওপেন করার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। সি স্ট্রিপড্ অ্যান্ড ট্রায়েড টু সিডিউস মি। লাকিলি আই এস্কেপড। একটু হলেই মোলেস্টেশন চার্জে ফেলে দিত"

“সি ইজ অফ দ্যাট টাইপ। ওর স্বামীও ওর পাল্লায় পড়ে পাগল হয়ে গেছে। উগ্র আধুনিকা। বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলার ওপর ঝড় বয়ে গেছে। তোমার সান্নিধ্যে মানসিক উন্নতি হবে”

“সাম পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ। ওরা লস্ট কেস। কে কী করবে? এই মহিলাকে ঠিক করার সাধ্য কারও নেই। বিগ প্রবলেম উইথ হার আপব্রিঙ্গিং”

খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল “সরি দেবজিৎদা। বুঝতে পারিনি। হার মিসফরচুন তোমায় চিনতে পারল না। সি উড হ্যাভ হ্যাড এ ডিরেকশন অফ হার লাইফ”

“ছাড় সে কথা। রুমা বলছিল, সন্ধেবেলা যদি ফ্রি থাক ডিনার খেয়ে যেও। ফ্রি?”

“একেবারে। যাব। অনেক কথা আছে। টিঙ্কু থাকবে তো? ওর জন্য একটা সারপ্রাইজ”

“সাড়ে-সাতটায়। গাড়ি পাঠিয়ে দেব?”

“না। ড্রাইভ করে যেতে পারব”

দেবজিৎদা ফোন কেটে দিল।

ছিঃ ছিঃ। সায়ন্তনি এ কী করেছে? কেন যে নিয়ে গেছিল? বোঝা উচিৎ ছিল। অরণি আগেই তার বউ সম্বন্ধে ব্রিফ করেছে। নরম মন। মনে হয়েছিল দিশাহীন মহিলাকে দেবজিৎদা পথ দেখাতে পারবে। এখনও মানুষ চেনেনি। দেবজিৎদাকে আস্তে আস্তে চিনতে, অনুভব করতে পারছে। অস্পষ্ট অবয়ব ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে। তুচ্ছ ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়ায় তাকে অনুভব করা যায় না। সেখানে সে শুধুই মুখ্য আমলা, রুমাবৌদির স্বামী, টিঙ্কুর বাবা। শরীরের বাইরে ঝাপসা চেহারাটা অন্য এক দেবজিতের। কালপুরুষ। সাবাইকেই অনায়াসে ছুঁয়ে যেতে পারে। সে আছে সবার সভায়, সবার মধ্যে। হাত বাড়ালেই পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। সেই অস্তিত্বটাকে কিঞ্চিত হলেও বুঝতে পারছে। কিন্তু ছুঁতে পারছে না। এর আগে কখনও এমন হয়নি। ধূমকেতুর মতো, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে মহাশূন্যে। আরও কাছ থেকে জানতে হবে। জানতে গেলে তো নিজেকে তৈরি করতে হবে। তার মশাল ধরতে গেলে তো তাকেও সেই স্তরে পৌঁছতে হবে।

উঠে বাবার ঘরে “ভগবদগীতা আছে?”

চমকে উঠল। আগে কখনও ভগবদগীতা পড়তে চায়নি। আজ কী হল “হ্যাঁ আছে। বাংলা না ইংরেজি?”

“প্রভুপাদের ইংরেজি ভার্সন নয়, বাংলা”

বুক কেস দেখিয়ে বলল “ওখানে। নিয়ে নে”

ভগবদগীতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেয়ে কী সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ক্রমেই তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। জীবনের ধর্ম শিখতে চায়। শিখলেই তবে দেবজিৎদার কাছে পৌঁছতে পারবে। যদি পারে, সেটাই আসল পাওয়া। অভিষেকের পূর্ণ রাজত্ব গ্রহণ। এতদিন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল। আজ মুক্ত।

মনের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরতে পেরেছে। সামাজিক জীবনে শুধু নয়, এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রেও। আগে কখনও ভাবেনি, ছোটার পৃথিবীর বাইরে বাঁচা যায়। শুধু ভালোলাগাকে পাথেয় করে। ছোটার সীমারেখা উত্থান-পতন আছে। আছে হারজিত। দেবজিৎদা তাকে সেই সীমাবদ্ধ পৃথিবী থেকে বার করে এনেছে অন্য দুনিয়ায়। সেখানে হয়ত কিছুই নেই। আবার সব কিছুই আছে। ভালোলাগা, ভালোবাসা, শান্তি। বোঝেনি, এই শান্তির আশায় এতদিন ছোটা। এটাই পাওয়া। এই অনুভূতি নিয়েই বাঁচা।

কেন যে লোকে পাগলের মতো ছোটে?

ওরা অপেক্ষা করছিল। একটু আগেভাগেই চলে এসছে। টিঙ্কুর জন্য একগুচ্ছ সিডি এনেছে। হাতে দিয়ে বলল "দেখ পছন্দ কি না?"

সিডির প্যাকেটটা খুলে বলল "রবীন্দ্রসংগীত?"

"রবীন্দ্রসংগীত ভালো লাগে না?"

"ভীষঞ্ঞ। বাপি রোজ সকালে আদ্যাস্তবের পর দু-ঘণ্টা শোনে। আমারও শোনা হয়ে যায়। সীমা মাসি কি ভালো রবীন্দ্রংগীত গায়"

"কে সীমা মাসি?"

দেবজিৎ সোফায় বসে বলল "রুমার কলেজের বন্ধু। দক্ষিণীর। আগে অনেক সিডি বেরিয়েছিল। হাসব্যান্ড জয়ন্ত সরকার মারা যাওয়ার পর এখন মুম্বাইয়ে। বেশ নামও করেছে। কী গো রুমা, ওর জন্য জিশানের রোল, উজালার চানাচুর এনেছি। দিলে না?"

পাশের ঘর থেকে রুমা "সবুর কর, আসছি। চা টা করতে দেবে তো"

টিঙ্কু ততক্ষণে সিডিটা চালিয়ে দিয়েছে 'ওগো পথের সাথি' বিদিশার মনের গান শোনাতে চেয়েছিল দেবজিৎদাকে। তাই টিঙ্কুর নাম করে সিডিটা কিনে এনেছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটাই সুর। যা মুখ ফুটে দেবজিৎদাকে বলতে পারবে না।

রুমা টেবলে প্লেটটা নামিয়ে বলল "নাও। তোমার জন্য ভালোবেসে কিনে এনেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নইলে উনি গিলতে শুরু করে দেবেন"

রোলটায় কামড় দিল "কোথায় কোথায় গেছেন দেবজিৎদা?"

রুমা ওর কথা টেনে বলল "ওর সারা পৃথিবী ঘোরা। আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি"

"কোথায়?"

"সাউথ আমেরিকার কয়েকটা জায়গা ছাড়া"

"খুব সুন্দর, তাই না?"

"হ্যাঁ, দেশ হিসেবে সুন্দর। তবে কোথায় যেন অভাব। মানসিক সম্পূর্ণতার। মেটিরিয়ালিজমে জীবন থেমে। যা দেখা যায়, সেটাই সত্যি। যা যায় না, ওরা বিশ্বাস করতে পারে না। এখানেও তাই। মূর্তি না থাকলে পুজো করতে পারে না। অ্যাবস্ট্র্যাক্টকে মেটিরিয়াল ফর্ম না দিলে ডেফাইন করতে পারে না"

"অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ব্যপারটাই অনেকে বোঝে না"

দেবজিৎ রুমার দিকে তাকিয়ে বলল "হাফ রোল খাই। তুমি আর আমি?"

সম্মতিতে, রোলের আধা নিয়ে বলল "বুঝতে গেলে অনুভব করতে হয়। চাওয়া-পাওয়া, হার-জিতের মধ্যে দেখা যায় না। ওর বাইরে গিয়ে দেখতে হয়"

"সেটা আপনাকে দেখেই বুঝেছি" দেবজিৎ রোলটা রসিয়ে খাচ্ছে।

"এই ফর্মটা একটা ডেফিনিট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। শুধু এর মধ্যে থেকে বেরোতে হবে। ব্যাস, তাহলেই হবে"

"এর বাইরে, কী নিয়ে বাঁচবে?"

"বিশ্বাস, স্বচ্ছতা নিয়ে। জিততে হবে, কে বলেছে? হারলেই বা কী ক্ষতি?"

"আপনি বলতে পারেন, কারণ আপনি হারেননি"

"ওটা আমার কাছে কোনও বড় ব্যপার নয়। এর বাইরেও বাঁচা যায়। জিতলে বাহবা দেবে, হারলে পাত্তা দেবে না। এটুকই। সত্যি বল তো এতে কতটুকু আসে যায়? কিচ্ছু আসে যায় না। এ শুধু নিজের কাছে নিজেকে দামি করার ব্যর্থ চেষ্টা। তাও আবার অন্যদের মতের ওপর। হাউ মাচ উইল দ্যাট অল্টার ইওর লাইফ? নট এ লট"

"সেটাই আপনার কাছে এসে বুঝলাম"

"বুঝতে পেরেছ মানেই পেয়ে গেছ। আসল জিনিসটা জেনে ফেলেছ। বাকি সব ফালতু। কয়েক মুহূর্তের আনন্দ বা দুঃখ। ওর বাইরে বেরোতে পারলেই দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। তার মানে, পূর্ণতা লাভ করেছ"

রুমা বলল "ওর মতো এত রিল্যাক্সড কাউকে দেখিনি। ইটজ এ প্লেজার বিয়িং হিস ওয়াইফ"

বিদিশার মনে হল, সে এক নতুন পথের দিশা দেখছে। এত লেড ব্যাক কেন? কাউকে বোঝালে তো পারে। পর মুহূর্তেই মনে হল বুঝিয়ে কী হবে? যদি বুঝতে না চায়, বেনাবনে মুক্তো ছড়ান। বিদিশা বুঝে গেছে। এটাই তার পাওয়া। সায়ন্তনি বুঝতে পারল না। ওর ব্যর্থতা।

প্রথমবার যখন গঙ্গাসাগরে দেখা হয়েছিল, তখন ওর প্রতি এক অদ্ভুত টান। খড়গপুরে সেই আকর্ষণটা দৈহিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এখন আরও বেড়ে গেছে। পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। গভীরের অনুভূতি।

পার্থিব আকর্ষণের শেষ আছে। গণ্ডি আছে। লক্ষ্মণরেখায় আবদ্ধ। যা ম্লান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ আকর্ষণ হারাবার নয়। চিরদিনের, চিরকালের। অবিনশ্বর এই আকর্ষণকে তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার দাঁড়িপাল্লায় তুলে মলিন করা যায় না।

সেখানেই অনির্বাণ আনন্দের প্লাবন।

বাঁচার মূল মন্ত্র।

জীবনের পরিপুর্ণ সার্থকতা।

টিঙ্কু বেরিয়ে গেছিল। ফিরে বলল "দারুণ ভালো সিডিগুলো। থ্যাংক ইউ" হাসল বিদিশা।

দেবজিৎকে বলল "আমার মনের কথা"

এভাবেই বোঝাতে চাইল তার পাওয়ার সম্পূর্ণতা। মাছের চোখটা দেখতে পেরেছে। কিন্তু দেবজিৎ কী তার হাতে তির-ধনুক তুলে দেবে?

একচল্লিশ

গাড়িতে উঠবে, হঠাৎ মোবাইল অন।

“কেমন আছ দেবজিৎদা?”

“সীমা যে, কোত্থেকে?”

“লোখন্ডওয়ালা কমপ্লেক্সের ফ্ল্যাটে চা খাচ্ছি”

“তোমার এত নাম-ডাক। ঘরে বসে চা খাওয়ার সময় পাচ্ছ?”

“ইচ্ছে থাকলেই করে নেওয়া যায়। তুমি রুমা একবারও আসতে পারলে না।ইচ্ছে নেই, তাই”

“তা নয়। রুমা স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। টিঙ্কু এবার পার্ট ওয়ান দিচ্ছে। ওর পেছনেও লেগে থাকতে হয়। সোমত্ত মেয়ে। একা রেখে যাওয়ার সাহসও পাই না”

“পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না যেতে পারে, তবে মহম্মদই পর্ব্বতের কাছে যাবে। নেক্সট উইকে কলকাতা যাচ্ছি। শনিবার থাকবে? মিটিং নেই তো?”

“না। থাকলেও তোমার জন্য সময় করতে অসুবিধা হবে না। কাজে?”

“বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে”

“কার, তোমার?”

“ঠাট্টার অভ্যসটা এখনও গেল না। নিজের বিয়েতে কেউ নেমন্তন্ন খায়? উপোস করে। এক প্রডিউসার বন্ধুর অ্যামেরিকান বন্ধুর বিয়ে। বাঙালি মেয়ের সঙ্গে। ও আবার বাঙালি রীতিনীতি জানে না। অ্যামেরিকায় মানুষ। ঠিকভাবে হিন্দিও বলতে পারে না। ওই সাহেবের সঙ্গে কলেজে পড়ত। বিয়ে যখন ইন্ডিয়ায় থাকতেই হবে”

“সঙ্গে তোমাকেও। কিছু চলছে নাকি?”

“হঠাৎ একথা? এই বুড়ো বয়সে কে বিয়ে করবে?”

“এই বয়সেই তো রস জমে। যত বয়স বাড়বে, যৌবন আরও চাঙ্গা হবে। প্রডিউসারকে ভালো লাগে?”

“আমাদের লাইনে সবাইকে লাগাতে হয়। নইলে চলবে কী করে?”

“সবার কথা বলিনি। প্রডিউসারের কাথা। নাম কী?”

“রাজা দণ্ডাওয়াত। বয়স পঞ্চাশ। অ্যামেরিকান বউ মারা গেছে। ছেলে-মেয়েরা আমেরিকায় সেটেল্ড”

গাড়িতে বসে দেবজিৎ বলল "পারফেক্ট। কলকাতায় এসে ফোন করো। যাচাই করে দেখব তোমার রাজাকে, আই মিন মনের রাজাকে"

"মনের রাজা এখনও হয়নি। এখনও রাজা দণ্ডাওয়াত"

"হতে কতক্ষণ? তোমার মনের সিংহাসনে বসতে সাহায্য করব"

"বাই দেবজিৎদা"

ফোন কেটে দিল। সীমা একটুও পালটায়নি। ঠিক আগের মতো। রুমাকে বলতে হবে সীমা বোধহয় প্রেমে পড়েছে।

শর্বরীকে কোনও কিছুই অরগ্যাজম দিতে পারছে না। ছেলে, মেয়ে, সোশাল পার্টি নয়। এরা শুধু ক্লাইটরিসকে স্টিমুলেট করতে পারে। অরগ্যাজম দিতে পারে না। দেবজিৎ কিছুটা মেন্টাল অরগ্যাজম সার্ভ করে। যা এদের ক্ষমতার বাইরে। ওকে অস্বীকার করতে পারছে না। আবার ওর পথে হাঁটতেও পারছে না। এতদিনের অভ্যাস ছেড়ে বেরনো কি সম্ভব? নিস্পৃহ হতেও মন লাগে, যা শর্বরী পায়নি।

ফোনে সায়ন্তনি। বিরক্তই হল। কি কুক্ষণেই না মেয়েটার সঙ্গে শুতে গেছিল। হম ছোড়ে তো কমলি নেহি ছোড়ে।

"একটা খবর দিই" সায়ন্তনির স্বরে রাগ প্রকট।

"কী?" ওর ব্যাপারে আগ্রহ নেই।

"ডু ইউ নো, দেবজিৎবাবু ট্রায়েড টু রেপ মি। তোমার কথামতো ওকে আর্ট এক্সিবিশনে চিফ গেস্ট করে এনেছিলাম। হি ট্রায়েড টু মলেস্ট মি আফটার এভরিথিং ওয়াজ ওভার"

হতেই পারে না। মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। সে যতদূর ওকে চিনেছে ও কখনওই করতে পারে না।

নিস্পৃহভাবে বলল "ডিডন্ট নো। ইফ ইউ সে সো, পুলিসে কমপ্লেন কর"

"করব ভাবছিলাম। পরে মনে হল, হি ইজ এ পাওয়ারফুল ম্যান। কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমাকেই বদনাম দেবে"

"তাহলে আর কী করবে? ফরগেট ইট। আফটার অল, ইউ আরেন্ট এ ভার্জিন"

"ভার্জিন না হতে পারি, সেলফ ডিগনিটি তো আছে"

ভূতের মুখে রামনাম। সহ্য করতে পারছে না। ডিগনিটি, মাই ফুট। মানে জানে? ফর হার, এভরিথিং স্টার্টস ইন বেড অ্যান্ড এন্ডস ইন অ্যান অরগ্যাজম। বাইরের দুনিয়াকে দেখেছে, না দেখতে চেয়েছে।

ব্যঙ্গ করে বলল "আছে না কি?"

"হোয়াট ড্যু ইউ মিন? তুমি না মেয়ে। মেয়ের সম্মান দিতে জান না। দেবজিৎ তাই নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। অ্যান্ড ইট ডাসেন্ট মেক এ ডিফারেন্স টু ইউ"

রেগে উঠল শর্বরী। সি ইজ এ ডিগ্রেডেশন অফ হিউম্যান বিইং। ডিগনিটি শেখাচ্ছে। দেবজিৎকে এক্সকিউজ করছে "হোয়াট ডিফারেন্স ডাস ইট মেক, হোয়াট আই থিংক। ইফ ইউ ফিল ইওর ডিগনিটি ইজ অ্যাট স্টেক ড্যু হোয়াটএভার ইউ থিংক বেস্ট"

"ইউ আরেন্ট দেয়ার টু হেল্প মি?" শর্বরীর কথায় খেপে উঠল সায়ন্তনি।

"নো ওয়ে। ইটজ ইওর প্রবলেম। ইউ সর্ট ইট। আই হ্যাভ টু গো নাউ। টক টু ইউ লেটার"

ফোন কেটে দিল শর্বরী। সি হ্যাস নো ইন্টারেস্ট ইন টকিং টু দিস বিচ। ওয়েস্টেজ অফ টাইম টু মেক হার আন্ডারস্ট্যান্ড। সি নেভার উইল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সায়ন্তনির জন্য নয়। মরুক-গে। ওর জন্য সময় নষ্ট করে কিসসু হবে না।

কষ্ট নিজের জন্যে। দেবজিৎকে ছুঁতে পারছে না। ওই লোকটা ধরা দিয়েও অধরা। জানে না। দেবজিৎই পারে যা সে পারে না। ওর মাধুরীতে জড়ানোই আনন্দ, তৃপ্তি, শান্তি। অধরাকে ধরতে পারবে না। তবুও হাত বাড়ালেই আছে নতুন ছন্দের অঙ্গীকার। সবার সভায়, মনের গভীরের ভাষাকে পার্থিব রূপ দিতে। সে অর্জুন। সে যুধিষ্ঠির। সে-ই দুর্যোধন। সে-ই দুঃশাসন। সে-ই বৃহন্নলা। সে-ই ভীষ্ম। সে-ই তো আজকের সারথি। কৃষ্ণকলি বসু নয়, শর্বরীর জীবনের কৃষ্ণ। ধরা যায় না। বাণী উপলব্ধি করা যায়। সে যদি সারথি হয়, তো চিন্তা কী। সেই বলে দেবে কালকের পথ। তুলে দেবে তির নিশানায়।

কৃষ্ণকলি বসুর কাছে দৈহিক, সামাজিক ভাবে সঁপে দিয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী হয়ে গেল। সব পরিচয়ই তাই। প্রবহমান সময়ের গতিতে মুছে যায়। অথবা, হারিয়ে যায়। নামমাত্র লেশ রেখে যায় মনের গভীরে। সে স্মৃতি কখনও মধুময়, কখনও দুঃখময়। যে সম্পর্কের স্থায়ী মিলন নেই, সেখানে বিরহের অবকাশও নেই। স্থায়িত্ব আমাদের মধ্যে। শুধু দেখবার চোখ চাই। দেবজিৎ সেই অন্ধের যষ্ঠি। সেই মধু, যা দূর থেকে পান করেও পিপাসা থেকে যায়। সেই পিপাসিত চিত্তই বাঁচার পাথেয়। কান্ডারি হয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু তার রথে চাপতে হবে। যে চাপতে পারল না তার দুর্ভাগ্য।

দেবজিৎ কোনওদিনও জানবে না, শর্বরীর বসুর মতো সোশালাইট তার কথা ভেবে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলছে। সোশাল মক্ষীরানি হতে পারে, দিশারি নয়। সে অন্য কেউ। সে একমেবাদ্বিতীয়ম। সেই তো দেবের প্রিয়। আজকের দেবজিৎ।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। অন্ধকার। হাতড়ে দরজার পাশের সুইচটা টিপল বিদিশা। ঘর আলোয় ভরে গেল। এক কোণে দেবজিৎদা। সোফায় চুপচাপ বসে। চোখে জল। দেবজিৎদা কাঁদছে। কী হয়েছে? সামনে দাঁড়াল। পরনে সাদা-লাল ঢাকাই। লাল টিপ।

"বৌদি টিঙ্কু নেই?" মাথা নাড়ল দেবজিৎ। পাশের সোফায় বসে বলল "কোথায় গেছে?"

"রবীন্দ্রসদনে টিঙ্কুর কলেজের ফাংশনে"

"তুমি গেলে না?"

"ইচ্ছে করল না। ভাবলাম একা থাকি" সাদা পাজামা পাঞ্জাবিতে শূন্য চেয়ে।

"কী হল তোমার? কেমন অন্যমনস্ক লাগছে"

দেবজিৎ বিদিশার দিকে তাকাল। মিষ্টি দেখাচ্ছে। যেন অন্ধকারে এক টুকরো আলো। আবার দেখল। সাজ নেই। অলঙ্কার নেই । সহজ সরল অপরূপা।

ঝুঁকে বলল "আজ তোমার কী হল?"

"হঠাৎ একটা গান মনে পড়ে গেল। জীবনের গান। বাঁচার গান..."

বিদিশা দেবজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "গান শোনাব তোমাকে। তুমি এত ভালো শ্লোক বল। আমিও শিখেছি।

ইয়াস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মানি এব অনুপশ্যতি।

সর্বভূতেসু চ আত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।"

দেবজিৎ অবাক "ঈশোপনিষদ"

হেসে বলল "পড়ে ফেললাম"

"মানে জানো?"

মাথা নিচু করে উত্তর "কেন জনব না? যিনি সর্বভূতকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি হিংসা বা দ্বেষ অনুভব করেন না। সেকথা ছাড়। তুমি কেন অন্যের জন্য কিছু কর না?"

দেবজিৎ বুঝতে পারেনি। চালাক মেয়ে। জানতে চাইলে সারা বিশ্ব পড়ে রয়েছে। শুধু মন থাকলেই হল।

"ইচ্ছে করে না"

"কেন করবে না? তোমার এই ফিলসফি, হারা-জেতার বাইরেও দুনিয়ার খোঁজ দিতে পার। সাধারণ মানুষ যারা জীবনের কুরুক্ষেত্রের অর্জুন, তাদের কৃষ্ণ· হবে না কেন? জীবনরথের সারথি"

"ভগবান সাজার কোনও ইচ্ছে নেই। সাধারণ লোক তো অর্জুন হতে পারে না। তার জন্য বিশেষ কাউকে চাই"

“আমি কী সেটা হতে পারি না?”

“তুমি!” দেবজিতের চোখে বিস্ময়।

“একবার সুযোগ দিয়ে দেখ। শুধু তিরটা তুলে দাও আমার হাতে। দেখ নিশানায় ঠিক লাগাতে পারি কি না”

দেবজিতের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখটা অলোয় ভরে গেল। কে যেন ভেতরের জ্যোতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক খাপখোলা তলোয়ার মমতার খাপে। কে যেন নরম হাতে মলম মাখিয়ে দিয়েছে। তার এতদিনের দর্শন গাণ্ডীব আগামীর কালপুরুষের হাতে তুলে দিলেই কাজ শেষ। অনাবিল আনন্দ। তার মধ্যেই বাঁচতে চায়। ও-ই তো আগামী। ও-ই পারবে। তার অধরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামীর পথে।

বিদিশার হাতটা হাতে নিয়ে বলল “তুমি তির চালাতে জান?”

বিদিশা হেসে বলল “জানব না কেন? শুধু নিশানাটাই জানা ছিল না। সেই নিশানা দেখিয়ে দিয়েছ”

দেবজিতের মনে হল, বিদিশা বোধহয় মাছের চোখটাও দেখতে পেয়েছে। অন্ধকারে জ্বলছে। এখানে কৌরব নেই, পাণ্ডব নেই, মহাপথিক ভীষ্মও নেই। নেই কুরুক্ষেত্র। শুধু শস্য-শ্যামলা উপত্যকা। তার ওপাশে বিরাট বিশ্বে হারানোর ঠিকানা। গোমুখে গিয়ে মনে হয়েছিল, কে বুঝল, না বুঝল কী আসে যায়? আজ মনে হচ্ছে, যায়। বোঝা যায়। বোঝানো যায়। স্বার্থপরের মতো সে কেবল নিজের চেতনায় আচ্ছন্ন। সময় হয়েছে খোলস ছেড়ে বিশ্বের দরবারে সেই ভাষা পৌঁছবার। সে পারবে না। তৈরি হয়নি। সে যে কৃষ্ণ। অর্জুনের হাতে তুলে দিতে পারলেই সার্থক, শান্তি।

বিদিশা নিঃশব্দে বসে উপলব্ধি করছে। সে ভাষা আর কেউ না বুঝুক, দেবজিৎ বুঝতে পারছে। চিনতে পারছে তার অর্জুনকে। সে তার মধ্যে দিয়ে শাশ্বত সত্য বুঝে ফেলেছে।

বিদিশার শ্লোকটা বারবার কানে ভাসছে। এই তো জীবনের ধর্ম। অলোছায়াময় গাণ্ডীবে সত্যের আলোর তির জোযন করাতেই পরিপূর্ণতা। নিঃশব্দে বিদিশার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে বিদিশা দেখল এক অপরূপ জ্যোতি। দেবজিৎদার চোখ দিয়ে নতুন আলো। সেই আলোয় নিজেকে।

কথা নেই। শুধু নিঃশব্দে অনুভব।

বিয়াল্লিশ

দরজার লক ঘুরিয়ে লাইট জ্বালাতেই গুরুগম্ভীর অভয় সেন “এত রাত হল?”

চটি খুলে মনোলীনা দেখল অন্ধকারে কোণার সোফায়, হুইস্কি খাচ্ছে।

হেসে জিজ্ঞেস করল “এখনও ঘুমোওনি?”

রাশভারী গলায় আবার বলল “এত রাত হল?”

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। যেন গাঁজাওয়ালার প্রতিধ্বনি। সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে একঘরে হওয়ার পর অসহায় হয়ে ওর কাছে সঁপলে খুশি হত। তদবির করে কিছু রোল পাইয়েও দিতে পারত। ভিন্ন আঙ্গিকে গাঁজাওয়ালার কাহিনি। তা তো করেনি। নিঃশব্দে হারটাকে নিজের চেষ্টায় জয়ে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। তাকেই খুঁজতে হবে পথ। তার প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট, জয়যাত্রা।

আড়চোখে তাকিয়ে নিজের ঘরে “কাজ ছিল”

ওর নির্লিপ্ততায় খেপে গেল। হবু বউ কোত্থেকে মাঝরাতে বাড়ি ফিরছে সে জানে না। মেনে নিতে পারছে না। হুইস্কিতে চুমুক “মাঝরাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?”

বেডরুম থেকে কোনও জবাব এল না। শালোয়ার-কামিজ ছেড়ে বাথরুমে ঢুকতে বুঝল অভয় এখন ঝগড়ার নেশায় “বাথরুম পেয়ে গেছে। আসছি”

হাত-মুখ ধুয়ে হিসি। বাথরুমটাও কত আপন। পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। তার নারীত্বকে গাঁজাওয়ালা কিনতে পারেনি, অভয়ও পারবে না। এখানে সে অঘোষিত সম্রাজ্ঞী। ধুয়ে আর প্যান্টি পরতে ইচ্ছে করল না। খোলামেলা হয়ে বসতে চায়। সুতির বন্ধন থেকে মুক্তিতে গা-এলানো ভাব। নাইটি জড়িয়ে বাথরুম থেকে আয়নার সামনে। ক্রিম মাখতে গিয়ে চেহারাটা দেখল। বুড়িয়ে গেছে? প্যারাডাইস এন্টাটেনমেন্ট স্থাপনের পর ভারিক্কি ভাব। যুবতী থেকে নারীতে।

ক্রিম লাগিয়ে ড্রয়িং রুমে আসতেই দেখল অভয়ের চোখ দুটো লাল। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘনঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে।

“কটা থেকে নিয়ে বসেছ?”

“এত রাত পর্যন্ত কী কাজ?”

“সিরিয়ালের নয় তুমি জান”

“মেয়েছেলের দালালি?”

কানে তবে কথাটা পৌঁছেছে। প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্টর কথা অনেকেরই জানা। নিছক প্রোডাকশান হাউস হিসেবে। অন্তর্নিহিত ব্যবসা অনেকেরই অজানা। অভয় সেন বোকা নয়। ঠিক ভেতরের খবর পেয়ে গেছে।

উল্টোদিকে সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে বসতেই নাইটির একাংশ বুক থেকে সরে গেল। উন্মুক্ত স্তনকে জড়িয়ে ওর চোখে চোখ "তার মানে?"

"যা বললাম, তাই। মেয়েছেলের দালালির ব্যবসা ফেঁদেছ?"

"কে বলল?" ঠোঁটে ক্রিম ঘষছে। ওর নিস্পৃহতায় তুষের আগুনে ঘি।

"জেনে গেছি বলেই ভয়?"

"কোথা থেকে কী জেনেছ, জানি না। ঠিক নয়"

"মেয়েছেলের ব্যবসা কর না?"

গম্ভীর মনোলীনা বলল "বুঝতে পারছি না, মেয়েছেলের ব্যবসার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? প্রোডাকশন হাউস লঞ্চ করেছি। প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট। শুধুই প্রোডাকশন হাউস"

"বেশ্যা প্রডিউস করতে?"

গাঁজাওয়ালার পৌরুষ অভয়ের কণ্ঠে। নিজেকে সামলে বলল "বেশ্যা কেন? সিরিয়াল। সেরকম প্রডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটার পেলে সিনেমাও"

"এত টাকা কোত্থেকে পাবে?"

"স্পনসর আছে। নেটওয়ার্ক ট্যাপ করলে কঠিন নয়। সারাজীবন প্রডিউসার-ডিরেক্টারের গোলামি করলাম। চেষ্টা করে দেখি, যদি কিছু করতে পারি"

তেতে উঠল অভয় "অত সহজ? বললেই প্রডিউসার পাওয়া যায়"

"কেন যায় না? তুমি চিরকাল প্রডিউসারদের বুদ্ধি বিতরণ করে লাখের মুনাফা লুটতে দিয়েছ বলে কি আমাকেও তাই করতে হবে? ছেলেদের পক্ষে যতটা সহজ, আমাদের পক্ষে নয়। খুশি হতে প্রডিউসারের বিছানায় শুয়ে কয়েকটা রোল জোগাড় করলে? পারিনি বলেই এই অবস্থা। সবাই পারে না। কারও সঙ্গে শুতে ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই শোব। সেটা মনের তাগিদে, ধান্দায় নয়"

দমে গেল অভয়। যা বলছে মিথ্যে নয়। ইন্ডাস্ট্রির অলিখিত সত্যি। এই মেয়েটা নিজের চেষ্টায় প্রোডাকশন হাউসের ঝুঁকি নেবে ভাবতেও পারে না। সংশয়ে হাওয়ার খবরগুলোকে গুরুত্ব দেয়। যা রটে, তার কিছু তো বটে।

"তুমি বলতে চাও মেয়েছেলে সাপ্লাইয়ের ধান্দা কর না। ভাস্কর ভাওয়াল কে?"

“আমার বিজনেস পার্টনার”

“এর আগে তো নাম শুনিনি”

“ক'জনের নাম জান? গোটা কয়েক ইন্ডাস্ট্রির লোক ছাড়া। এর বাইরেও অনেকে থাকতে পারে”

“থাকলেও কর্পোরেট হাউস”

“কর্পোরেটের কীসের প্রয়োজন? আমার চাই কাজ করার মতো ছেলে। কর্পোরেট টাকা ঢেলেই খালাস। আমাকেই ছুটতে হবে। ভাস্কর বিজনেসে কাজ করার মধ্যবিত্ত আইডিয়াল ছেলে। তোমাদের মতো সেলিব্রিটি নয়”

মিথ্যে বলেনি। নরম হল। কথাটা শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। শুটিং ক্যানসেল করে বিকেল থেকেই মাল। এ লাইনে রাত করে ফেরা কোনও বড় ব্যাপার নয়। প্রথম মিলনেই বুঝে গেছে ও কুমারী নয়। সতীত্ব এখানে গৌণ। মেনেই লিভিং টুগেদার। বিয়ের স্বপ্নে বন্ধনের অনুভূতি। স্বামী-স্ত্রীর দায়বদ্ধতার সঙ্গে অধিকারও। স্টুডিও পাড়ায় কোণঠাসা। তবুও ভিক্ষে চায়নি ‘আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবে। তোমার তো অনেক চেনা’ এটাই পৌরুষে আঘাত করেছে। তাই রাগ। পুরুষের আধিপত্য আজও বর্তমান। সেখানেই রাগ, ক্ষোভ থেকে পরের মুখের ঝাল খাওয়া।

“ভাস্কর ভাওয়াল। জোটালে কোত্থেকে?”

“অনেকদিনের পরিচিত”

হুইস্কিতে চুমুক “প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট ব্যাপারটা কী?”

বিরক্ত হল মনোলীনা। সে তো ওর কোনও ব্যাপারে মাথা গলায় না। তবে ও কেন প্রশ্ন করছে? অভয় তো বিবাহিত স্বামী নয়। লিভিং টুগেদার। স্বামীর যা অধিকার লিভিং টুগেদার হলেও কী একই? মতে না মিললে ঘর ছেড়ে যেতে পারে। স্ত্রী হলে অত সহজ? এত সাহস পেল কোত্থেকে? ভয় ধরছে গাঁজাওয়ালার রূপে অভয় সেনকে দেখে। গাঁজাওয়ালাকে না মানলে অভয়কে-ই বা কেন?

“যা বললাম, তাই” উঠে ফ্রিজ থেকে জল গিলে বলল “খাবে না? খাবার গরম করি”

“প্রশ্নটা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছ” অভয় কঠোর।

ইস্যু খাড়া করে ঝগড়া করতে চায়? হুইস্কির নেশা চেপেছে। এ সময় সিরিয়াস কিছু ডিসকাস করতে নেই। মাইক্রোওয়েভে খাবার ঢুকিয়ে বলল “অনেক খাওয়া হয়েছে। খাবে এস”

খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। ও মনোলীনার থেকে জানতে চায়। গুজবটা মৌমাছির মতো ভনভন করছে। যাচাই করতে হবে সত্যতা। বিয়ের কথা যখন ভাবছে যাচাই করা আবশ্যক। মনোলীনাকেও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

খাবার বেড়ে বলল “আর খেতে হবে না। এবার খেতে এস”

গ্লাস হাতে টেবলে। গ্লাসটা রেখে, ওর গাল দু-হাতে চেপে বলল “আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্রুথ। হোয়াটজ ইট? অ্যান এসকর্ট এজেন্সি?”

লাল চোখের অভয়কে দেখে শিউরে উঠল। যেন গাঁজাওয়ালাকে দেখছে। সেখান থেকে পালেলেও নাম, চেহারাটাই শুধু পাল্টে যায়। বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ। রনিত, গাঁজাওয়ালা, অভয় সেন। এই বন্ধনের জন্যই কী বৃদ্ধ রিটায়ার্ড বাপ মেয়েকে পাত্রস্থ করতে মরিয়া? কর্তব্য পালনে সার্থকতা।সামাজিক বন্ধন মানে সমঝোতা। অনেক মেনেছে, আর নয়। হারের মাপকাঠি যতক্ষণ সমঝোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার পরে আর নয়।

বিরক্ত মনোলীনা ওকে ঠেলে দিল “হোয়াট ডাস ইট ম্যাটার হোয়েদার ইটজ অ্যান এসকর্ট এজেন্সি অর নট? আই হ্যাভ টু সার্ভাইভ। ইটস মাই বিজনেস। হোয়াই দ্য হেল আর ইউ ইন্টারফিয়ারিং ইন মাই অ্যাফেয়ারস। আই নেভার আস্ক হোয়ার ইউ গো উইথ হুম ফর ইওর আউটডোর শুটস। নো ম্যাটার হোয়াট ইউ হ্যাভ হার্ড ফ্রম আদার্স, ইটজ মাইন। লেট মি হ্যান্ডেল ইট। ডোন্ট নিড ইওর হেল্প”

ধাক্কা খেয়ে নেশার ঘোরে হিংস্র অভয়। মনোলীনার কাঁধ ঝাকিয়ে বলল “আজ বাদে কাল বিয়ে করব। ইটস নো লঙ্গার ইওর অ্যাফেয়ার, সে ইটজ আওয়ার্স”

ধৈর্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লিভিং টুগেদার মানে নাকখত দেয়নি সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল “হু গেভ ইউ দ্য আইডিয়া আমরা বিয়ে করব? উই আর গুড ফ্রেন্ডস স্টেয়িং আন্ডার দ্য সেম রুফ হ্যাভিং সেক্স ইফ বোথ অফ আস ফিল। বিয়ের কথা কোনওদিন বলেছি?”

“দ্যাটস আন্ডারস্টুড”

“সারটেনলি নট। বিয়ে করলে বেরোতে দেবে। এখন বিয়ের কথা ভাবছিই না। কেম উইথ দ্য আইডিয়া অফ কম্প্যনিয়নশিপ। দ্যাটস্ অল। নাথিং মোর”

“কম্প্যনিয়ানশিপ। হোয়াটজ দ্যাট? ওয়ান অফ ইওর ভেরিয়েশন অফ প্রস্টিটিউশন লাইক ইওর প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট”

বাঘিনির মতো খেপে গেল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। কী ভেবেছে লোকটা? সে বেশ্যা, হোর? এদিকে হোর বলবে, অন্য দিকে স্বামীত্বের পৌরুষ। বিয়ে না করেই যেন কিনে ফেলেছে “আমি তোমার কেনা হারেমের গোলাম নই। ভালো লেগেছিল, ইচ্ছে হয়েছিল বলেই থাকতে এসেছি। নাকখত দিইনি ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু কল মি এ হোর। আই নিড মাই ইন্ডিপেনডেন্স, প্রাইভেসি, ওন স্পেস। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইন্টারফিয়ার ইন মাই অ্যাফেয়ার্স”

মেয়েছেলের এত দেমাক আগে দেখেনি। বিবাহিত জীবনে উত্থানপতন থাকলেও, ঐত্রিলা যোগ্য সহধর্মিণীর দায়িত্ব পালন করেছে। কখনও নিজের অস্তিত্ব চাপাতে চেষ্টা করেনি। এই প্রথম, এক মেয়ে তাকে এক্তিয়ার শেখাচ্ছে। এতদিন দেখা মনোলীনা আর এখনকার মধ্যে বিস্তর তফাত। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মালটা বেশি হয়ে গেছে?

চারিদিকে অন্ধকার। আলোটা ইচ্ছে করেই জ্বালায়নি। এখন জ্বালাবার ইচ্ছেও নেই। তাতে পথের সন্ধান মিলবে না। রোশনাইতে ঘর ভরলেও বাইরে পৌঁছবে না। সেখানে নিরালা নিঝুম অন্ধকার গ্রাস করতে চাইছে। তার মধ্যে খাঁ খাঁ করা শূন্যতা। ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। ঝলমলে আলোর রোশানাই ছড়াবার মনোলীনাও নেই। যে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আরেক ঠিকানায়। হারিয়ে গেছে। কোনওদিনই হয়ত ছিল না। মিথ্যে লড়ছিল। জিততে হবে, এগোতে হবে। নতুন কিছু ভাবতে হবে। নতুন স্বপ্ন দেখতে হবে। ক্ষয়িষ্ণু অতীতকে পেছনে ফেলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে স্বাক্ষর রাখতে হবে। এগোতে হবে, জিততে হবে, বাজিমাত করতে হবে।

যদি ঐত্রিলা পুরনো হয়ে যায়, ছুড়ে ফেল। যদি মনোলীনাকে বরণ করে নেভা বাল্বটা জ্বলে, তার হাত ধরেই এগিয়ে চল। গন্তব্য জানা নেই। জানার দরকারও নেই। শুধু এগিয়ে চলা, জেতা, বেঁচে থাকা, ভোগ করা। এইটুকুই তো জানে। যা শিখেছে ছোটবেলা থেকে। এর বাইরে ভাবার অবকাশও হয়নি, প্রয়োজনও পড়েনি। লক্ষ্মণরেখার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। টাকা-গাড়ি-বাড়ি-নাম-যশ-প্রতিপত্তি। ব্যস এইটুকুই। চাওয়াকে ভোগ করে নেওয়া।

সেই ভোগ আজ থাপ্পড় মেরে চলে গেছে "তোমার সঙ্গে ঘর করবে কে? তোমার এখানে জন্মানোই ভুল। আফগানিস্তানে জন্মালে নিজের মতো করে সব কিছু পেতে"

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নির্বাক। এই কী সেই মনোলীনা, যাকে এত বছর ধরে চিনেছে? মনে আছে যেদিন প্রথম স্টুডিওতে পা রাখল অভয়ই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্নেহাংশুদার সঙ্গে। তখন থেকে সিরিয়ালের পরিচিত মুখ। যেদিন মনোলীনা ছোট বোনটির আবরণ ত্যাগ করে বিবস্ত্র হয়ে ওর সামনে দাঁড়াল, মনে হয়েছিল এ তো অভ্যাসের ঐত্রিলা নয়। মোহময়ী নারী। যাকে ভালোবাসা, কাছে টানা, চুম্বনে চুম্বনে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভরিয়ে দেওয়া যায়। গভীরের স্বপ্নকে বাস্তবে আনতে সক্ষম হয়েছিল মনোলীনা। সেই স্বপ্নই তার একঘেঁয়ে জীবনে পাথেয়। বাঁচার মূলমন্ত্র। তার হাত ধরে ভুলেই গেছিল ঐত্রিলাকে, তার মাধ্যমিক পড়া মেয়েটাকে। তাকে বাঁচতে হবে স্বপ্ন নিয়ে। তাকে এগোতে হবে সাম্রজ্যের স্বর্ণশিখরে। সেখানে পাহাড় নারীর

গভীর গহ্বরের মতো উরু মেলে দিয়েছে। সুখের নিখাদে নয়, পাতালের অন্ধকারে কোমলে। যে উন্মিলিত উরুদ্বয় আহ্বান জানিয়েছিল, এখন তা দ্বিখণ্ডিত অতলে।

জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে মনোলীনা বলেছিল "একাই চলতে পারি। কোনও পুরুষের প্রয়োজন নেই। শাসন মেনে নেওয়ার মন আমার নেই"

"ঘর করতে গেলে তো একটু মেনে নিতেই হয়" অভয় বোঝাতে চেয়েছিল।

"ঘর না করলেও পেট চলে যাবে। ফাই-ফরমাস খাটতে ভাস্করের মতো হাজারো আছে"

প্রতিষ্ঠার অহং। আত্মবিশ্বাসের ভরসা। বুঝতে পারেনি। গাঁজাওয়ালার কাছে হেরে এখন জেতার নেশায়। যার আরেক নাম সার্থকতা। ওর প্যারাডাইস এন্টারটেনমেন্ট। পেছনটাও শূন্য। গৃহবধূকে খুঁজেছিল আঁধারে সন্ধ্যারতির জন্য। আবার নব-জীবনে বাঁচার প্রেরণায়।

ঐত্রিলাকে ফোন করেছিল সকালে।

একগাল হেসে ঐত্রিলা বলেছিল "ভালোই হয়েছে, ফোন করলে। কাজের চাপে ভুলেই গেছিলাম। পরের শনিবার আমার বিয়ে। আইটিসি সোনার বাংলায় রিসেপশন। এস কিন্তু"

অনেক কিছু বলার ছিল। এর পরে পারেনি। ওই হাসির অন্তরালে ঐত্রিলা যেন লোহার গরাদে চিরকালের জন্য তালা-চাবি লাগিয়ে দিয়েছে। আর খুলবে না। চেষ্টা করেও লাভ নেই। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

হুইস্কির গ্লাসটা হাতে, নেশায় বুঁদ। অন্তত সব ভুলে আজ রাতে অন্ধকারটাকে সরিয়ে ফেলা যাবে। কাল সকালে যদি আবার নতুন আলোর রোশনাইয়ে ড্রয়িং রুমটা আলোকিত হয়, সেই আশায়। বাদলানোর হলে কাল না-ও হতে পারে। কবে জানে না। শুধু জানে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে হবে।

তেতাল্লিশ

নিঝুম অন্ধকার। আলোর রেশ নেই। সায়ন্তনি আলো সহ্য করতে পারছে না। তাই পর্দা টেনে দিয়েছে। যাতে বাইরের আলো তার একাকী নিঃশব্দ পৃথিবীকে ভেঙে ছারখার না করে দেয়। একে একে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ট্যানিয়া, সুলগ্না, অরণি, ঐত্রিলা। দেবজিৎ তাকে কোনও আলোর নিশানা দেখাতে পারেনি। সে আজ একাই বাঁচতে চায়। ভডকায় ডুবে। এর মধ্যেই বাঁচা। যতবারই পাওয়ার জন্য স্বপ্নটাকে মাটিতে আনতে চেয়েছে, মরীচিকার মতো দূরে সরে গেছে। রেখে গেছে শূন্যতার ব্যথা। তাতেই একাকী নিঃশব্দে ভাসতে চায় অতীত থেকে ভবিষ্যতে। সবাই ফেলে দিলেও ভডকা নয়। তাই নিয়েই সে তার অন্ধকারে সম্রাজ্ঞী।

আজ আর প্রিয়জনেরা উলুধ্বনি দেবে না। দোড়গোড়ায় প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করবে না। মঙ্গল শঙ্খে মুখরিত হবে না উৎসব প্রাঙ্গণ। কাঁসার থালায় রাঙা পা ফেলে প্রবেশ করবে না স্বপ্নের বাসরে। সেদিনের মতোও আজও ঐত্রিলার বিয়ে। পরনে থাকবে না বেনারসী। মাথায় থাকবে না লাল চেলি, ফুলের মুকুট। কপালে চন্দনের টিপ। থাকবে না পুরুতমশাইয়ের সংস্কৃত মন্ত্র, মালাবদলের মিথ্যে প্রহসন। ফুলশয্যায় রজনীগন্ধার সুবাস। ক্ষণস্থায়ী শপথের অঙ্গীকার।

সই করলেই বন্ধন। সহজ হলেও দায়বদ্ধতা সুদূরপ্রসারী। অ্যাটলান্টিকের ওপারে।

অঙ্কিতা ঘরে ঢুকে বলল “মা, আজ কী পরবে?”

“হেসে ঐত্রিলা বলল “তুই বল”

“সাদা শিফনের শাড়ি”

ক'জনের সৌভাগ্য হয় মায়ের বিয়েতে সেজে দেখার। আজ ঐত্রিলার থেকেও বেশি সাজবে। আজ যে তারও বড় উৎসব। বাবা একবারও ফোন করেনি। তাই মনটা খারাপ। বাবা যেন পুরপুরি তার অরবিটের বাইরে।

মার্কের প্রতি সংশয় মার্কই কাটিয়ে দিয়েছে। যতাটা সময় মায়ের সঙ্গে তার থেকেও বেশি অঙ্কিতার সান্নিধ্যে। যেন ওকে জয় করাই তার আসল পরীক্ষা। তাজ বেঙ্গলে বলেছে “ফ্রম নাউ অন ডোন্ট কল মি ড্যাড। জাস্ট মার্ক”

মানতে অসুবিধা হলেও পরে বুঝেছে এটাই বিদেশি প্রচলন। মার্ক বাবা হতে আসেনি। দায়িত্ব নিয়ে, বন্ধু হতে বদ্ধপরিকর।

ঐত্রিলা-মার্কের বিয়ের রিসেপশনে আইটিসি সোনারের ব্যাঙ্কোয়েট হল জমজমাট।

সত্য পালের সাদা শিফন শাড়ি, ব্লাউজ। প্ল্যাটিনামের গয়না। নববধূকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে মৈত্রেয়ী বোস। মাঝবয়সি ঐত্রিলা ব্যাঙ্কোয়েটের আলোয় ঝলমলে। চোখ দুটো প্ল্যাটিনামের মতোই চকচকে। পেছনে ফেলে এসেছে অতীত। এখন অনির্দিষ্টের পথে মোহময় যাত্রা। এই হাতছানিই চলমান। থামলেই শেষ। মৃত্যুকে কাছ থেকে অনুভব করেনি। জীবনকে করেছে। তার মোহেই স্বপ্নের হাত ধরে হাঁটা। মার্কের পরনে লন্ডনের স্যাভিল রোর টেলারের স্যুট। ব্যাঙ্কোয়েটের আলোয় খয়রি দাড়ির ফর্সা চেহারা আরও উজ্জ্বল। চারপাশের বিদেশি বন্ধুরা সুদূর অ্যামেরিকা থেকে ফ্লাই করে এসেছে। আছে রাজা দণ্ডাওয়েতের মতো দেশি বন্ধুরাও সাদা লাউঞ্জ স্যুট বো টাইতে।

নেমতন্ন করলেও ঐত্রিলা আশা করেনি দেবজিৎ আসবে। যদিও আশ্বাস দিয়েছিল “নিশ্চয়ই যাব। সস্ত্রীক। আমাদের এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ডকে নিয়ে যেতে পারি?”

“নিশ্চয়ই”

এসেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্ত্রী রুমার সঙ্গে। ঐত্রিলার হাতে গিফট দিয়ে বলেছিল “আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ডাঃ বিদিশা মুখোপাধ্যায়”।

ঐত্রিলা ফিরে তাকিয়েছিল সুন্দরী ডাক্তারের দিকে। হিরোইন বললেও আশ্চর্য হত না। কলকাতায় এত থাকতে অভয় সেন মনোলীনার মতো ল্যাকপ্যাকে সিরিয়ালের মেয়েকে ধরে ছেড়ে চলে গেল।

বিদিশার চোখের মতোই উজ্জ্বল বাসন্তী ঘাগরা-চোলি ব্যাঙ্কোয়েটের আলোয় চকচক করছে। অল্প প্রসাধনেও বৈশিষ্ট্য ফোটাতে সক্ষম। ঘাড় পর্যন্ত চুল হলুদ রিবনে বাঁধা। ঐত্রিলাকে গিফট দিয়ে বলল “রবাহুত হয়েই চলে এলাম”

“বেশ করেছেন। আপনাকে দারুণ লাগছে”

“আপনার হাসব্যান্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?”

মার্ককে ইশারা করতেই এপাশে এল “মিট চিফ সেক্রেটারি মিঃ দেবজিৎ চ্যাটার্জি। হিস গুড ওয়াইফ রুমা। অ্যান্ড দেয়ার কমন ফ্রেন্ড ডাঃ বিদিশা মুখার্জি”

“সো কাইন্ড অফ ইউ টু কাম” দেবজিৎকে বলল “আই থিংক উই হ্যাভ মেট কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক। ইউ ওয়ার দেন ফাইনান্স সেক্রেটারি। রিগার্ডিং দ্য রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট”

“উই মাস্ট হ্যাভ” দেবজিৎ মনে করতে পারল না।

পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন অ্যামেরিকানকে ইন্ট্রডিউস করল। ওদের সঙ্গে কথায় কথায় ভিড়ে গেল।

রুমা ভাবছিল কী করবে? পাশ থেকে গলা "আরে রুমা, তুই এখানে?"

সীমাকে দেখে আশ্চর্য “সেদিন বলিসনি তো এখানে নেমন্তন্ন”

“বললাম তো বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসেছি। রাজার ছোটবেলার বন্ধু। তোরা পাত্রপক্ষ না কন্যাপক্ষ?”

সীমা হাসল “কন্যাপক্ষ”

“রাজা কে?”

“মুম্বাইয়ের প্রসিউসার রাজা দণ্ডাওয়াত। মার্কের ছোটবেলার বন্ধু। ডেট্রয়েটে একসঙ্গে পড়েছে। রাজা বলল বাঙালিকে বিয়ে করছে। আমি থাকলে হি উইল ফিল অ্যাট হোম। চলে এলাম। তোদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। বাড়ির ট্যাক্স, বিলস বাকি। আসতেই হত”

“শুধু প্রডিউসার, না অন্য কিছু?” রুমা মুচকি হাসল।

“জাস্ট গুড ফ্রন্ড”

“থিংকিং অফ এনিথিং ইন ফিউচার?”

উদাসীন সীমা বলল “নাউ স্টেপড থিংকিং। আই টেক লাইফ অ্যাজ ইট কামস। ইফ ইট হ্যাপেন্স, ইট উইল হ্যাপেন। কে সারা সারা...”

বিদিশা উদ্দেশ্যহীন চক্কর মারছিল। চোখ এড়ায়নি দেবজিতের। ইশারায় ডাকল “মিট শর্বরী বসু। ডাঃ বিদিশা মুখার্জি” নমস্কার জানাল শর্বরী।

“আপনি এখানে?”

মটকা শাড়িটা পাট করে “আপনার পিছু পিছু চলে এলাম” সাজের বাহারে আভিজাত্য “বাবা এক সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে ছিলেন। মার্ক বাবার আন্ডারে কাজ শিখত। বাবা না থাকলেও চেলার বিয়েতে হাজির নিয়তিই বারবার আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছে”

“মাইট বি এ কোইনসিডেন্স”

দেবজিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল। শর্বরী পাশ দিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে ডাকল “কাম হিয়ার জন” তারপর দেবজিতের দিকে তাকিয়ে বলল “জন ডালি। মার্কস ফ্রেন্ড”

“গ্ল্যাড টু মিট ইউ” দেবজিৎ হ্যান্ডসেক করল।

শর্বরী জনকে জিজ্ঞেস করল “হাউ আর ইউ এনজয়িং ইন্ডিয়া?”

“অ্যাবসলুটলি ফাইন। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ বিন হিয়ার। গুড ফান”

"হোয়াট হ্যাভ ইউ সিন সো ফার?"

"দ্য ভিক্টোরিয়া, হাওড়া ব্রিজ, ট্যাগোরস্ রেসিডেন্স ইন জোড়াস্যাকো, দ্য বটানিক্যাল গার্ডেনস, ইন্ডিয়ান মিউসিয়াম, কালীঘাট। ডাকসিনেশ্বর টেমপল। নিয়ারলি এভরিথিং"

দেবজিৎ অবাক "এভরিথিং?"

"ইয়েস এভরিথিং। এনিথিং আই মিসড?"

"হোয়াট উইল ইউ টেক ব্যাক হোম?" হঠাৎ বিদিশা ভিড়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"বিউটিফুল পিকচার্স অফ ক্যালকাটা। বিউটিফুল লেডিস ইন ট্র্যাডিশনাল ড্রেস। নাইস টু মিট ইউ ম্যাম। গুড ফান কামিং টু ইন্ডিয়া"

"আই অ্যাম সিওর। বাট হোয়াট আর ইউ টেকিং হোম এক্সেপ্ট দ্য মেময়ার্স অফ দ্য সিটি অ্যান্ড বিউটিফুল লেডিস?"

জন স্বভাবসুলভ অ্যাংলো-স্যাকশন তাচ্ছিল্যে বলল "হোয়াট এলস টু টেক ফ্রম হিয়ার? ফোটোগ্রাফস অ্যান্ড নাইস মেমরিস"

"এ লট। ইউ ওয়েস্টানার্স আর ওনলি আফটার মেটিরিয়াল ইসুস। এভরিথিং ইউ পারসিভ ইজ রিলেটেড টু দ্য ফাইনাইট বাউন্ডারি" বিদিশা টিপ্পনি কাটল।

দেবজিৎ বিদিশাকে দেখছে। যে কাজ সে করতে পারেনি, বিদিশা সেই দায়িত্ব নিয়েছে। দেবজিতের দর্শনকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে চায়। সে ওকে বলেনি। যদ্দূর বিদিশা ওকে চিনেছে, বুঝেছে, ও নিজের উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ। আগ বাড়িয়ে কিছু বলবে না। ওই পারে দেবজিৎকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে।

জনকে বলল "দেয়ার ইজ এ বিগ ওয়ার্ল্ড আউটসাইড ইওর রেলমস্ অফ পারসেপশন। দ্যাটস্ হোয়াট ইউ টেক ব্যাক ফ্রম ইন্ডিয়া"

"হোয়াট ওয়ার্ল্ড আর উই টকিং অ্যাবাউট?"

"ওয়ান ইউ কান্ট সি বাট ফিল। আউটসাইড ইওর পারভিউ অফ পারসেপশন। ইওর ভেরি ওন"

বিদিশা লক্ষ করল, দেবজিৎ নিঃশব্দে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ওর কথা শুনছে। এই কী সেই মেয়ে, যে তার ভাষাকে বিশ্বের দরবারে বিলোতে দ্বিধা করে না? ওকে আন্ডার-এস্টিমেট করেছিল। বিদিশা মাঝখানে ঝুলছিল। দেবজিৎই পথ দেখিয়েছে। পথটা ওর ভেতরেই ছিল। ছিল না নিশানা।

"হোয়াট একজ্যাক্টলি ডু ইউ মিন?" জন অবাক।

মনোমোহিনী হাসি "হোয়াট আই জাস্ট সেড, এ নিউ পারসেপশন"

শর্বরী দেবজিতের দিকে ইঙ্গিত করে জনকে বলল "ইটজ দিস ম্যান, হু হ্যাস গিভেন আস এ ট্র্যাডিশনল কনসেপ্ট ইন দ্য টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেনচুরি ফরম"

জন কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেবজিৎ বলল "ক্যান আই গেট ইউ এ ড্রিঙ্ক?"

"শিওর" জনের উত্তরে দেবজিৎ বারে।

বিদিশা শর্বরীকে বলল "দিস ম্যান হ্যাস চেঞ্জড্ মাই লাইফ"

শর্বরী বলল "হি হ্যাস গিভেন মি এ নিউ এসেন্স অফ লিভিং। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হিম, বাট কান্ট গেট দেয়ার"

জনের উৎসাহ বাড়ছে। শুনেছে ইন্ডিয়াতে অনেক সেন্টলি মানুষ আছে। তারা হিমালয়ে থাকে। দিস ম্যান ইজ নো সেইন্ট। হু ইজ হি?

দেবজিৎ ড্রিঙ্কটা জনকে এগিয়ে বলল "হেল্প ইওরসেলফ"

"ক্যান আই টক টু ইউ?" মার্ক দেবজিৎকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিল।

"কম অন, উই আর হিয়ার ফর ফান"

দেবজিতের ইঙ্গিত বুঝে বিদিশা বলল "শ্যাল উই ডান্স?"

জনের সঙ্গে স্টেপস্ মেলাল সাম্বায়। দিস গার্ল ইজ পারফেক্ট।

দেবজিৎ শর্বরীকে বলল "আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

ওরা গল্পে মত্ত। রুমা সীমার দিকে এগোল।

ঐত্রিলা লক্ষ করল সায়ন্তনি আসেনি। শুনেছে স্বামী লং টার্ম কেয়ারে যাওয়ার পরে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করেছিল। বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও আসতে পারত। অভয় সেনও আসেনি। জানা কথাই আসবে না। মনোলীনাও নয়। ওর মনে হল, সম্পর্কটা প্লেনের ফ্লাইটের মতো। দেখা হল, কথা হল, গন্তব্যে পৌঁছে যে যার হারিয়ে গেল। অভয় নিশ্চয়ই শান্তিতে। ঐত্রিলাও তার খোঁজে। মিট, লিভ, পার্ট। ঐত্রিলা-মার্ক আতিথেয়তায় ব্যস্ত। অঙ্কিতাও।

নাচের পর ক্লান্ত বিদিশা জিন উইথ লাইম কর্ডিয়াল নিয়ে সোফায়। সি ইজ লাকি। বিয়ে না করে ভালোই করেছে। নইলে স্বপ্নে চাওয়া-পাওয়ায় সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। তার কাছে দেবজিৎ কী, জানে না। পার্থিব সম্পর্কে পাওয়ার পূর্ণতাকে ম্লান করতে চায় না। সুপ্ত আনন্দের ফল্গুধারায় মিঠে অনুভূতি। এটাকে জানাই সত্যিকারের প্রেম। দেবজিৎ, সেই অনন্ত প্রেম, জীবনের পুজো। তাতেই শান্তি, তৃপ্তি। আঘাত, পালটা আঘাত সব-ই ক্ষণস্থায়ী। অথচ লোকে ছুটছে। হারছে, জিতছে, আনন্দ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে। আবার সেই মোহেই

ভাসছে। এটা জীবন, না কি দেবজিৎদার পথই ধ্রুবতারা? গন্তব্যে পৌঁছতে গেলে টাকা-নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্মল মন।

শর্বরী ড্রিঙ্ক হাতে বিদিশার পাশে "টায়ার্ড?"

"জাস্ট টেকিং এ ব্রেক"

"আপনি সোজাসুজি কথা বলেন। আমি কিন্তু বলতে পারতাম না"

"যা মনে আসে বলে দিই। নট হিপক্রিটিক। আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম"

এই আর্টিফিসিয়াল সোশালাইট পৃথিবীতে সে সাম্রাজ্ঞী হয়েও মনের দিক থেকে ভিখারি নিজের কাছে। দেবজিৎকে বুঝতে পারলেও ওখানে পৌঁছতে পারছে না। দুনিয়াদারির ঘেরাটোপ? এই বোঝাই পাওয়া। তাই নিয়েই এগতে চায়, যদি কোনওদিন সেই মার্গে পৌঁছতে পারে। না পাওয়া দুনিয়াকে পাওয়ার নিঃশব্দ প্রতীক্ষা।

"অনেক শিখলাম, জানলাম। যে জিনিস বই পড়ে শেখা যায় না, দেবজিৎদা শিখিয়েছে। এখন শুধুই শান্তি"

শর্বরীর মনে হল, বিদিশা এমন কিছু পেয়ে গেছে, যা তার এখনও পাওয়া বাকি। শান্তির আসল মন্ত্র। অনাবিল আনন্দের অবিচ্ছেদ্য প্লাবন। মানব জীবনের সত্য।

দেবজিৎ হুইস্কি হাতে ওদের কাছে "হোয়েন টু বিউটিফুল লেডিস আর টুগেদার, আমি কাবাব মে হাড্ডি"

বিদিশা উত্তর দিল না। ওর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই মনটা ভরে গেল। অনন্ত প্রেমের হাতছানি। বিদিশার ক্ষমতা নেই সেই আবেদনকে অস্বীকার করে। শুধু নিঃশব্দে উপলব্ধি ছাড়া।

চুয়াল্লিশ

বিরহের মধ্যেই গাঁথা হয় মিলনের মালা। ঝরা পাতায় ফুটে ওঠে কৃষ্ণচূড়ার নব-পল্লব। উদাসী বাঁশির সুরে বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ। হারানোর মধ্যেই এগিয়ে যায় বিজয়রথ। এই হারজিতের খেলায় পার হয়ে যায় সারাটা জীবন। জীবনের শেষ প্রান্তে, হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, পাওয়া তো শেষ হল না। অধরা রয়ে গেল। পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে অপেক্ষা। আজও পূজা দেওয়া হল না। ফুল দিয়ে যে মালা গাঁথা শুরু তা আর গাঁথা হবে না। কারণ যেদিন সেই বাণী আসে, সেদিন বড় দেরি হয়ে গেছে। আর ফিরে যাওয়া যায় না।

ঐত্রিলা ভাবছিল ঘুমোতে যাবে। সে গুড়ে বালি। সবাই হুইস্কি হাতে। এক কোণে দেবজিৎবাবুর বউ আরেকজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। চোখ ব্যাঙ্কোয়েট হলের সর্বত্র। দেবজিৎবাবুকে চোখে পড়ছে না।

সোফার ভিড়ে ক্লান্ত এগোতে গিয়ে মার্ককে জিজ্ঞেস করল “হ্যাভ ইউ সিন মিঃ চ্যাটার্জি?”

“হি ওয়াজ দেয়ার সাম টাইম ব্যাক”

“হোয়ার হ্যাস হি গন?”

“ডোন্ট নো। লেট মি ফাইন্ড আউট” মার্ক উঠে পড়ল।

দেবজিৎ বাইরের টেরেসে একলা। চাঁদের আলোয় উদাস। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার নিস্তব্ধতায় মিঠে আলোর অনন্য মাধুর্য। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সে উপভোগ করছিল। কেন যে কেউ বোঝে না? মাধুর্য আবদ্ধ সংকীর্ণতায় নয়। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে কত সুখ, কেউ যদি দেখত। তবে দৈনন্দিন ছোটখাটো তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার রেষারেষিতে জীবনটা নষ্ট করত না। তাকে নিবিড় করে পাওয়ার মধ্যেই পরিপূর্ণ শান্তি। ছোটবেলা থেকেই এই মানে শিখেছে, জেনেছে। তার এটাই পাথেয়। বাকিটা কিছুক্ষণের পাওয়া বা হারানো। চিরন্তনের স্বাদ তো এর মধ্যেই। তার রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে স্পর্শ করাতেই আনন্দ।

পেছন থেকে মার্ক “ওহঃ ইউ আর হিয়ার। উই ওয়ার ওয়ান্ডারিং হোয়ার ইউ আর”

হুইস্কিতে চুমুক “জাস্ট এনজয়িং দ্য বিউটি অফ নেচার। লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল সাইনিং মুন ইন দ্য ডার্ক স্কাই। আই সি দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ড স্মাইলিং অ্যাট মি। দ্যাটস দ্য এসেন্স অফ লিভিং”

লক্ষ করেনি, কখন বিদিশা-শর্বরী পেছনে “এখানে কী করছেন দেবজিৎবাবু?”

“পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি নয়। জীবনের স্ফুলিঙ্গ” মার্কের দিকে ফিরে “জাস্ট সেয়িং, দ্য ফুল মুন ইজ নট দ্য ক্রুড রিয়্যালিটি অফ লাইফ। র‍্যাদার বিউটি অফ আওয়ার এক্সিসটেন্স”

“নট অল হ্যাভ দ্য মাইন্ডসেট অফ অ্যাপ্রিশিয়েটিং দিস বিউটি। ইউ আর ফরচুনেট”

ওদের দিকে ফিরে বলল “ফরচুন ইজ এ স্টেট অফ মাইন্ড। হাউ ইউ পারসিভ”

জন একা নয়, অন্যান্যরাও টেরেসে।

জন বলল “হাউ ক্যান ইউ পারসিভ সামথিং হোয়াট ইউ ডোন্ট সি?”

“দ্যাটস হোয়াট বিদিশা ওয়াজ টেলিং ইউ অ্যাবাউট সাম টাইম ব্যাক। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওনলি বিলিভ ইন হোয়াট দে সি। এনিথিং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ইজ ডিফিকাল্ট ফর দেম টু পারসিভ। ইভেন ইন আওয়ার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দে ক্লিং টু এ ডেইটি টু ওয়ারশিপ। হোয়াট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ইজ ব্রিঙ্গিং অ্যান অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ওয়ার্ল্ড টু দ্য রেলমস অফ মেটিরিয়াল ভেনচারস। হোয়াট ইউ সি, লিভ ইজ ওনলি এ পাসিং ফেস”

বিদিশা বিস্মিত “দেন আওয়ার লাইফ ইজ মিনিংলেস?”

“সামথিং বাট নট এভরিথিং। জাস্ট এ স্মল এনটিটি ইন আওয়ার ভাস্ট এরিনা অফ এক্সিসটেন্স। উই ডোন্ট নো হোয়াট ওয়াজ দেয়ার বিফোর বার্থ। নাইদার ডু উই নো হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার ডেথ। দ্য ওনলি বিট উই নো ইজ দিস শর্ট প্যাসেজ অফ টাইম। ইফ আওয়ার লাইফ ইস সো ভাস্ট হোয়াই ওয়ারি অ্যাবাউট ট্রিভিয়াল ম্যাটার্স অফ এভরিডে এক্সিসটেন্স। ডাস ইট রিয়েলি ম্যাটার হোয়েদার উই উইন অর লুজ। ইটজ এ ভেরি ট্রিভিয়াল ম্যাটার। ইফ ইউ ক্যান পারসিভ ইট ইন এ বিগার ওয়ে”

হুইস্কিতে চুমুক। মার্ককে খুঁজতে ঐত্রিলাও টেরেসে। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। গ্লাস হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেবজিৎ “দেয়ার ইজ এ লাভলি সেয়িং ইন ভগবদগীতা। ইফ আই রিমেমবার ইট কারেক্টলি পার্ট টুয়েন্টি এইট চ্যাপ্টার টু। ইট সেইসঃ

অব্যক্তদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা

বিদিশা জিজ্ঞেস করল “তার মানে কী দেবজিৎদা?”

“ওই যে বললাম, আগে, মানে জন্মের আগে কী ছিল তা অজানা। পরে, মানে মৃত্যুর পরে, কী হবে তা-ও অজানা। শুধুমাত্র মধ্যের সময়টাই জানতে পারি। তাই তার জন্য বেশি ভেবে লাভ নেই” মার্কের বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল “ইফ লাইফ ইজ ফ্ল্যাসিড, লোলিং লাইক এ জেলি আন্ডার দ্য সান অ্যান্ড ডিস্যাপিয়ারিং ইন্টু আওয়ার হিউমানস নেস্ট অফ ইনস্যানিটি, হোয়াই দেন দিস ইন্টেন্স থ্রবিং এক্সপেক্টেশন? উই ফাইট। উই লুজ, উই উইন অ্যান্ড লুজ এগেন। হোয়াই বদার?”

মার্ক রসিকতা করেই বলল “প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। টুডে ইজ আওয়ার ম্যারেজ। ইফ আই ডোন্ট এক্সপেক্ট এনিথিং হোয়াট ড্যু আই লিভ ফর?”

“ইওরসেলফ। অ্যান্ড অফকোর্স ঐত্রিলা। বাট দিস আর পাসিং ফেসেস অফ লাইফ। দ্য কি ফ্যাক্টর ইজ বি হ্যাপি। মেক আদার্স হ্যাপি। লেট আস অল লিভ ইন দিস বিগ ইউনিভার্স ইন হারমনি, পিস অ্যান্ড

ট্র্যাঙ্কুইলিটি” জনকে উদ্দেশ করে “ইট ইজন্ট বিউটিফুল পিকচার্স অফ কলকাতা ইউ টেক ব্যাক হোম। ইটজ এ মোটো, এ মেসেজ, ইউ টেক ব্যাক। এ ফিলসফি হুইচ মেকস ইওর লাইফ ওয়ার্থ লিভিং”

“অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট মোটো?” জিজ্ঞাসু জন।

“লেট আওয়ার গোলস বি দ্য সেম। লেটস ইউনাইট ইন আওয়ার হার্টস। লেট আওয়ার ডেস্টিনি বি দ্য সেম। সো দ্যাট উই অল ক্যান রিচ দ্য সেম গোল”

“হোয়াটজ দ্যাট গোল?”

“এ সিরিনিটি অফ ইটারন্যাল এক্সিসটেন্স। এ সাবলাইম স্টেট অফ গোয়িং থ্রু পেনান্স অফ লাইফ। এ মেন্টাল হার্মনি অফ থট, অফ অ্যাকশন, অফ ডুইং গুড। সো দ্যাট উই রিচ মোকসা। দ্যাট মিনস, উই ডোন্ট হ্যাভ টু বি রিবর্ন এগেন। এভরিথিং উইল ডাই, ইউ, মি, অল অফ আস। হোয়াট উইল রিমেন ইজ আওয়ার সোল হুইচ উইল পাস অন ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার। লেটস কিপ দ্যাট শ্রাউড অফ দ্য সোল পিওর অ্যান্ড ক্লিন”

ঐত্রিলা বলল “আজকের দিনে আমাদের কী আশীর্বাদ দেবেন?”

হুইস্কিটা শেষ করে বলল “হ্যাভ টু গো নাউ। ইটজ গেটিং লেট। আমি কে আশীর্বাদ দেওয়ার? তিনিই তো আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। শুধু পাওয়ার মন চাই।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদদ্বত্ত্যন্নন্যোহভিচাকশীতি ।।

সমানে বৃক্ষে পুরতষো নিমগ্ণ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমিশম অস্য মহিমানম ইতি বীতশোকঃ ।।

কেউ বুঝতে পারল না সংস্কৃত মানে। বিদিশাও নয়। বিদিশা ওর চোখের দিকে তাকাল। চিকচিক করছে। তার মধ্যে এক অপরূপ জ্যোতি। সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, পাওয়ার আনন্দ। মানসিক পরিতৃপ্তির অপরূপ বহিঃপ্রকাশ। ওই চোখের দৃষ্টিতেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিঃশব্দ যুগলবন্দি। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সব জাগতিক পাওয়া কত তুচ্ছ, মূল্যহীন। চোখের আলোয় বিদিশা দেবজিৎদাকে দেখছে, আরও কাছ থেকে। বুঝতে পারছে। আরও নিবিড়ভাবে চিনতে পারছে।

দেবজিৎ বেরবার আগে বলল “গুড নাইট ফোকস্”

অন্যরা কী বুঝেছে, বিদিশা জানে না। ও না বুঝলেও নিঃশব্দে অনুভব করতে পারছে, দেবজিৎ ঠিক কী বলতে চাইছে।

কালস্রোতে নশ্বর সব কিছুই একদিন বিলীন হয়ে যায়। চাওয়া-পাওয়া, ভোগ-লালসার সম্ভার। বিলীন হয়ে যায় আমাদের ভালোলাগা, ভালোবাসা। হারিয়ে যায় মুহূর্তের অনুভব। সম্ভাবনার সম্ভার। তবুও চিরন্তন,

অবিনশ্বর আত্মার বন্ধন, হৃদয়ের নিঃশব্দ পাওয়া। বিদিশা যেন দেবজিৎদার সঙ্গে সেই অলিখিত বন্ধন অনুভব করছে, যা যুগ-যুগান্তের। নিজেকে নিঃশব্দে খুঁজে পাওয়া। তখন দেবজিৎদার মধ্যে সেই রাগিনী। এই রাগিনীর আরেক রূপ জীবন। তার স্পন্দনেই এগিয়ে যাওয়া।

দেবজিৎদা চলে গেছে। বিদিশা টেরেস থেকে হলে। হারিয়ে গেছে অন্য পৃথিবীতে। চারিদিকে কী হচ্ছে, কে কী বলছে, খেয়াল নেই। মনের ভেতরে কেবলই ঝংকার তুলছে দেবজিৎদার মুখে কিছুদিন আগে শোনা বেদের শেষ শ্লোকটাঃ

সং জানীদ্ধ্বং সং পৃচ্যদ্ধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।

সমানো মমএঃ সমিতি সামিনি সমানং ব্রতং যহ চিত্তমেষাম্ ।

সামানেব বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতা অভিসংবিশধ্বম্ ।।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।।।

এই গল্পের সব সব চরিত্রই লেখকের কল্পনা।
জীবিত কিংবা মৃত কারও সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত।